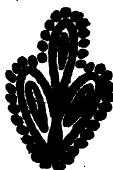
নতুন ইয়োরোপ
নতুন মানুষ





প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬৫ ২২০০

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা ১২

মুদ্রক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদ-চিত্র
বিমল দাশ
প্রচ্ছদ ও ফোটোচিত্র মুদ্রণ
ফোটোটাইপ সিণ্ডিকেট

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স



পাঁচ টাকা

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

মিত্রসত্তমেষু

ছবি



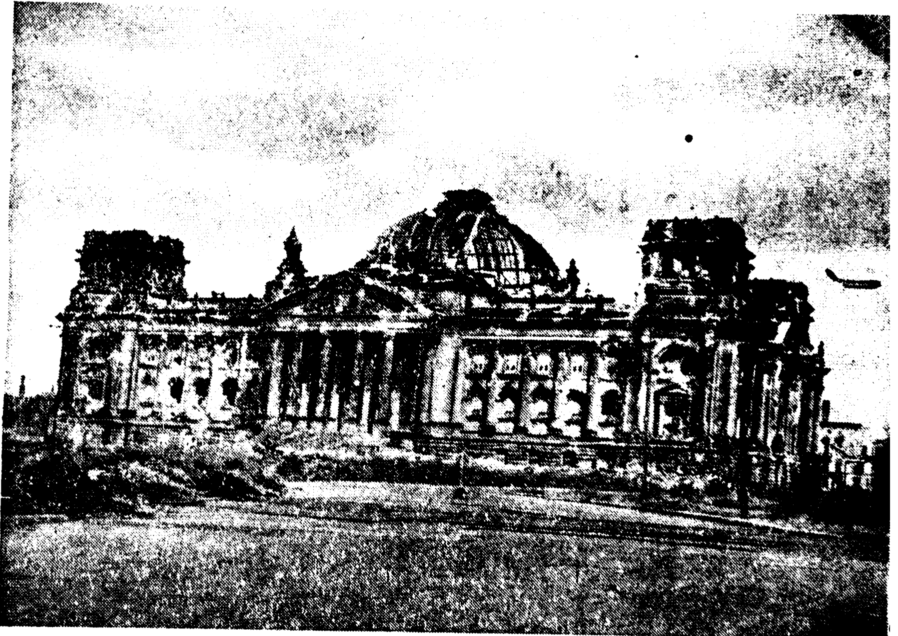
বার্লিনের রাস্তায় মুলুকরাজ আনন্দ ও লেখক।
বাচ্চা বলছে, চড়বে নাকি হে সাইকেলে ?



বোদো উশে (ঔপন্যাসিক, আকাদেমি অব আর্টস সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক) ও লেখক



দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের শেষে বার্লিনের একটি পথ—রক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে



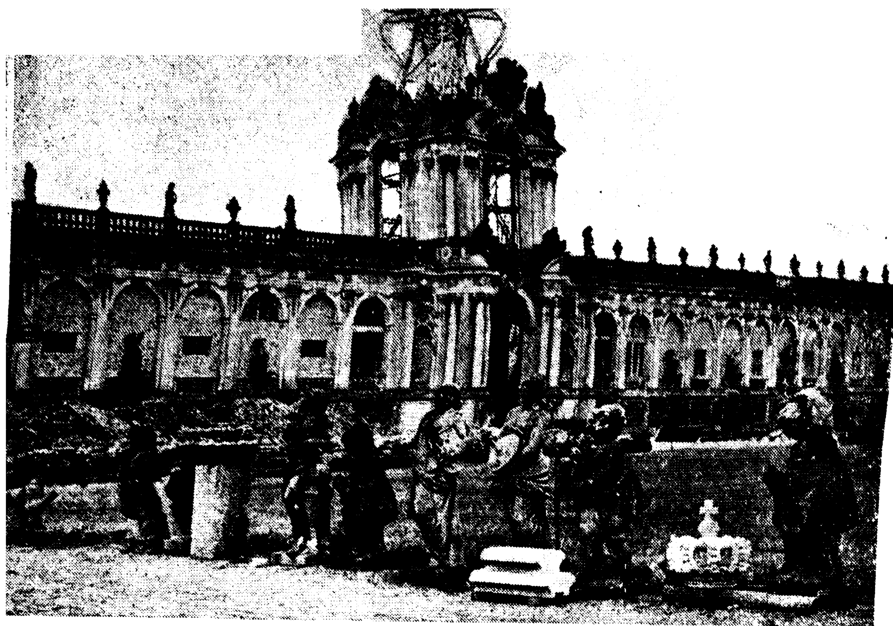
রাইখস্টাগ — পার্লামেন্টের সেই বাড়িতে দেখছেন চামচিকের বাসা। ... চামড়া খুলে গিয়ে যেন কঙ্কাল বেরিয়ে আছে বাড়ির সর্বাঙ্গে। দেখুন, ছবিতে দেখুন (পৃঃ ২৮)



আকাদেমি অব আর্টসের সংবর্ধনা (পৃঃ ৬৩)



বোমা-বিধ্বস্ত ড্রেসডেন। পঁয়তাল্লিশ সনের তেরোই ফেব্রুয়ারি, সন্ধ্যা থেকে রাত একটা-দেড়টা। তার মধ্যে সমস্ত শেষ ... (পৃঃ ১০৩)



সুভাইঙ্গারেও বোমা পড়েছিল। ...পাথরের আশ্চর্য শিল্পমূর্তিগুলো
ভেঙেচুরে গাদা হয়ে আছে এখনো (পৃঃ ১০০)



সকালবেলা স্টিমার ধরতে এলব-এর ঘাটে এসেছি ··· কনকনে জোলো-হাওয়া বইছে ··· (পৃঃ ১০৬)



Manches Herrliche der Welt
Ist in Krieg und Streit zerronnen;
Wer beschützet und erhält
Hat das schönste Loos gewonnen.

Weimar
10 Nov.
1826

Goethe

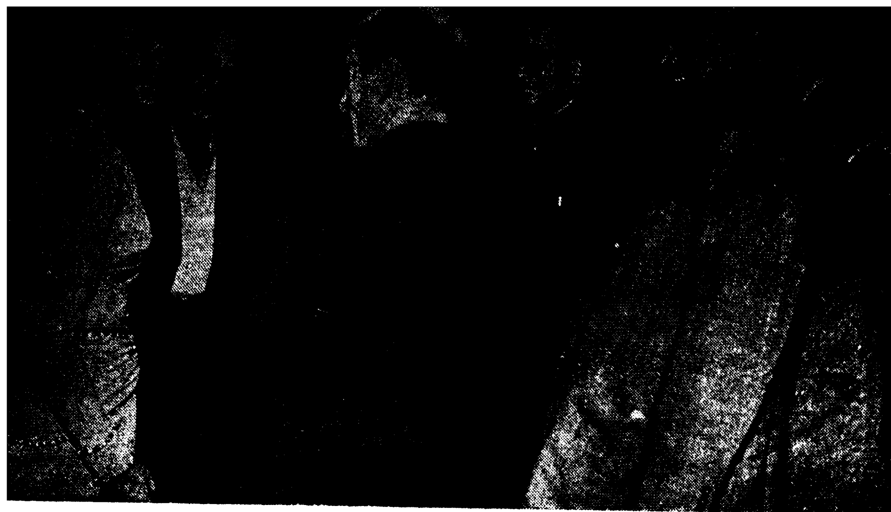
গ্যেটের হস্তাক্ষর



মিলন। শকুন্তলা, দুষ্মন্ত ও শিশুপুত্র ভরত (পৃঃ ১২৭)



হল ভরতি—পয়লা সারিতে গোনাগুনতি ক-খানা সিট রেখে দিয়েছে আমাদের জন্য। পয়লা সারির ডাইনে থেকে: লিজেল, লেখক, রাও, রাও-জায়া উমা, লীবার্গ, সজ্জাদ জাহির, মুলুকরাজ আনন্দ (পৃঃ ১২০)



দুষ্মন্ত একলা নয়, আমরা সবাই তোমার প্রেমে পড়ে গেছি শকুন্তলা (পৃঃ ১২৭)



বুকেনওয়াল্ড। ফটক ও অফিসঘরগুলো ঠিকই আছে। ... ফিরে আসব আবার এখানে, এদিকে ওদিকে একটা চক্কোর দিয়ে আসি আগে (পৃঃ ১৪৮)



অতিকায় ইলেকট্রিক চুল্লিগুলো হাঁ করে আছে, তার গহ্বরে চালান করে দিল মড়াগুলো। ... চুল্লির মুখেও বিস্তর মালা (পৃঃ ১৫১)



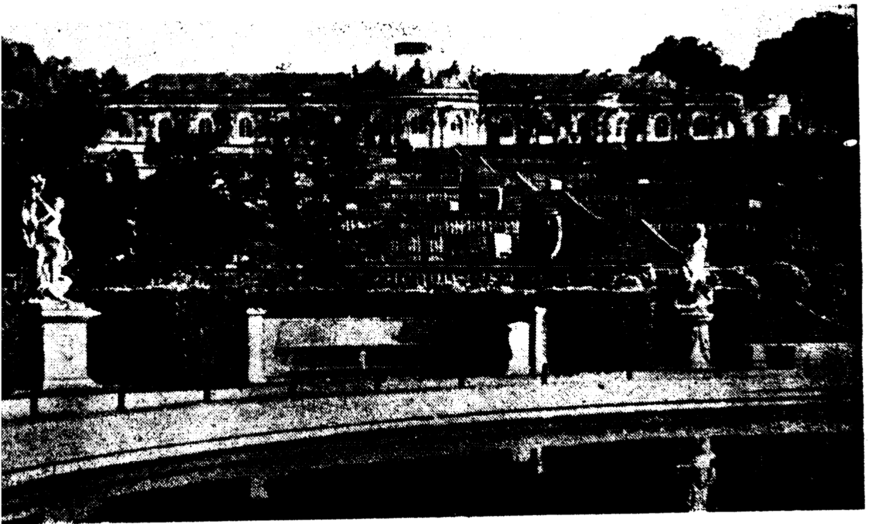
—গায়ে গায়ে এসো, হাত ধরো। হাত-ধরাধরি করে ছবি তুলব
ভারত আর জর্মনি (পৃঃ ১৯৫)



রিন গ্রাম। ... ইস্কুল বানিয়েছে, ঘর আর কতটুকু—বাগান ... (পৃঃ ২০৫)



চ্যানসেরি। ... মাঠ জঙ্গল। বড় বড় কংক্রিটের চাঁই পাহাড়ের
উঁচু হয়ে আছে (পৃঃ ১৮৫)



সাঁ সুসি। অনেক উঁচুর উপর অট্টালিকা। চওড়া সিড়ি উঠে গেছে (পৃঃ ১৯১)



ফ্রেডারিকের শোবার ঘরে (পৃঃ ১৯৩)

এক

বম্বে—দমদম থেকে সওয়া-পাঁচ ঘণ্টা। সামান্য পথ, কেউ আমলে আনে না। এক দৌড়ে গিয়ে পৌঁছব। কিশোর বয়সে যখন কলকাতা আসতাম, গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ত : সাবধানে যেও গো, সামাল হয়ে থেকো। আজকে বিদায় দিতে এসেছে শহরের মাত্র ক-জন। হাতের পুচ্ছ নেড়ে সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ সেরে প্লেনের খোপে ঢুকে কাগজ মুখে ধরে বসলাম। বড্ড গরম—পিচবোর্ডের পাখা নাড়ি প্রাণপণে। পাঁচ-সাত হাজার ফুট উপরে উঠে তবে কিছু আরাম পাওয়া গেল। পুব থেকে টানা পশ্চিমে। পাইলট স্লিপ পাঠাল—দেখুন, ঐ দেখুন, পায়ের নিচে হীরাকুঁদ বাঁধ। দিন পনেরো আগে সম্বলপুরে সভা করতে গিয়ে পায়ে হেঁটেছি ঐ বাঁধের উপর। এসিয়ার সবচেয়ে লম্বা বাঁধ। আবার একটু পরে খবর আসে : রায়পুর ঐ বাঁয়ে দেখুন। আবহাওয়া ভালোই—কিন্তু বারোটার মুখে বেশ খানিকটা দোলা দেবে। লাঞ্চের ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে ফেলুন তার আগে।

অতি উত্তম প্রস্তাব। বারো হাজার ফুট উপরে পুডিং মুরগির গোস্ত ইত্যাদি যোগে দিবাভোজ সেরে চেয়ার নামিয়ে জুতো খুলে কম্বল মুড়ি দিয়ে চোখ বুজেছি—জোরদার দোলন হোক, ঘুম জমবে ভালো। হলও বটে কিছু—মিনিট পাঁচেক কিঞ্চিৎ নাড়াচাড়া দিয়ে আবার যেমন-কে-তেমন। পাইলটের উপরে চটে গেলাম, এইটুকুর জন্য এতদূর আশা দেওয়া কেন? নগদ পনেরো টাকা ব্যয়ে ইনসিওর করে এসেছি। পথে যদি মারা পড়ি, মোটা টাকা। পুরোপুরি না মরে হাত-পা-চোখ-কান কোনো-না-কোনো অঙ্গের হানি ঘটলেও পড়তা কষে টাকা দেবে। কিন্তু বম্বের পথে তেমন-কিছু পাওনা ঘটবে, গতিক দেখে মনে হয় না।…

বম্বে এক লম্বা শহর। সমুদ্রের কিনারা ধরে চলেছে। ইলেকট্রিক-রেল শহরের সঙ্গে ছুটে যেন কূল পায় না। সমস্তটা দিন শহরের এমুড়ো-ওমুড়ো করছি। টিকা নিয়েছ তো? ইনকাম-ট্যাক্সের সার্টিফিকেট? ট্রাভেলার্‌স চেক? কী মুশকিল, ভিসা বাকি এখনো যে তিনটে দেশের! দেড় ডজন ফোটো চাই আর দেড় মুঠো টাকা। বিদেশে যাওয়া কী ঝকমারি! প্রতি বারেই মনে মনে কানমলা খাই: এই যা হল—কদাপি আর পা বাড়াচ্ছি নে দেশের চৌহদ্দির বাইরে। কিন্তু ফিরে এসে মনে থাকে না, বাইরের পৃথিবী হাতছানি দেয় আবার। কর্তারা দিনকে-দিন কড়াকড়ি বাড়াচ্ছেন। এই জানুয়ারিতে নিয়ম হল, শুধু মাত্র দু-শ সত্তর টাকা নিতে পারবেন সঙ্গে। পুরোপুরি তিন-শ নয়, অথবা আড়াই-শ-ও নয়—হিসাবকিতাব করে ওঁরা ঠিক করেছেন দু-শ সত্তর। সব বোঝা পরিত্যাগ করে বায়ুভুক ও পদচারী হয়ে ঘুরলেও ওতে কুলায় না। যেহেতু প্লেনে যাচ্ছেন, সাকুল্যে চুয়াল্লিশ পাউণ্ড ওজনের মাল নিতে পারবেন বিনা মাশুলে। নেহাতপক্ষে দুটো গরম স্যুট তো নেবেন—তবে আর চুয়াল্লিশের কত বাকি রইল, বিবেচনা করে দেখুন। ঝুলানো ব্যাগ কিনতে হল অতএব—দেখতে ছোট, ভিতরে অঢেল জায়গা। অবহেলায় হাতে ঝুলিয়ে নেব, তবে হয়তো ঐ বস্তুর ওজন না-ও করতে পারে।

সারাদিন এই সমস্ত করে, রাত দশটায় সাণ্টা-ক্রুজ এয়ারপোর্টে হাজির হলাম। অনেকে এসেছেন—ভারী দুজন গুণীও তার মধ্যে। ছবির পরিচালক হৃষীকেশ মুখুজ্জে এবং গানের পরিচালক হেমন্ত-কুমার মুখুজ্জে। কেমনতরো ব্যাপার—বড় হয়েও দুই মুখুজ্জের দেমাক নেই। লোকারণ্য—সাহেব-মেমও বিস্তর। কতক যাচ্ছে, কতক বিদায় দিতে এসেছে। আনন্দের কলরোল, চোখের কোণে জল।

কাস্টমসের হাঙ্গামা চুকিয়ে বাইরে এসেছি সকলে। আলোয়

আঁধারে মিশাল-করা মাঠ। সুপার-কনস্টেলেশন বিমানের অতিকায় লেজের উপর লাল-সবুজ আলো। ছুটোছুটি এদিকে সেদিকে। ক-মিনিট পরে দরজা খুলে দেবে, উঠে যেও তখন সীটের নম্বর অনুযায়ী। আমার আগের জন—আধ-অন্ধকারে মুখ ঠাহর হচ্ছে না—টুক করে ডানদিককার বেড়ার ধার ঘেঁষে দাঁড়াল। বেড়ার ওদিকে বিস্রস্তকেশা তরুণী। মুখ বাড়িয়ে দিল ওদিকে—রামোঃ, কী কাণ্ড দেখুন দিকি!

দরজা খুলেছে। সাত সমুদ্র পারে যাবার যাত্রিদল। পিলপিল করে প্লেনের গর্তের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। রুমাল উড়ছে ঝাঁকের পাখির পাখনার মতো। জয়ধ্বনি।

তিনটে কামরা। ট্যুরিস্ট অর্থাৎ নিচু ক্লাসের যাত্রী আমাদের মাঝের কামরা—প্লেনের বিশাল পাখা দৃষ্টিপথ যেখানে অবরুদ্ধ করে আছে। সহযাত্রী রাও বললেন, বাংলা বলুন, আমি বুঝতে পারি। আরও ভালো বাংলা শিখে নেব এই ক-দিনে আপনার সঙ্গে থেকে।

চুপ, চুপ, লাউড-স্পীকারে কী বলছে। এগারোটা-পাঁচ—এবারে রওনা। সাড়ে দশ ঘণ্টায় কায়রো। সাড়ে বারো হাজার ফুট উপর দিয়ে যাব, কিন্তু প্লেনের ভিতরে তিন হাজার ফুটের চাপ থাকবে। প্লেন বানচাল হলে লাইফ-ভেস্ট পরবে, ঐ যে সকলের মাথার উপরে তোলা রয়েছে। কেমন করে পরবে, দেখানো হচ্ছে হাতে-কলমে; একজনে পরে দেখাচ্ছে।

স্বাস্থ্যবান সুশ্রী এক যুবা বস্তুটা গলায় ভরে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে। হাঙ্গামা কিছু নেই। এইটে পরে কাচের জানলা খুলে টপ করে লাফ দেবেন; এবং তরতর করে নিচে নামবেন। হাজার তিনেক ফুট নিচে গিয়ে তখন টিপে দেবেন বোতাম। তা হলে ফেঁপে ফুলে উঠবে, আগে টিপলে কাজ হবে না কিন্তু। কায়দাটা শুনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আকাশ থেকে লম্ফ দিয়ে হিসাব

করে তিন হাজার ফুট নেমে এসে বোতাম টিপতে হবে। পর্বতে সমুদ্রে গাছের শাখায় কিংবা কাঁটাবনে যেখানেই পড়ুন না কেন, মালুম হবে ধপ করে যেন আরামের শয্যায় এসে পড়লেন।

এক মহিলা আঁতকে ওঠেন: বলো কী গো, প্লেন সত্যি সত্যি পড়ে যাবে নাকি ভুঁয়ে?

আজকেই পড়বে, তা কে বলছে? আবার পড়বে না, তা-ও কেউ হলফ করে বলতে পারে না। কায়দা জেনে রাখলেন, প্লেন পড়ে তো বয়েই গেল।

গর্জন উঠেছে, প্রপেলার সব কটা ঘুরছে। কথাবার্তা ডুবে গেল। সুন্দরী এয়ার-হোস্টেস ট্রে এনে সামনে ধরল। এলাচ-লবঙ্গ-লজেঞ্জস ও তুলো। আমরা কি নতুন যাচ্ছি প্লেনে যে তুলো নিয়ে কানে ভরতে যাব? আওয়াজে তালা ধরে যাবে, সে রকম কান নয়।

পুনশ্চ দেখা দিল হোস্টেস, গ্লাসে গ্লাসে কমলার রস বিলোচ্ছে। আলো নিভেছে। জোনাকির মতন একটা-দুটো ক্ষীণ আলো কারো কারো মাথার উপরে। বই পড়ছে। তা-ও নিভে গেল শেষটা। নিশিরাত্রে ঘোর রবে উল্কার বেগে ছুটেছি। পাখার গহ্বর থেকে লাল আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। ভয়াবহ। নিচে—অনেক নিচে আমাদের বসতির পৃথিবী। মাটি নয়, জল—আরব-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে

সকলে দিব্যি ঘুমুচ্ছে, আমার ঘুম নেই। চাঁদ হাসছে কাচের জানলার ঠিক ওপারে—দিকহীন আকাশে মুখোমুখি চাঁদ আর আমি। বসে বসে ঘুমুতে হবে এ কেমন জ্বালা! এয়ার-হোস্টেস একাজ সেকাজ নিয়ে চলাচল করছে নিঃশব্দ ছায়ার মতো। কানে আসে চার ইঞ্জিনের সবগুলো প্রপেলারের একটানা আওয়াজ।

চোখ বুজে এসেছে কখন। টের পাচ্ছি, বিষম দুলছে প্লেন—নাগরদোলার মতো। হু-হু করে নেমে যাচ্ছে ধরিত্রীর দিকে, সামনে

নিয়ে আবার উঠছে। এলোমেলো আবহাওয়া—বাতাসের গহ্বরে পড়ছে আর কি! মাটির দেশের কটি ছেলেমেয়ের আধশোয়া অবস্থায় ঘুম হচ্ছে না—অন্তরীক্ষের কোন মা-জননী দোলা দিচ্ছেন : ঘুমা, ঘুমা! খণ্ড-চাঁদ হাসতে হাসতে ছুটছে পাশাপাশি—জ্যোৎস্নার আলো পাতলা চাদরের মতো গায়ে লেপটে পড়েছে সকলের। ভারী সুন্দরী এক মেয়ে বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে—তীক্ষ্ণ নাক, কমলকলির মতো চোখ, একমাথা রুক্ষ ঘন চুল মুখখানা আধেক ঢেকে ছড়িয়ে আছে। একটা হাত পাশের সীটের মানুষটির গায়ে গিয়ে পড়েছে—আলসে পড়ে আছে অমনি ভাবে। নিচের আরব-সমুদ্রে তোলপাড় চলেছে হয়তো এখন। পৃথিবীর নানান দেশের জন পঞ্চাশ নরনারী আমরা—সাদা রঙের, গোলাপ-ফুল রঙের, কালো রঙের, ঘোর কালো রঙের—বিচিত্র মানুষের ছোট্ট একটি পরিবার দেশদেশান্তর পাড়ি দিয়ে ছুটেছি।

ভোরের আগে ঘুম ভেঙে গেছে। উঁকিঝুঁকি দিয়ে আবার চোখ বুজি। কেউ ওঠে নি, আমি একলা জেগে উঠি কেমন করে? লজ্জা লাগে না? ডাঙার উপর দিয়ে যাচ্ছি, জল পার হয়ে এসেছি। তরঙ্গিত বালুকা—বালির পাহাড়ও দেখতে পাই। আরবের মরু। মরুভূমির উপর দিয়ে প্লেন গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, এমনি এক-এক বার মনে হয়।

সামনের সারিতে রাও ও তাঁর স্ত্রী। কষ্টেসৃষ্টে একটুকরা বাংলা ছাড়লেন : ঘুম কেমন হল?

তাই শুনে ওদিক থেকে একজন বলেন, কলকাতা থেকে আসছেন আপনি?

তিনিও বসু, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। ফ্যাক্টরি আছে শালিমারে। অনেকবার ইয়োরোপ ঘুরেছেন। এবারও এই বেরিয়ে পড়েছেন মাস তিনেকের মতো।

ভদ্রলোক বললেন, আপনার সঙ্গে বাংলা বলবার জন্য উনি আঁকুপাঁকু করছেন, তাইতে টের পেলাম আপনি বাঙালি। কিছু মনে করবেন না—লেখা পড়ে কিন্তু মনে হয় বিস্তর কম বয়স আপনার।

তবে তো না দেখলেই ভালো ছিল—

কথাটা বলে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না।

অনেক মুখে শুনে শুনে এখন আর কিছু মনে করি নে। সৃষ্টি-কর্তা ঈশ্বরেরও ঠিক এই গতিক—বুঝেসমঝে ঐ জন্যে অদর্শন হয়ে থাকেন। ঐহিক মানুষ আমাদের সংসার করে খেতে হয়—দেখা না দিয়ে উপায় তো নেই।

ভোরের চা এনে দিল। সঙ্গে টোস্ট আর আপেল। ওরে বাবা, কী লাইন হয়ে গেছে ওদিকে! জায়গা নেই, চায়ের পাট সেরে তারপরে ওদিককার ভাবনা ভাবা যাবে। জায়গা বদলাবদলি হচ্ছে—যেই সরেছি, টুক করে একজন আমার জায়গায় বসে পড়েছেন। ফিরে এসে অতএব আমি বসেছি তাঁর জায়গায়—রাতের ঐ সুশ্রী মেয়েটার পাশের সীটে। হাসছে আর বকবক করছে, আর দেদার সিগারেট ওড়াচ্ছে জানলার দিকে এক তরুণ ছেলের সঙ্গে। একটা শেষ হল তো আবার ধরাচ্ছে, ছেলেটার হাতেও গুঁজে দিচ্ছে আর একটা। ছেলেটার সঙ্গে আলাপ হল খানিক পরে—সিন্ধুদেশে ঘর, ঘরদুয়োর ছেড়ে এসে বম্বের এক জাহাজে চাকরি করে, তাদেরই কাজে লণ্ডন যাচ্ছে। এখনকার বড় কাজ দেখছি, মিনিটে মিনিটে দেশলাই জ্বেলে তরুণীর সিগারেট ধরিয়ে দেওয়া—এবং সেই কাঠিতে নিজেরটা ধরানো। তিনটে প্যাকেট দেখতে দেখতে ছাই। একবার হঠাৎ আমার দিকে ফিরে সিগারেট বাড়িয়ে মেয়েটা বলে, ইচ্ছে করুন—

ধন্যবাদ, চলবে না।

অবাক হয়ে তাকাল যেন একটু। সঠিক বলতে পারব না, মনে হল সেই রকম। আকাশের নিচে এমন বুড়বাকও আছে যার সিগারেট চলে না!

তখন অন্য কথা পাড়ে : লণ্ডন যাওয়া হচ্ছে ?

উঁহু, প্রাগে নেমে পড়ব। রাতটুকু কাটিয়ে সকালবেলা বার্লিন।

মেয়েটা উল্লাসভরে বলে, আমিও বার্লিনের। দিল্লি থাকি, ছ-মাস পরে দেশে ফিরছি।

পরিচয় নিচ্ছে : বার্লিনে উঠবেন গিয়ে কোথা ?

সে তো জানি নে। আকাদেমি অব আর্টস দাওয়াত পাঠিয়েছেন, তাঁরাই দেখবেন।

অ্যাঁ, লেখক আপনি ? দিল্লিতে শুনেছিলাম লেখকেরা যাচ্ছেন—সেই আপনারা ? আর কে কে আছেন দলে ? কী আশ্চর্য, এক প্লেনে যাচ্ছি লেখকদলের সঙ্গে ?

কায়রোয় ব্রেকফাস্ট, রোমে লাঞ্চ। প্রাগে ডিনার। ভুবন ভরে খানাপিনার বন্দোবস্ত। তাই দেখুন, কত ছোট হয়ে গেছে পৃথিবী। পা ফেলতে পারি নে। এইটুকু জায়গায় আর কুলায় না, গ্রহ-গ্রহান্তরের এবার খোঁজ পড়েছে। জায়গা-জমি বেচাকেনা শুরু হয়ে গেছে ভিন্ন গ্রহে।

কায়রো এরোড্রোমে প্রথমেই বড় বড় লেখাগুলোয় নজর পড়বে : অতিথিরা আমাদের পরম বন্ধু। সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন, বিস্তর এমনি ভালো ভালো কথা দেয়ালে সাঁটা। উঠে গেলেন দোতলায়। যতবড় বন্ধুই হোন, অতঃপর আর নিচে নামবার এক্তিয়ার নেই। প্লেন ছাড়বার সময় হুকুম আসবে—নেমে গিয়ে তখন নির্দিষ্ট পথে খোপে গিয়ে উঠবেন। আপাতত আরাম করে বসুন অথবা ঘোরা-ফেরা করুন উপরতলার হলঘরে। মিশরের কত দিকে কত উন্নতি সেই কাগজপত্র পাঠ করুন, এবং নিয়ে যান বন্ধুবান্ধবদের দেখানোর জন্য। কিংবা জানলা দিয়ে মরুভূমির মধ্যে সাদা সাদা অগণ্য দালানকোঠা নিরীক্ষণ করুন—নতুন কায়রো ঐদিকে বেড়ে আসছে। এ-সবে কোনো বাধা নেই। আঘাত পেয়ে পেয়ে মিশর এখন ভারি সতর্ক।

বেলা দশটা। ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে এলাম। টুকরো টুকরো দ্বীপ ছড়ানো এখানে-সেখানে। অদূরে ডাঙার মতন দেখা যায়। ঘন নীল জলের গা ছুঁয়ে আঁকাবাঁকা ঐ বুঝি স্থলরেখা। আর মেঘ—ডাঙার গায়ে মেঘ লেপটে রয়েছে যেন। পিছন সারিতে জানলার কাছে একটা জায়গা পেয়ে খাতা বের করে টুকছি। বিদেশে যাওয়ার সময় খাতা বেঁধে নিয়ে যাই। একটা নয়, অনেকগুলো—ফিরে এসে ভালোমানুষ পাঠকদের জ্বালাতন করব বলে।

যা দু-চোখে পড়ে, লিখে রাখছি আমার খাতায়। হেনকালে বার্লিনের সেই মেয়ে পাশে এসে বসল। স্বাস্থ্যটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের ভালো, তবু সুন্দরী মেয়ে। আর সুমিষ্ট হাসি। লেখক শুনে গলে গিয়েছে। বলে, দিল্লি থেকে শুনছি লেখকেরা যাচ্ছেন আমাদের দেশে। কী ভাগ্য, প্লেনের মধ্যে আপনাদের পেয়ে গেলাম।

বলছে, বই কতগুলো আছে? ওরে বাবা, আমাদের দেশে তো সারা জন্মে দশ-পনেরোটার বেশি কেউ বড় লিখে উঠতে পারে না। কী টুকছেন? লিখবেন তো আমাদের জর্মনি দেশ নিয়ে?

জিজ্ঞাসা করি, বন্ন্ কতদূর বার্লিন থেকে?

কে জানে! তিন-শ মাইলের কাছাকাছি হবে। যাই নি কখনো। ছোট্ট জায়গা—ওরা রাজধানী করেছে বলেই বন্ন্-এর আজ নাম শুনতে পাচ্ছেন।

খাসা ইংরেজি শিখেছ তো তুমি। শিখলে কোথা?

সলজ্জে মেয়েটি বলে, না না, কী যে বলেন! বার্লিনের ইস্কুলেই একটু-আধটু যা শিখেছি। ক-জনই বা জানে! আপনাদের দেশে দেখছি সবাই প্রায় ইংরেজি বলতে পারে। খাসা বলে। আর আপনি আমার ইংরেজির তারিফ করছেন!

দু-শ বছর ইংরেজ কাঁধে চেপে ছিল, আমাদের দায়ে পড়ে শিখতে হয়েছে। তোমাদের সে ব্যাপার নয়।

খাতার সর্বশেষ পাতাটা বের করে বলি, নাম বলো তোমার, লিখে রাখি। মিস—

মিরকে। মিস নয়, মিসেস। বিয়ে হয়েছে, আমার ছেলে আছে।

স্তব্ধ হল। আর কথা বলছে না। আগের সারির সেই ছোকরা সিগারেট বের করে ঘাড় বেঁকিয়ে একটা দিচ্ছে মিরকের হাতে গুঁজে। মেয়েটার অনেক সিগারেট খেয়েছে, একটা তার শোধ দিচ্ছে। মিরকে দেখছে চোখে, কিন্তু বুঝতে পারে না যেন কিছু। হাত নেড়ে সিগারেট সরিয়ে দিল। আমায় বলে, ইংরেজি জানি বলেই আসতে হল এক মাসের ছেলেটা ফেলে। দিল্লিতে আমাদের ব্যাপার-বাণিজ্যের অফিস, সেইখানে চাকরি নিয়ে এলাম। ছ-মাস হয়ে গেল। কাল দেখতে পাব ছেলে। দেখবেন আমার ছেলে, দেখবেন কী রকম ?

চামড়ার চিত্র-বিচিত্র ভ্যানিটি-ব্যাগ, দিল্লিতে কেনা। সেই ব্যাগ খুলে মোটা এক লেফাফা বের করল। তার ভিতরে পরম যত্নে রাখা ফোটোগ্রাফ। মুগ্ধ চোখে মিরকে ছবি দেখছে। বলে, আমার ছেলে! গেল মাসে এই ফোটো পাঠিয়েছে। আরও বড় হয়েছে এই এক মাসে—কী বলেন ? আচ্ছা, ছেলে আমায় চিনতে পারবে ? কাছে আসবে না ? কাঁদবে—খুন হবে কেঁদে কেঁদে ?···

আবার একটা দ্বীপ—লম্বা একফালি ডাঙা। তার ঠিক উপর দিয়ে যাচ্ছি। ডাঙার উপরেও জল দেখা যায়। নিস্তরঙ্গ নীল জল—বড়, খুব বড় দীঘির মতন। মাঝে মাঝে গাছপালা। ঘরবাড়িও দেখা যায় অতি ক্ষুদ্র খেলাঘরের মতন। স্তূপীকৃত সাদা মেঘ কিছু দূরে—সাদা তুলো পাহাড়ের মতন করে গাদা দিয়ে রেখেছে যেন।

দ্বীপটুকু ছাড়িয়ে আবার জল। জলের সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ এক এক সাদা মেঘ। ওগুলো দ্বীপের টুকরো। অকূল জলের উপর মেঘগুলো আশ্রয় খুঁজে খুঁজে হঠাৎ ডাঙা পেয়ে সেখানে গড়িয়ে পড়েছে। শুয়ে পড়ে রোদ পোহাচ্ছে।

জলের উপরে উড়ছি—উড়ছি। বরফের চাঁই নাকি ওগুলো? বরফ নয়—ঠাহর করে দেখুন, মেঘ। দলা দলা মেঘ জলের উপর কেমন করে ছড়িয়ে গেছে। জলে ভাসছে মেঘ। লেবুর রস ও স্যাণ্ডউইচ দিয়ে গেল আর একবার। সত্যিই ডাঙা—নিচে দেখছি, জল নেই আর, ডাঙার উপর দিয়ে যাচ্ছি। ঘন মেঘের আস্তরণ—মেঘ কেটে গিয়ে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট দেখাচ্ছে পরক্ষণে। জনালয়।

এয়ার-হোস্টেস বলল, মঁ ব্লা—ঐ যে, দেখুন ডাইনে তাকিয়ে। আল্পসের সর্বোচ্চ চূড়া। সবাই নিম্নমুখ। মিরকে আর সেই ছোকরা আবার গল্প জমিয়েছিল—সীটের হাতার উপর বসে ছোকরার কাঁধের উপর দিয়ে মিরকেও জানলায় তাকিয়েছে। কিছু দেখা যায় না। শুধু মেঘ আর মেঘ। ঝিকমিকে সাদা মেঘে সমস্ত ঢাকা। শহরের মতো দেখা যায় পাতলা মেঘের আড়ালে। ইয়োরোপের ঠিক কোন জায়গা? প্লেন নিচু হয়ে চলেছে, প্রপেলারের কড়া আওয়াজ একটু যেন মৃদু হয়েছে। খেতখামার পাহাড়ের উপরে থরে থরে নেমে গেছে। দীর্ঘব্যাপ্ত পাহাড়ের সারি—বড় রাস্তা—টালির ছাতওয়ালা বাড়ি—অগণ্য দালানকোঠা। প্লেন আরও নেমে এসে ধীরে ধীরে চলেছে। হলদে হলদে কী-সমস্ত ফুল ফুটেছে। ঘোলা জল এখানে-ওখানে। পাতলা ধোঁয়ার মতন মেঘ এক-এক বার দৃষ্টির সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। দূরবিস্তীর্ণ শহর। রোমে এসে পড়লাম তবে?

পূর্ব-জর্মনির রাজধানী বার্লিন। বার্লিন-সরকারকে আমরা স্বীকার করি নে, ওখানে ভারতের অ্যাম্বাসি নেই। আছে পশ্চিম-জর্মনির রাজধানী বন্ন্ শহরে। তবু কিন্তু ব্যাপার-বাণিজ্যের চুক্তি হয়েছে বার্লিন-সরকারের সঙ্গে। দিল্লি বম্বে কলকাতা—তিন জায়গায় ওঁরা তিনটে অফিস খুলেছেন। মিরকেকে দেখছেন, সে হল দিল্লি অফিসের। মেয়েটি একা নয়, আরও এক জর্মন তরুণ একত্র দেশে যাচ্ছে, তার নাম ফ্রিস (Fritsch)। সে হল বম্বে অফিসের।

মিরকে আপাতত ফিরছে না। ক্রিস যাচ্ছে দু-মাসের ছুটি নিয়ে। অন্য কামরায় বসেছে, এতক্ষণ তাই পরিচয় হয় নি। রোম ছেড়ে আকাশে উঠেছি, যেচে এসে তখন সে আলাপ করল। তোফা তোফা বিশেষণ ছাড়ছে।

কোত্থেকে জানলে এত সব ? মিরকের কাছে বুঝি ?

কতটুকু বা আলাপ তোমার মিরকের সঙ্গে ! সে কী জানবে ? ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমায় নিয়ে গল্প হল অনেক।

এক বাঙালি—প্রাণতোষকুমার সরখেল। শেল-পেট্রোলিয়ম কোম্পানির চাকরে—লণ্ডনে শিক্ষানবিশি বাবত যাচ্ছেন। ভিন্ন কামরায় ছিলেন বলে নজর পড়ে নি। তিনি আগে চিনতেন ; কিংবা হ্যাণ্ডব্যাগে ছাপা নাম সাঁটা ছিল, সেই থেকে ধরে ফেলেছেন। অবোধ জর্মন ছোঁড়াকে পাশে পেয়ে বাঙালি সাহিত্যিকের সম্বন্ধে সত্যমিথ্যা বলে একেবারে তাকে থ বানিয়ে দিয়েছেন।

সত্যি, অভিভূত হয়ে পড়ি আমার বাঙালি পাঠকদের অনুগ্রহ দেখে। কী ভালোবাসেন, কত সামান্যে তুষ্ট তাঁরা ! বিদেশে গিয়ে তাই আমি বাঙালি কেউ আছেন কিনা, সেই খোঁজ আগে করি। পাকা রকম জেনে বসে আছি, বাঙালি পেলে আর কিছু দেখতে হবে না, দায়ভার তাঁরাই কাঁধে নিয়ে নেবেন। এবারের ভ্রমণেও তাই দেখেছি। প্রাগে প্রথম পরখ হল, তার পরে জেনেভা, প্যারি, ব্রাসেলস, দি-হাগ, লণ্ডন সর্বত্র। এতদিনের এত ঘোরাঘুরির ভিতরেও আমার বিশ্বাসে এতটুকু চিড় খেল না। বাঙালির কাছে নামটা বললেই—ব্যস, পলকের মধ্যে পরিবারের লোক বনে গেছি, মেয়েদের সেই খাওয়ানোর পীড়াপীড়ি। দূর বিদেশ ঘুরছি, কে বলে আর তখন !

অচিরে জমে গেলাম ক্রিসের সঙ্গে। লড়াইয়ের সময় ১৯৪৩ অব্দে সে ইস্কুলের ছেলে—পনেরো বছর বয়স। সেইসব ভয়ানক দিনের গল্প করছে। রাত্রি হলেই তোলপাড় লেগে যায়, দুড়ুম-দাড়াম করে বোমা ফাটে বার্লিন শহরের উপর। সন্ধ্যাবেলা দেখলেন

আস্তানকোঠা, সকালবেলা হয়তো দেখবেন সেখানে ইট-লোহা-কংক্রিটের গাদা। ফ্রিসের বাপকে সৈন্যদলে নিয়ে কাঁহা-কাঁহা মুলুক পাঠিয়েছে। মিলিটারি ব্যবস্থায় তাড়াতাড়ি ছেলেকেও সরিয়ে দিল অনেক দূরে—চেকোস্লোভাকিয়ার এক তল্লাটে। মা আর বোন ছিল —তাদেরও নিয়ে গেছে কোথায়। ঘরবাড়ি পরিবার-পরিজন—ঝড়ের ঝাপটায় সমস্ত ছিটকে পড়ল যেন। কনসেনট্রেশান-ক্যাম্পেরও একটু আস্বাদ নিয়ে এসেছিল কটা দিনের জন্য—মানুষ হয়ে মানুষকে কী যন্ত্রণা দিতে পারে, সে আপনার ধারণায় আসবে না মশায়, জানোয়ারও এত হিংস্র হয় না মানুষের মতো। তারপর লড়াইয়ের অন্তে ফিরে এলাম বার্লিনে। নিজের জায়গা—আবাল্যের হাজার স্মৃতি জড়ানো—কিন্তু এসে দেখি, এ কোন জায়গা ? চিনতে পারিনে। ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপ। প্রথম দু-তিন মাস পাগলের মতন ঘুরে বেড়াতাম এ-রাস্তায় ও-রাস্তায়। এমন দশা কারো যেন কখনো না হয়। মা-বাপ-বোন সবাই একে একে ফিরল বার্লিনে—মানুষ কটিকে পাওয়া গেল, কিন্তু পুরানো সংসার আর জমল না।

ফ্রিস ঠিকানা লিখে দিল বার্লিনের, তাদের বাড়ির। বলে, বাড়ি দেখে মন খারাপ হবে তোমার। থাকি অতি সামান্য ভাবে। বার্লিনে বাড়ির বড্ড টান। ভাঙা ঘরে মাথা গুঁজে থাকি। নতুন বাড়ি পাওয়া যায় কোথা ?

রাশিয়ায় কিন্তু দেখে এসেছি আশ্চর্য ব্যাপার। ধ্বংসের চিহ্ন প্রায় কোথাও থাকতে দেয় নি। নতুন করে আরও ভালো করে ঘরবাড়ি বানিয়েছে। একটু-আধটু ইচ্ছে করেই রেখেছে ভয়ানক দিনের স্মৃতি হিসাবে।

ফ্রিস ম্লান কণ্ঠে বলে, তারা আর আমরা ! তারা বিজয়ী জাত—মনে কত স্ফূর্তি ! আমরা তো দুই ভাগ হয়ে আছি, শতেক সমস্যা। বার্লিন শহরেরও দুটো ভাগ। এমনও ছিল, একটা বাড়ির দুটো ঘর পূর্ব-বার্লিনে, দশটা ঘর পশ্চিম-বার্লিনে। যাচ্ছ যখন, স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

দুই

প্রাগে নামিয়ে দিয়ে আমাদের প্লেন হুশ করে লণ্ডন-মুখো উড়ল। কষ্টেসৃষ্টে আপাতত একদিনের ভিসা মিলেছে, রাতটুকু কাটিয়ে সকালবেলা বার্লিন চলে যাব। নেমন্তন্ন নিয়ে এসেছি, অঢেল পয়সা খরচ করে নিয়ে যাচ্ছে, যাব তো বটেই—কিন্তু এখন পর্যন্ত পুব-জর্মনির ভিসা মেলে নি। এই সোস্যালিস্ট দেশগুলো ভাবি সতর্ক, মানুষের উপর বড় সন্দেহ। টাকাকড়ি গুনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অমনি ভিসায় সিলমোহর মারবে, সে পাত্র এরা নয়। দেবে বিনামূল্যেই—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ইতালির মতো দোকান খুলে বসে নি। কিন্তু বায়নাক্কা বিস্তর। কারণ আছে অবশ্য। অনেকে ছারপোকার মতো নখে টিপে মারতে চেয়েছিল ওদের। সত্যি সত্যি যদি মরে—বিস্তর জাত বগল বাজাবে, বহুত মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। তাই দেখেছি, ভিসা দিয়েও পাসপোর্টের ছবির সঙ্গে বারংবার মিলিয়ে দেখে, সত্যি মানুষটা এই কি না। অথবা জাল। টাকা-পয়সা ও মালপত্র নিয়েও হরেক প্রশ্ন—পার্স এবং পোঁটলাপুঁটলি খুলে দেখিয়ে যাও। আর লণ্ডনে দেখুন না—আসবার সময় কাস্টমসে প্রশ্ন করছে: ব্রিটিশ-মুদ্রা নেই নিশ্চয় তোমার কাছে? আপনি ঘাড় নেড়ে দিন, ব্যস, হয়ে গেল। কখনো বলবে না, ব্রিটিশ-মুদ্রা আছে তোমার কাছে? যদি বলে বসেন, আছে কিছু—তখন গোনাগুনতি করো, অনেক বখেড়া। প্রশ্ন: এই যত বাক্স-পেঁটরা, নিশ্চয় তোমার ব্যক্তিগত জিনিস? এখানেও হাঁ বলে সরে পড়বার সুযোগ করে দিচ্ছে। অন্য জিনিসপত্রও আছে, এমনিতরো বলে আশা করি নিজের মুশকিল এবং ওদের ঝামেলা ঘটাবেন না।

আমাদের কিন্তু সহজে ছাড় হয়ে গেল। কলম-পিষে-খাওয়া কয়েকটি লেখক আশাসুখে নেমন্তন্নে যাচ্ছে, থাকবেও একটা রাত্রি

শুধু, সকালবেলা লটবহর নিয়ে সরে পড়বে—ইত্যাদি বিবেচনা অন্তে কর্তাদের করুণা হয়েছে বোধ হয়; বাক্স-পেঁটরার গায়ে দু-চারটে থাবড়া মেরেই সেরে দিলেন, খুলবার হুকুম হল না। কাউণ্টারের একদিকে ঠেলে গাদা করে অন্যদের নিয়ে পড়লেন।

তখন পরের ভাবনা। একটা রাত্রি বটে, কিন্তু এইখানে দাঁড়িয়ে বসে রাত্রি কাটানোর বোধ হয় ব্যবস্থা নেই। আশ্রয় আবশ্যক। কিন্তু কোথায়? অকূল সমুদ্রের মধ্যে ইতিউতি তাকাচ্ছি—ভাসমান কোন শুষ্ক কাণ্ড অন্ততপক্ষে। একটি লোক শুধুমাত্র নিখরচার উপদেশ দান করে যান, অন্য কিছু চাই নে।

টেলিফোন-ঘরে আনন্দ ঢুকে গেলেন। চেক সংস্কৃতি-দপ্তরের মাতব্বর এক ব্যক্তি—নাম ক্রাসা; তাঁর সঙ্গে চেনা আছে। ভারতে এসে ক্রাসা অনেকদিন ছিলেন, জলের মতো হিন্দি বলেন। তাঁকে ফোন করা হল: এসে পড়েছি মশায় আপনাদের দেশে। কী কাজে ক্রাসা বিষম ব্যস্ত। ফোনের মুখেই, আসুন আসুন—করছেন। পথের উপরে যখন, নিশ্চয় ট্রানজিট-হোটেলে নিয়ে তুলবে। হোটেলে গিয়ে মুখ-হাত ধুতে লাগুন, আমি আসছি।

আর এক বিপদ, উমা রাওয়ের পিপাসা পেয়ে গেল। ইয়োরোপের রেস্তোরাঁয় জল চেয়েছেন তো মনে মনে ভাববে, লোকটা অকৃত্রিম উজবুক। চাতকের মতো ফটিক-জল ফটিক-জল করে যতই গলা ফাটান, কোনো-কিছু কানে শুনবে না। মদ চান, তক্ষুনি এনে হাজির করবে। নিতান্ত পক্ষে মিনারল ওয়াটার। এরা কিন্তু সদাশয়, সাদামাঠা জল দিয়েই আতিথ্য করল। চা-কফি বা অন্য কিছু চেয়েছেন তো মূল্য নগদ চাই। ফেলো কড়ি মাখো তেল। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার কড়ি কোথায় পাচ্ছি আপাতত? ইয়োরোপ ঘুরতে এই বড় ফ্যাসাদ। বিশ পা না যেতেই একটা করে দেশ শেষ হয়ে যাচ্ছে—তখন বের করো পাসপোর্ট-ভিসা, খোলো বাক্স-প্যাঁটরা, বদলাও টাকা-পয়সা। পাউণ্ড বদলে ক্রোনিন করব, তার ল্যাঠা

বিস্তর। তা ছাড়া সামান্য সম্বলের উপর হাত ঠেকাতেও চাই নে পারতপক্ষে।

নিমন্ত্রক তরফের কেউ এসে পড়লে যে হত! তা হলে ভাবনা থাকত না। সাদা জল কেন, লাল হলদে তখন যত রকমের যে পরিমাণ খুশি। এবং পান করা বলে কি, হাত-পা মেলে সাঁতার কাটবেন—টুপ করে ডুবেও মরতে পারবেন। চীন ও রাশিয়া ঘুরে এমনি ব্যাপার দেখে এসেছি। কিন্তু দোষ আমাদের—সঠিক তারিখ জানিয়ে খবর দেওয়া হয় নি। জর্মনিতে এসে পৌঁছবার কথা এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে, মে মাসের মাঝামাঝি এখন। ভদ্রলোকেরা জানবেন কী করে যে ভাগ্যাকাশে এতকাল পরে আজ সন্ধ্যায় হঠাৎ সূর্যোদয় হয়েছে।

যাই হোক, জেনেছেন অবশেষে কেমন করে—বেঁটে-খাটো এক জোয়ান পুরুষ উদয় হলেন। জর্মন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক—সাদা কথায় যার নাম পূর্ব-জর্মনি—সেই তরফেরই মানুষ বটে। কিন্তু আমরা যাঁদের চাচ্ছি তাঁরা নন, আকাদেমির কেউ নন। প্রাগে ওঁদের কনস্যুলেট আছে, সেখান থেকে পাঠিয়েছে ভিসার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য। দোরগোড়ায় এসে পড়েছি, এইবার ভিসার হুঁশ হল। লোকটি এসে পাসপোর্টগুলো নিয়ে নিলেন: ভিসায় সিলমোহর বসিয়ে সই সেরে এক্ষুনি ফেরত এনে দিচ্ছি। হোটেলে গিয়ে পৌঁছুতেই হাতে-হাতে সমস্ত পেয়ে যাবেন।

শহর থেকে অনেকটা দূরে এরোড্রোম—সর্বত্র যেমন হয়ে থাকে। এই সন্ধ্যা থেকে পুরো একটা রাত্রি—আচ্ছা, শহরটা এক পাক ঘুরে দেখে এলে কেমন হয়? ট্যাক্সি করে যেতে হবে, কড়ির প্রয়োজন অতএব। বার্লিনের মাটিতে যতক্ষণ না পা পড়ছে, এয়ার-ইণ্ডিয়া আমাদের মুরুব্বি। কিন্তু খানাপিনা দিচ্ছেন বলে ঘোরাঘুরির খরচাও দিতে যাবেন কেন তাঁরা? আনন্দ বললেন, চুলোয় যাকগে। এক পাউণ্ড করে বের করুন সকলে, ক্রোনিনে ভাঙিয়ে নিই।

টাকা ভাঙানোর ব্যাঙ্ক আছে এরোড্রোম এলাকার ভিতরে—ভিনদেশি যাত্রীর যদি প্রয়োজনে লাগে। প্রবীণ এক ব্যক্তি কাউণ্টার আগলাচ্ছেন। নোট কখানা নেড়েচেড়ে দেখে প্রশ্ন করলেন, ভাঙাতে চান ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সরকারি দর উনিশ ক্রোনিন। আমরা কিন্তু তাই দেবো।

এর উপরে কথা কী! নিশ্চিন্তে হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। ভদ্রলোক তবু ইতস্তত করেন। গলা নিচু করে হঠাৎ বলে উঠলেন, কেন খামকা লোকসান দেবেন ? বিদেশি লোক বলেই বলছি। শহরে চলে যান, যে-কেউ ষাট ক্রোনিন দেবে। ব্যাঙ্কে কি জন্য মরতে এসেছেন ?

ষাট আর উনিশ—ফারাকটা বিস্তর। নোট সঙ্গে সঙ্গে পকেটে পুরেছি। মুশকিল হচ্ছে, শহরে গিয়ে পৌঁছলে তবে তো ষাট। পৌঁছুতেও তো ক্রোনিন লাগবে। এক ভরসা, ক্রাসা আসছেন। ধরে পড়ে তাঁর গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। শহরে পৌঁছুলে তো শাহানশাহ্—এক পাউণ্ডের ক্রোনিনে দু-পকেট ভরতি।

এর পরে আবার যখন প্রাগে এসেছিলাম—সেই সময় টের পেলাম, ব্যাঙ্কের মানুষটি নিতান্ত বিনয়বশত বলেছিলেন ষাট ক্রোনিন। আশি তো বটেই, চাপাচাপি করলে এক-শ অবধি স্বচ্ছন্দে তোলা যায়। সোস্যালিস্ট দেশে বিলাসবস্তু জোটানো দায়। মানুষ কিন্তু বারো মাস তিরিশ দিন শুধুমাত্র অত্যাবশ্যক কটি জিনিসে খুশী থাকে না; বে-দরকারি অপব্যয়ের জন্য মন উসখুস করে। বিশেষ করে হাতে যখন দেদার ক্রোনিন—খরচ করে ফুরানো যাচ্ছে না। অতএব খোঁজ নাও কালাবাজারের, যোগাড় করো স্টার্লিং-পাউণ্ড যতই চড়া দাম হোক না।

বাইরে এসে চোখ জুড়িয়ে যায়। সবুজের সমুদ্র। মরি মরি, কী ফসল ফলেছে! একচোখো লক্ষ্মীঠাকরুন এই তল্লাটে ঝাঁপি

উজাড় করে এনে ঢেলেছেন। এখানে দুটো ওখানে বা চারটে ঘর-বসতি। বাসে পুরে নিয়ে চলল ট্রানজিট-হোটেলে। মাঠ ছাড়িয়ে এক বড় পাড়ার মধ্যে এসে পড়লাম। মানুষের একই হালচাল দেখি দুনিয়ার সর্বত্র—এক স্বভাব। আমার এই কলকাতার পাড়ায় কিংবা বারাসতে অথবা নবদ্বীপে যেমন দেখেন—প্রাগেও আলাদা কিছু নয়। রাস্তার ধারে খেলা করছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা, দরজা অল্প একটু ফাঁক করে উঁকি দিয়ে দেখছে বাড়ির একটি মেয়ে।···আঁকাবাঁকা গলিপথ বেয়ে এগুচ্ছে আমাদের বাস।

হোটেলে এলাম। প্রৌঢ় এক ব্যক্তি—মহা পণ্ডিত, পৃথিবীর তাবৎ ভাষায় দখলিকার। কথাবার্তায় তাই তো মনে হল। ইংরেজি বলছে, ফরাসি বলছে, জর্মন বলছে। রুশটাও জানে—সেটা মুখে জানাল, বলে শোনাল না। বাহুতেও বিপুল শক্তি। আমাদের পাঁচজনের এই বড় বড় সুটকেস—গোটা তিনেক এ-হাতে, গোটা তিনেক ও-হাতে তুলে নিল—যেন তুলোর বালিশ তুলে ধরেছে। ইয়োরোপ জায়গা—যার জিনিস সেই লোকেরই যথাসম্ভব বয়ে নেওয়ার নিয়ম। আমরা আহা-ওহো করে জিনিস ধরতে যাই তো দ্রুত এক ঘুরপাক দিয়ে হঠিয়ে দেয় সকলকে।

—মালপত্র ঘরে ঘরে রেখে আসি, কেমন ?

সে-ই ভালো। লটবহর তালাবন্ধ থাকুক। হাত-মুখ ধুয়ে আমরা এদিকে চা-টা খেতে খেতে ক্রাসা এসে যাবেন। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ব।

—কাগজ দেখি।

কাগজ, কিসের কাগজ গো ? এয়ার-ইণ্ডিয়ার তাঁবে রয়েছি, যা-কিছু লিখবার তারাই লিখে দেবে। হোটেলের যাবতীয় খরচা তাদের।

—কাগজ আন নি, তবে আর কী করব !

দু-হাতের মালগুলো ঢিবঢাব ফেলে দিল করিডরের উপর। যেতে যেতে আমরাও থমকে দাঁড়িয়ে গেছি।

—কী হল ?

—আমি কী করব বলুন। দাম কে দিচ্ছে, আগে তার আশকারা হওয়া চাই।

মুখের দিকে চেয়ে খানিকটা সদয় ভাবে আবার বলল, বিদেশের অতিথি—আচ্ছা, এক কাপ করে চা খেয়ে নিন। শুধু চা। যায়, গচ্চা যাবে। কিন্তু কাগজ না পেলে ঘর দিতে পারব না। সাফ কথা। মালপত্তোর এইখানে রইল।

চটেমটে বলছি, দাম অন্য কেউ না দেয় আমরা রয়েছি। পাউণ্ড ভাঙাব, উনিশ ক্রোনিনই সই। ম্যানেজারকে ডাকো, তাঁর সঙ্গে কথা বলি।

দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। ধপ করে এক চেয়ারে বসে পড়ে বলল, আমি—আমিই আপাতত ম্যানেজার। কী বলতে চান বলুন।

—একটা লোক দাও, এরোড্রোমে চলে যাক। কাগজ-টাগজ যা দরকার নিয়ে আসুক।

—ফালতু লোক কোথা ? বলো তো আমিই যাই। তা হলে চা হবে না কিন্তু, চা দেবে কে তোমাদের ?

আবার বলে, ফোনে কথা বলো এরোড্রোমের সঙ্গে। তারাই লোক দিয়ে পাঠাক।

তাই হল। আনন্দ ফোনে কথা বলছেন। কথা নয়, কলহ দস্তুরমতো। কাগজপত্রের দরকার—তা দিয়ে দাও নি কেন আমাদের সঙ্গে ? কী রকম ব্যবস্থা তোমাদের ?

কাজকর্মে ছুটাছুটির মধ্যে লোকটিও কান পেতে দু-এক কথা শুনেছে। ফোন ছেড়ে দিতে কাছে এসে দাঁড়াল। সহানুভূতিতে গদগদ। বলে, ঠিকই তো ! বিদেশি লোক—এত সব বায়নাক্কা কি করে জানবেন ? আসুন আপনারা, চলে আসুন। ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। চায়ের টেবিল সাজিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দেব, তখন নিচে আসবেন।

—কাগজ ?

—তারা পাঠাবে, নয়তো আমিই আনিয়ে নেব। অতিথি মানুষ এত দূর থেকে কষ্ট করে এসেছেন, আপনাদের কেন ভোগান্তি হবে আমাদের দোষে ?

সেই গন্ধমাদন আবার ঘাড়ে তুলে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। পিছনে আমরা। পর পর ঘর দেখিয়ে দিচ্ছে।

আনন্দ বলে উঠলেন, এই প্রাগে আবার আসব সরকারি দাওয়াত নিয়ে। এতক্ষণ এই পথে ফেলে রাখার শোধ তুলব সেইদিন।

মিরকে ও ফ্রিসও দেখি উঠেছে এসে এখানে। ওদের ঝামেলা নেই, অনেক আগে তাই হোটেলে এসে গেছে। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম-সুখ নিয়ে বেরুচ্ছে এবারে। দেশের একেবারে গায়ে এসে পড়েছে, ছোটখাট আর-একটি লম্ফের পথ, কাল সকালের প্লেনে বার্লিন পৌঁছুতে এক ঘণ্টা মাত্র লাগবে। ট্রেনেও যাওয়া চলে—কিন্তু লাভ নেই, নিশিরাত্রে ট্রেনে চেপে সকালবেলা প্রায় একই সময় পৌঁছানো যায়। কী দরকার—নিশ্চিন্ত উল্লাসে ওরা দুজনে শহরের দিকে চলল। কেনাকাটা করবে কিছু, দেখাশুনা করবে মানুষজনের সঙ্গে।

আকাশ কখন মেঘে ঢেকে গেছে—শোঁ-শোঁ করে বাতাস ছাড়ল। তারপর বৃষ্টি। একটানা চলল কতক্ষণ ধরে। খানাঘরে ডাক পড়েছে। একতলার পরেও সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিচে নামছি। যেন পাতালরাজ্য। নামতে নামতে এই রকমই মনে হচ্ছে, কিন্তু খানাঘরে গিয়ে জানলায় দেখছি—পৃথিবীর উপরেই আছি বটে, এমন কি জমির লেবেলের বেশ খানিকটা উপরেই। পাহাড়ে জায়গা—উঁচু টিলার মাথায় হোটেল—টিলার একদিককার ঢালুর গায়ে এই খানাঘর। খাব কি—জানলা দিয়ে দূরবিস্তৃত বোহেমিয়া-ভূমির উঁচুনিচু সবুজ সৌন্দর্য দেখছি। বৃষ্টিস্নাত শুদ্ধ শুচি চেহারা। ঘরবাড়িগুলো লাল টালির টুপি পরে আছে মাথায়; বাংলা বর্ণপরিচয়ে দীর্ঘ-উতে

ঊর্ধ্ববাহুর ছবি দেখেছেন, বাড়িগুলো তেমনি এক-এক চিমনির বাহু বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশমুখো।

সেই লোকটি হন্তদন্ত হয়ে খবর নিয়ে এলো : ক্রাসা ফোন *করলেন, এখন আসতে পারছেন না তিনি। ভারি এক জরুরি কাজ নিয়ে পড়েছেন। আসবেন ঠিকই—এসে পৌঁছতে বেশি রাত্রি হবে।*

নিশ্চিন্ত। শহরে যাওয়ার কোনো আশা নেই। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। বাঁচা গেল—আরামের বিছানায় শুয়ে চোখ বুঁজে মনের আনন্দে বৃষ্টির আওয়াজ শুনিগে।

তিন

ভালো করে ভোর হয় নি—সাত-সকালে উঠে পড়েছি। কাচের জানলায় ডবল-পরদা—পরদা সরিয়ে দিয়ে লিখছি কাচের গায়ে বসে। লিখতে লিখতে পাখির গানে মাথা তুলে তাকাই। আমার দেশের কোনো চেনা পাখির কূজন নয়। কিন্তু ভারি মিষ্টি সুর, কালোয়াতের মতন ইনিয়ে-বিনিয়ে গাইছে। পাহাড় ধাপে ধাপে অনেকখানি উঁচু হয়ে গেছে জানলার ঠিক বাইরে। বিস্তর ঘরবাড়ি—পাকা দেয়াল, টালির ছাউনি। একটা ঐ অদ্ভুত ঘর—আগাগোড়া কাঠে বানানো, ছাতও কাঠের। কী সবুজ চারিদিকে! আপেল ও কত রকম ফলের গাছ। চেস্টনাট গাছগুলোর ডাল ভেঙে পড়ে বুঝি সাদা সাদা ফুলের ভারে। ঈষৎ ভায়োলেট রঙের ফুলে আচ্ছন্ন আর-এক ধরনের গাছ অজস্র। ঘাসের ভিতর পোকার আওয়াজ। ফসলের খেত দেখুন পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে চৌরস-করা ভূমিতে। মুরগি ডাকছে চারিদিক থেকে। গাছের পাতা নড়ছে খুব—বাইরে অতএব বাতাস উঠেছে, আঁটা-জানলার ঘরে বসে ঠাহর পাচ্ছি না। মেঘলা আকাশ —গদাইলস্করি চালে মেঘপুঞ্জ নড়াচড়া করছে, আজকেও বৃষ্টি হবে আবার। কলকাতায় গ্রীষ্মের আগুনে পুড়ে মরছিলাম—সেই তপ্ত কড়াই থেকে একছুটে পালিয়ে এসে কাল রাত্রে হোটেলের খাটে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছি।

দিব্যি ফরসা হয়েছে, মানুষজন তবু তো এখনো জাগল না। নিস্তব্ধ নির্জন। কত বেলায় এরা ওঠে, কে জানে? খুব ঠাণ্ডা নিশ্চয় বাইরে। আমার বোঝবার উপায় নেই, বৈদ্যুতিক উত্তাপে গরম-করা ঘর। যন্ত্রটা আমার টেবিলের পাশেই। টেবিলের নিচেটা অতিরিক্ত গরম—দুই পা তুলে তাই উবু হয়ে বসছি মাঝে মাঝে চেয়ারের উপর। এবাড়ি-ওবাড়ির চিমনির মুখে ক্রমশ ধোঁয়া দেখা দিচ্ছে।

অর্থাৎ জাগরণের লক্ষণ এতক্ষণে এইবার—ঘরে ঘরে ঘরকন্নার শুরু।

বাস এসে হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়েছে। এরোড্রোমে পৌঁছে দেবে আমাদের। একরাত্রি বসবাসের ইতি। আবার আসব প্রাগে—এমন রবাহূতের মতো নয়। মালা নিয়ে সেদিন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আমাদের খাতির করে ডাকবার জন্য।

নিচু হয়েছে প্লেন, বেগ কমেছে। ফসলের সবুজ মাঠ—নদী-খালে ভরা। বার্লিনে নামলাম। এরোড্রোমের চেহারায় দেখছি আগা-গোড়া নতুন করে বানানো। হবেই তো—বোমার ঘায়ে ছিল কি এখানে কিছু? বেড়ার ওধারে খানকয়েক হাত উঁচু হয়ে উঠল। অভ্যর্থনায় এসেছেন। সাকুল্যে চার-পাঁচজন হবেন। ছোট্ট ব্যাপার—আমরাও এদিকে গোনাগুনতি পাঁচজন। নেমন্তন্ন চারজন লেখকের—অতিরিক্ত মহিলাটি এক লেখকের স্ত্রী হিসাবে ফাউ এসেছেন। মিরকে-ফ্রিসও নামল আমাদের সঙ্গে। হাসিতে মিরকে ঝলমল করছে—উচ্ছ্বসিত হয়ে বারংবার শোনাচ্ছে, বাড়ি এলাম তবে সত্যি সত্যি! তাদেঁরই দেশঘর আপন জায়গা—অভিভাবক হয়ে আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলল।

বোদো উশে নামী ঔপন্যাসিক, একটা মাসিক কাগজও চালান। জর্মন আকাদেমি অব আর্টসের সাহিত্য-বিভাগের সেক্রেটারি তিনি। ঐ সাহিত্য-বিভাগের নিমন্ত্রণে এসেছি আমরা। উশে মশায় এসেছেন স্ত্রীকে নিয়ে। আরও কে কে যেন। সেদিন কাউকে চিনি নি, ঠিক-ঠাক তাই বলতে পারব না। হাঙ্গামা মিটতে চায় না—পাসপোর্ট-ভিসা কতজনে কতবার যে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখল! তবু তো নিজে থেকে আসি নি, ডেকেডুকে নিয়ে এসেছ। যাঁদের ডাকে এসেছি, তাঁরাও সশরীরে সুমুখে হাজির। এতৎ সত্ত্বেও এই ব্যাপার।

ছাড় পেয়ে একসময়ে অবশেষে বাইরে এলাম। ঘরবাড়ি

কয়েকটা ছাড়িয়ে দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠ। প্রাণ জুড়াল, চোখ জুড়াল। কে বলবে, ঠিক এই তল্লাট জুড়ে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড চলেছে বারোটা বছর আগেও। এবং ঘায়ের দাগ না মেলাতেই পাঁয়তারা ভাঁজা আবার শুরু হয়েছে। নিশ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে উঠছে ইয়োরোপের বাতাসে। ঠোঁটের ডগায় অত্যুত্তম নানা বুলি, কিন্তু নজর একটু খোলা রাখলে মনের কারসাজি ধরে ফেলবেন। পরম মিত্র বলে জানেন, গলা ধরাধরি করে ওঠা-বসা—মনে মনে তাঁরাও গলা কাটবার খুর শানাচ্ছেন। কিন্তু মাঠের এই সবুজ স্নিগ্ধতার মধ্যে মনের পাপের ছায়া পড়ে নি। তাই বড় ভালো লাগল। এই জ্যৈষ্ঠ-মাসে বসন্ত পড়েছে মধ্য-ইয়োরোপে। রঙ-বেরঙের ফুল ফুটেছে, আরও ফুটি-ফুটি করছে। হলদে-হলদে ফুলে ভরে আছে দিক্‌প্রান্ত অবধি—আমার ভারতে পৌষমাসে যেমন সর্ষেফুল ফোটে। সর্ষে-খেতই বটে—জিজ্ঞাসা করে জানলাম, রাইয়ের ফসল। এত সর্ষের ফলন, অথচ একটি ফোঁটা সর্ষের তেল পাবেন না সারা অঞ্চলে। এত রাই কী করে এরা বলুন দিকি ?

এরোড্রোম থেকে বার্লিন শহর বিস্তর দূর। সর্বত্র এমনি হয়ে থাকে ; এখানে তো আবও হবে—রণদৈত্যের একনম্বরের ঘাঁটি ছিল বার্লিন। দুখানা মোটরে ভাগ হয়ে যাচ্ছি—রাও, রাও-জায়া ও আমি একটায়। ড্রাইভারের পাশের সীট আমার—সামনে বসে দেখাশোনা ও টুকে নেওয়ার সুবিধা। কাঁটা-তারে ঘেরা অনেকটা জায়গা নিয়ে এরোড্রোম—তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। বেড়ার কিনারা ধরে খাড়া খাড়া বিদ্যুতের আলো—দিনমান হলেও আলো জ্বলছে এখনো। আলোরা সারবন্দি দাঁড়িয়ে সীমানা পাহারা দিচ্ছে। এ দিকটা শেষ হল তো আলাদা এরোড্রোম আর একটা। নানান রকমের বিস্তর প্লেন ; নড়াচড়া নেই—সকালের শীতে ত্রিপল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। এটা হল রুশীয় ঘাঁটি—এই যত প্লেন, সমস্ত সোবিয়েতের। লড়াই জিতে, দেখছেন, আলস্যে এখন চোখ পিটপিট

করছে—আবার যদি এমন-তেমন কিছু বেধে যায়, চক্ষের পলকে ত্রিপলের ঢাকা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পাখা মেলে গজরাতে গজরাতে আকাশ ছেয়ে ফেলবে।

পটসডামের পথ ছেড়ে ডাইনে ঘুরলাম বার্লিনমুখো। তীর-চিহ্নে পথ দেখানো। পটসডাম মনে পড়ছে?—লড়াই জিতে রুশ-মার্কিন-ব্রিটিশ-ফ্রান্স যে জায়গায় বসে শলা-পরামর্শ করলেন, কী করা যায় ত্যাঁদড় এই জর্মনিকে নিয়ে। গোটা জর্মনি চার শক্তি বাঁটোয়ারা করে নিয়েছেন—এক করে দিয়ে এমনি ব্যবস্থা হোক, লড়াইয়ের ফণা এরা কখনো আর তুলতে না পারে। কিন্তু লড়াইয়ের বিপদে এক হয়েছিলেন, লড়াই মিটতেই যথাপূর্ব আবার দুই বিরোধী দল। ফলে দুই জর্মনি হয়ে গেল। আমাদের এক দেশ ভারতবর্ষ যেমন দুই হয়ে গেছে। ব্যস্ত হবেন না—আসব ঐ পটসডামে। পটসডাম না ছুঁয়ে গেলে রক্ষে রাখবেন? আপাতত বার্লিনমুখো—বার্লিন থেকে নেমন্তন্ন এসেছে আমাদের।

মাঠ ফুঁড়ে চওড়া রাস্তা, দু-ধারে ছায়াময় গাছ। গাড়ি থেমে পড়ল এক জায়গায়। আরও কত গাড়ি জমেছে। পাসপোর্ট-ভিসা ও অন্যান্য কাগজপত্র পরখ করছে পুলিশ। কতবার দেখবে রে বাপু, এখুনি এই তো এরোড্রোমে হয়ে গেল। বেশির ভাগ মানুষই জোচ্চোর-ফেরেব্বাজ, শত্রুপক্ষের চর—এই যেন মোটামুটি এরা ধরে নিয়েছে। গতিক বুঝে দোষও দেওয়া যায় না। নিতান্তই ছেলেমানুষ পুলিশ—জোব্বা এঁটে কোনোরকমে মানানসই হয়েছে। পাসপোর্ট মিলিয়ে দেখবার পর বিনয়ে জল হয়ে গিয়ে দীর্ঘ এক-এক সেলাম। ড্রাইভার স্থানীয় লোক—তা বলে তারও রেহাই নেই। পাসপোর্ট নয়, তার হল নিশানদিহি-কার্ড; কার্ডে ফোটো সাঁটা। বার্লিন শহরে হুট করে ঢোকা-বেরুনো চলে না; আটেঘাটে কড়া পাহারা মোতায়েন। হরেক বায়নাক্কা। রণশান্তির এই এত বছর পরেও। উঁহু, কথাটা ঠিক হল না। শান্তি আর হল কবে, লড়নেওয়ালারা

এখনো তো পাঁয়তারা কষছে। এবং বিচিত্র নয়, সীমান্ত-ঘেঁষা এই বার্লিন থেকেই গণ্ডগোল আবার জমে উঠতে পারে। গা ছমছম করে। দু-দিকের মাঠে মাঠে সবুজ ফসল মাথা দুলিয়ে আনন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে—এর মধ্যে মানুষ তোমার এই আচরণ!

মাঠ ছাড়িয়ে পাড়ায় ঢুকলাম। শহরতলির আরম্ভ বোধ হয়। কটা লোক রুটি নিয়ে ফিরছে। মনে হবে কাঠের মানুষ। অথবা মানুষ-পুতুল—থপথপ করে ঐ পা ফেলছে লম্বাচওড়া পুতুল কটি। পাথরের পাশে পাথর বসিয়ে কঠিন রাস্তা, মোটরের চাকায় আর্তনাদ উঠছে। অগণ্য মানুষ মরে গিয়েছিল—বিদেশি নতুন লোকদের দেখে শহরের পুরনো শোক আবার যেন উথলে উঠেছে। লড়াইয়ের ভারী ভারী সরবরাহের জন্যই রাস্তা হয়তো এমন শক্ত করে বানিয়েছে।

এমনি কতক্ষণ ধরে চললাম, পথের আর শেষ নেই। তারপরে সত্যি শহরে এসে পড়েছি। দু-ধারে বাড়ি। বাড়ি ছাড়িয়ে আবার মাঠ। এমন কি জঙ্গল—সুন্দরবন বা অমনি কোনো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ বানিয়ে দিয়েছে যেন। শহরের এলাকার মধ্যেই। এই এক রেওয়াজ দেখছি ইয়োরোপে। প্যারিস মতো শহরেও জঙ্গল জিইয়ে রেখেছে। ব্রাসেলসেও।

নদী পাওয়া গেল এবার—স্প্রী। ছোট-বড় অগুন্তি ফ্যাক্টরি নদীর ধারে ধারে। রাজধানীর এই পথের উপরেই শিল্প-রাষ্ট্র জর্মনির খানিকটা চেহারা পেয়ে যাচ্ছি। এঁকেবেঁকে নদী ক্রমশ সরু হয়ে ঘন বসতির মধ্যে ঢুকে গেছে। নদীতে শহরে গলাগলি। কতবার পুল পার হলাম, অবধি নেই। মাথার উপরে রেলগাড়ির পুল। বার্লিন শহরের মাথায় দোতলা-তেতলার সমান উঁচুতে রেল-লাইন, মাটির নিচে লাইন, ভূমিতলে প্রশস্ত পথে মোটরগাড়ি ট্রাম ট্রলি-বাস তো আছেই। কত চড়বেন চড়ুন-না।

মাঝে মাঝে চমকে যাই। বীভৎস ভয়াবহ দৃশ্য। রূপকথার

রাক্ষসে-খাওয়া এক-এক পাড়া। তেরো বছর হতে চলল, এখনো এই চেহারা। মানুষের হিংস্রতা কী ভীষণ, খানিক খানিক তার নমুনা। বাঘ-সিংহও নিশ্চয় মানুষের কাণ্ড দেখে লজ্জা পায়। নতুন বাড়ি বিস্তর গড়েছে—কিন্তু সে কত? মনে করুন, গোটা কলকাতা শহর ধ্বসে পড়েছে—কত কাল ধরে কত মানুষের পরিকল্পনায় কী অজস্র শ্রম ও অর্থব্যয়ে তৈরি, মাত্র তেরোটা বছরে কতটুকু ফের নতুন করে গড়ে তুলবেন?

স্টালিন-আলি অর্থাৎ স্টালিনের নামের শড়ক। পূর্ব-বার্লিনের চৌরঙ্গি বলতে পারেন। আগের নাম ফ্রাঙ্কফুর্টার-আলি। রাস্তা ও রাস্তার ধারের ঘরবাড়ি ভেঙে তছনছ করেছিল, স্টালিনের নামে নতুন করে গড়েছে। যোজন-ব্যাপ্ত অট্টালিকা আকাশ ফুঁড়ে ফুঁড়ে লাইনবন্দি চলে গেছে। রাস্তা অতি চওড়া—ফুটপাথ যেন একটানা পার্ক। পাশ দিয়ে সাইকেল চলাচলের পথ। ইট-লোহা-রাবিশ সরিয়ে গোটা পূর্ব-বার্লিন এমনি ভাবে গড়ে তোলবার পরিকল্পনা। কত কাল লাগবে কে জানে? আর যা গতিক দেখি ইয়োরোপের—বিপুল অধ্যবসায়ে যেমন এরা গড়ে তোলে, বিপুলতর নিষ্ঠুরতায় ভেঙে তেমনি চুরমার করে। পনেরো-বিশ বছর অন্তর এই তো হয়ে আসছে। সম্পদ গড়ে তুলল কঠিন আয়াসে; তারপরে আবার সমস্ত ভেঙে চুরমার করে নররক্তের স্রোত বইয়ে গোড়া থেকে নতুন করে শুরু করে দেয়।

হিটলার কোন পাড়ায় থাকতেন? চ্যানসেরি কোথায়—হিটলারের রহস্যময় আবাস? পাতালের নিচে নিজের অভেদ্য ঘরবাড়ি বানিয়ে, নিঃশঙ্কে অন্য দেশের ঘরবাড়ি ভেঙে বেড়াতেন। রাইখস্টাগ? রাইখ কী বলে, শঙ্কিত ভুবন এই তো সেদিন অবধি নিরুদ্ধনিশ্বাসে কান পেতে থাকত। আমার বাঁ-হাতের দিকে ড্রাইভার—ক্ষণে ক্ষণে সে হেসে ওঠে, আর দেদার ঘাড় নাড়ে। পিছন-সীটের রাও মুখ এগিয়ে কানের কাছে এনে বললেন, হিটলারের নাম মুখেও

আনবেন না—বলুন, নাদির-শা। নাদির-শা কোন পাড়ায় থাকতেন, তাই জিজ্ঞাসা করুন।

ঘাড় ফিরিয়ে বোকার মতো তাকাই।

—কে জানে, কেমন মনের ভাব ওদের হিটলার সম্বন্ধে! ইংরেজি জানে না, কিন্তু নামটা শুনে কী আন্দাজ করে বসে ঠিক কি? কর্তাদের কাছে গিয়ে লাগাবে হয়তো। যে রকম কড়াকড়ি, সামাল হয়ে চলাই ভালো।

রাওয়ের সন্দেহ আমারও ভিতর আস্তে আস্তে চেপে বসে। এতক্ষণ দেখেছি ড্রাইভারকে—এখন ভিন্ন এক নজরে তাকিয়ে দেখি। হাবাগবা ভালোমানুষ, নিজ মনে গাড়ি চালায়—দ্রষ্টব্য কিছু পেলে হেসে উঠছে হি-হি করে। বাতাসে আঙুল ঠুকে অবোধ্য একটা কথার পরে আর-একটা কথা—হাতুড়ির এক ঘায়ের পরে আর-এক ঘায়ের মতন—যেন পিটিয়ে পিটিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে বসাতে চায়। আমরা ইংরেজি এক কথা প্রশ্ন করলে প্রবল বেগে এদিক-ওদিক ঘাড় নাড়বে, হাত ঘোরাবে। অর্থাৎ কিছুই বুঝছি নে বাপু। অথচ সে আমাদের বোঝাবেই।

এখন ভাবনা হচ্ছে, ভানও হতে পারে ওটা। ড্রাইভার লোকটা জানে হয়তো ইংরেজি, আমাদের গূঢ় কথাবার্তা শোনবার জন্য মতলব করে হাবা সেজেছে। জিভ সামলাতে হবে অতএব, নাৎসি কর্তাদের সম্পর্কে খুব একটা নিরাসক্ত ভাব দেখাতে হবে। সেদিনকার সেই সন্দেহ আজকে এখন ভাবতে গিয়ে হাসি পাচ্ছে। ড্রাইভারটির সঙ্গে তার পরে বিস্তর জায়গায় ঘুরেছি—সত্যি, নিপাট ভালোমানুষ। ভালো কে-ই বা নয়! ছুনিয়ার দেশে দেশে সামান্য সাধারণ মানুষের সঙ্গে কত মোলাকাত হল, ভালো বই মন্দ মানুষ পেলাম না একটি। মানুষ কী সুন্দর, ভাবতে গিয়ে অবাক হতে হয়। ভাবতেই থাকি, কলম আমার স্তব্ধ হয়ে যায়। কী কাণ্ড, মন্দরা যেন গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়ে আমায় দেখতে পেয়ে।

প্রথম-মহাযুদ্ধের নেতা কাইজার উইলহেলমিনের নামে রাজপথ। তার পরে একটা পথ কার্ল মার্কসের নামে। কার্ল মার্কস জর্মনির মানুষ—তাঁর নাম নিয়ে দেমাক দেখানো বিচিত্র নয়। তবু কিন্তু ক-বছর আগেও এই বিদগ্ধেরা কলকে পেতেন না। সাম্যবাদী পূর্ব-জর্মনি পথে পার্কে শহরে বাজারে হালফিল এখন এঁদের নাম বসিয়ে দিচ্ছে। মার্কস-এঙ্গেলস পার্ক—খোলামেলা অনেকটা জায়গা, এক পাশে গ্যালারি। বোমার গুঁতোয় ঘিঞ্জি-পাড়ার মধ্যে এমনি সব পার্ক সম্ভব হয়েছে। বিস্তর ঐতিহাসিক বাড়ি গুঁড়ো-গুঁড়ো হল। লড়াই অন্তে বিচার-বিবেচনা করে দেখা গেল, মেরামতের অবস্থা নেই। ইট-লোহা-রাবিশ সরিয়ে অতএব বানাও সেখানে পার্ক। বার্ষিক উৎসব হয় এই পার্কে; মিছিলের পর মিছিল চলে। বার্ষিক উৎসবের মিছিল যেমনধারা স্বচক্ষে দেখে এসেছি পিকিনের ন্যাশনাল পার্কে, মস্কোর রেড-স্কোয়ারে। মধ্য-এসিয়ার দেশে দেশে এমনি ব্যবস্থা; পূর্ব-ইয়োরোপেও দেখি ঠিক তাই। সকল সাম্যবাদী দেশেই উৎসবের চেহারা অবিকল এক—যেন ছকে ফেলে বানানো।

সবচেয়ে বনেদি পাড়ায় পৌঁছে গেছি এতক্ষণে। হিণ্ডেনবার্গ হিটলার গোয়েরিং গোয়েবল্‌স—মনে পড়ছে তো নামগুলো?—গা শিউরে ওঠে কিনা বলুন—যাবতীয় মাতব্বরের ঘরবাড়ি ছেলেপুলে অফিস-কাছারি ছিল এই দিকটায়। সেদিনের দাম্ভিক সমারোহ—আর দেখুন তাকিয়ে, খাঁ-খাঁ করছে শ্মশানভূমি চতুর্দিকে। পথিক কটিও যেন মরে গিয়ে হাঁটছে ফুটপাথের উপরে। ভয় করবে এই পাড়ার অনেক জায়গায় আপনার একা একা ঘুরতে। রাইখস্টাগ—পার্লামেন্টের সেই বাড়িতে দেখছেন চামচিকের বাসা। রাবিশ গাদা হয়ে আছে এদিকে-সেদিকে। চামড়া খুলে গিয়ে যেন কঙ্কাল বেরিয়ে আছে বাড়ির সর্বাঙ্গে। দেখুন, ছবিতে দেখুন। আর ভাবুন সেই পনেরো-ষোলো বছর আগেকার দিনগুলো। এক-একটা অধিবেশন

বসে, আর বুক দুরু-দুরু করে বিশ্বভুবনের। কী না জানি গর্জন উঠবে ঐ জায়গা থেকে। ঐখান থেকেই সর্বময় ডিক্টেটর করে দিয়েছিল হিটলারকে—সবগুলো ভোট তাঁর দিকে, একটা শুধু বিরুদ্ধে। আজকে দিনদুপুরেও কেউ পা ফেলে না, চোখ তুলে ওদিকে তাকাতেও ভয় হয়।

চার

হোটেলের উঠানের উপর গাড়ি এসে উঠল। মস্ত বড় উঠান—এধারে-ওধারে রঙ-বেরঙের মরসুমি ফুলও পাঁচ-দশ ঝাড়। জরাজীর্ণ বাড়ির উপরে কিঞ্চিৎ রংচং হয়েছে। আরও উৎকট চেহারা সেইজন্য। বলি-বিদীর্ণ মুখের উপর যেন গোলাপি পাউডার ঘষেছে। নাম শুনবেন হোটেলের? হোটেল এডলন এবং রেস্তোরাঁ। হ্যাঁ, সেই—চমক লাগবার কথাই। লড়াইয়ের আগে বার্লিনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও বনেদি হোটেল—সারা ইয়োরোপের মধ্যেও পয়লা সারির একটি। সাংঘাতিক খরচা—ধনী-অভিজাতদের ভারী ভারী ট্যাঁক দশ-পাঁচদিনে ফাঁকা হয়ে যেত। এই হোটেল নিয়েই ভিকি বামের বিখ্যাত উপন্যাস—'গ্রাণ্ড হোটেল'। লড়াই যখন খতম হয়ে এল, বিজয়ী দল যত অত্যাচারের শোধ তুলে নিচ্ছে বার্লিনে—বিশেষ করে হিটলারের এই পাড়াটার উপর। হোটেল-বাড়ির মাথায় সরাসরি বোমা পড়েছিল। মূল বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। সেখানে এক প্রশস্ত উঠান, কিছু সবুজ ঘাস ও রঙিন ফুল। চার-পাঁচতলা ভাঙাচোরা একটা অংশ খাড়া দাঁড়িয়ে এখনো—ভাঙা কংক্রিট আর উলঙ্গ লোহালক্কড়; হাঁ করে আছে দরজা-জানলার অগণ্য ফোকরগুলো। পিছন দিককার একটা সারি টিকে আছে কোনো গতিকে—শ-চারেক মাত্র কামরা। এই নিয়ে বছর দুই আগে হোটেল আবার নতুন করে চালু করেছে।

দোতলার একটা ঘরে আমি, আর-এক ঘরে আনন্দ। আর তিনজন তেতলায়। ভয় করে, হোটেল-ম্যানেজারের কাছে যত এই সব গল্প শুনছি। হাজারখানেক মানুষ মরেছিল শুধুমাত্র এই হোটেলের চৌহদ্দির ভিতরে। এ-জায়গায় পাঁচ-শ মরেছে, ঐ জায়গায় সাত-শ, ঐ রাস্তায় দু-হাজার। খুব কম করে বলল তো এক-শ। শয়ের নিচে হিসাব নেই। তাই দেখুন, মানুষ একেবারে

মশা-পিঁপড়ের শামিল লড়াইবাজ ইয়োরোপে। কাপুরুষ ব্যক্তি আমরা, আঙুল কেটে দশ ফোঁটা রক্ত ঝরলে আঁতকে উঠি—এই বীরপুরুষদের দেশে আমাদের কী অবস্থা হয়, আন্দাজ করুন। সন্ধ্যার পরে অঞ্চলটা একেবারে থমথমে হয়ে যায়। থপথপ করে দু-পাঁচজন চলে ফিরে বেড়ায় ফুটপাথ ধরে। মড়াগুলো যেন ভাঙা অট্টালিকার লোহা-ইটের স্তূপের নিচে থেকে বেরিয়ে এসেছে। একদিন রাত্রে খুব বাতাস উঠল। জানলা ভালো করে বন্ধ হয় নি। ঘুমের মধ্যে শুনি ঠকঠক করে কপাটে ঘা দিচ্ছে কারা যেন। ধড়মড়িয়ে উঠে বসি। আমার কী মনে হল জানেন, বিদেশি বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করতে হোটেলের সেই এক হাজার মরা মানুষ রাতদুপুরে জানলার পথে পিলপিল করে উঠে আসছে।

ডিটজেলের উপর আমাদের খবরদারির ভার। আকাদেমির সাহিত্য-বিভাগের অফিস-সেক্রেটারি অথবা ঐ গোছের কিছু। কলেজ ছেড়ে সদ্য বেরিয়েছে, বয়সে ছেলেমানুষ- -ইংরেজিটাও রীতিমত খুঁড়িয়ে বলে। কিন্তু বড় ভালো ছেলে—নিষ্পাপ সরল হাসি দেখে মন ভরে যায়। আর একজন, লীবার্গ, সরকারের সংস্কৃতি-দপ্তরের লোক—বেঁটেখাটো চেহারা, মাথায় চকচকে টাক। চমৎকার ইংরেজি জানে, বিস্তর দেশ ঘুরেছে, বিশ্বজোড়া বন্ধুবান্ধব। এবারের ক্ষেপে আমরাও তার পরম বন্ধু হয়ে এলাম। অস্ট্রেলিয়ায় ছিল অনেক দিন, আসা-যাওয়ার পথে ভারতের মাটির উপর বম্বে শহরের হোটেলে লীবার্গ একদিন থেকে গিয়েছে—

—বলো কি হে, পুরোপুরি চব্বিশ ঘণ্টা? তবে তো ভারত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তুমি—বই লিখে ফেল নি? আমি লোকটা, এই দেখছ, যা দেখি শুনি টুকে নিই। কটা দিন মাত্র তোমাদের সঙ্গে রয়েছি—তাই নিয়ে কী ভীষণ বই লিখব দেখে নিও। আস্ত এক থান-ইট—কি ওজনে কিবা আয়তনে।

এক পুরানো গল্প মনে এলো। কম দেখে এসে বেশি লেখার ব্যাপার—এই আমারই মতন। দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মাসিক কাগজে ভ্রমণকাহিনী ফাঁদলেন—'ইউরোপে তিন মাস'। বছর ধরে বেরুচ্ছে, লেখা শেষ হবার লক্ষণ নেই। সমাজপতি 'সাহিত্য' কাগজে রসিকতা করলেন : সর্বাধিকারী মহাশয় কি গোরুর গাড়িতে ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন ? আমাদেরও সেই গতিক—প্লেনে লহমার মধ্যে দেশ-দেশান্তর পাড়ি দিই, লেখা চলে গোরুর গাড়ির চালে।

বাজে কথা থাক। বোদো উশে, শ্রীমতী উশে, লীবার্গ, ডিটজেল ওঁরা এই চার জন—এবং আমরা পাঁচটি, একুনে নবরত্ন বসলাম এক টেবিল ঘিরে।—ডেকেডুকে খরচা করে নিয়ে এলে সাত সমুদ্র ও সত্তর পাহাড়ের ওপার থেকে। ফিরিস্তি দিয়ে দাও, কী খাটনি খাটাবে এবারে ? ক-শ বক্তৃতা শোনাবে, এবং আমাদের দিয়েই বা ক-জায়গায় বলাবে ?

জবাব একেবারে গঙ্গাজল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল মশায়। ছক-বাঁধা প্রোগ্রাম কিছু নেই—খাও দাও বেড়াও—চেনাজানা হোক আমাদের সঙ্গে, সেইটেই আসল। ছোটখাট দু-চারটে বৈঠক করা যাবে, অবরে-সবরে বলবে দু-এক কথা। তার জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই।

দুপুরের খানাপিনা হোটেলে নয়। আমরা পাঁচ আর ওরা তিন (লীবার্গ সরে পড়েছে) দুটো গাড়ি বোঝাই হয়ে চলেছি। চলেছি, চলেছি। কালোবরন প্রাচীন গির্জার সারি—ভাঙাচুরো প্রকাণ্ড গোলটুপি মাথায়, সর্বাঙ্গের ক্ষতমুখে লোহালক্কড়ের কঙ্কাল বেরুনো—দাঁড়িয়ে রয়েছে পথের ধারে ধারে। দিনদুপুরেও শিউরে উঠি। দেখতে পাচ্ছি যেন ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশের আগুন আর কানে শুনছি ধরিত্রীর আর্তনাদ। সর্বনেশে মানুষ—হিংস্র মানুষে এমন বার্লিন শহর খুবলে খুবলে খেয়েছে। এই তেরো-চোদ্দ বছর পরেও চেহারাটা দেখুন গিয়ে।

অ্যাক্টরস ক্লাবে নামলাম। অভিনয়-শিল্পীরা বানিয়েছেন, কিন্তু আড্ডাটা সর্বশ্রেণীর গুণী-জ্ঞানীদের। আড্ডা দেয়, খানাপিনা করে। উপরে নিচে গুটিছয়েক ঘর, ঝকঝক তকতক করছে। দেয়ালে দেয়ালে গুণীদের স্কেচ-ছবি—উঁচুদরের শিল্পকর্ম। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি—দুই ধারে ছবি টাঙানো, যতেক নামকরা অভিনয়-শিল্পীর নানা ঢঙের ফোটোগ্রাফ। একটি মেয়ে দোভাষিণী হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরবে—সে এসে খাওয়ার টেবিলে সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করল। সোমবার থেকে কাজে লাগবে, মাঝে দুটো দিন—আর কোন দল এসেছে, তাদের সঙ্গে ঘুরছে এখন। মেয়েটির নাম —Lisl Fleischhacker—ইংরেজিতে দিচ্ছি, উচ্চারণ করুন দিকি কেমন! ফ্রাউ ফ্লিসহ্যাকার—বলতে গিয়ে আমারই তো দাঁত খসে পড়ল একটা। নড়া-দাঁত ছিল অবশ্য। কিন্তু কাঁচা-দাঁতের উপরেও এমন উচ্চারণের ভর সয় কি না সয়, সেই সন্দেহে নামের শেষাংশ বাতিল করে লিজেল বলে ডাকতাম তাকে। ফ্রাউ নয়, শ্রীমতী নয়, শুধুমাত্র লিজেল।

নিচে নেমে ওভারকোটে আবার দেহ ঢোকাচ্ছি, আনন্দ একটা করে নোট গুঁজে দিলেন সকলের পকেটে। ভোজন-দক্ষিণা—পঞ্চাশ মার্ক। রাস্তায় বেরিয়ে এটা-সেটা খরচ আছে—কোথায় এখন পাউণ্ড ভাঙানোর ধান্দায় ঘুরবেন?—আকাদেমি থেকে যৎসামান্য এই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চোখ ঢুলুঢুলু হয়তো আমার—বোদো উশে বললেন, ক্লান্ত আপনি, হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি। পড়ে পড়ে ঘুম দিন গে।

—আপনারা?

—আমরা ঘুরব এদিক-সেদিক। একবার একটু দোকানেও যেতে চাচ্ছেন ওঁরা। সন্ধ্যার মুখে আপনাকে তুলে আনব। একটা ডকুমেণ্টারি ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে শুধু আপনাদের ক-জনের জন্য।

আমি কি তাই শুনি? পকেটে মার্ক—দোকানে ওঁরা যেতে পারেন, আমারই বা আটকায় কিসে? সরকারি দোকান। সমস্ত মেলে—টাই থেকে টেলিভিশন। কোনটা চাই? রাশিয়ায় যেমন গুম, লণ্ডনের বিবিধ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। একতলা দোতলা তেতলায় ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হয়ে যায়। একমাত্র উমা রাও সওদা করে ফেলেছেন ওঁর প্রসাধনের বিবিধ মশলা। আমরা পুরুষরা দর দেখে দেখে মিছাই হয়রান হই।

স্টালিন-আলির সঙ্গে আর-এক রাস্তা মিশেছে—মোড়ের উপর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। চারিদিকে ঘরবাড়ি—এমন জমজমাট পাড়ায় মোড়ের জায়গা ফাঁকা থাকার কথা নয়। অট্টালিকা ছিল, বোমার গুঁতোয় নিপাত গেছে। রাবিশ সরিয়ে সাদা হলদে বেগুনি নীল ঘন-কালো নানান রকমের ফুল ফুটিয়ে আলো করেছে দেখুন কেমন। প্যানসি ফুল—কতকটা আমাদের ভুঁইচাঁপা ধরনের। আর একরকমের ফুল—বাংলায় মানে করলে দাঁড়াবে সৎ-মা। কেন এই আজব নাম, কে বলবে? ফুলবাগানে কফিখানা। বাগানের এদিকে সেদিকে চেয়ার-টেবিল পাতা। হালকা টেবিল, হালকা চেয়ার—বৃষ্টিবাদলায় বা রাত্রিবেলা সরিয়ে নেওয়া চলে। নকশা-আঁকা কাপড়ের বড় বড় ছাতা প্রতি টেবিলের ধারে—কাশীর গঙ্গার ঘাটে যে আয়তনের ছাতা দেখতে পান। এখন বন্ধ আছে, চড়া রোদ কিংবা বৃষ্টির সময় খুলে দেয়। একপ্রান্তে নিচু ঘর তিন-চারটে—অফিস এবং রান্নাঘর। মিষ্টি বাজনা আসে ওদিক থেকে। আমরা যাচ্ছি না অফিস-ঘরের দিকে, একজন এসে ফরমাশ জেনে নিল। খাওয়ার শেষে দামও মিটিয়ে নিয়ে গেল এই মাঠ থেকে।

বইয়ের দোকানে তারপর। এটা সরকারি প্রকাশনালয়। এ ছাড়া ব্যক্তিগত বইয়ের ব্যবসাও আছে অনেক—ভারি ভারি নামজাদা প্রকাশকরা আছেন। প্রকাণ্ড বাড়ি—একতলা-দোতলায় হল-বারান্দায় মিলে দশ-বারোটা। কত ছবি, থাকে থাকে কত রকমের

বই সাজানো ! খানিকটা আবার মিউজিয়মের মতো, নামি লেখকদের পুরানো পাণ্ডুলিপি। চেয়ার রয়েছে, আরামের সোফা রয়েছে ঘরে ঘরে—বই কিনতেই হবে, এমন কথা নেই—বসে যান কোনো একখানে, এ-বই সে-বইয়ের পাতা উলটান। পড়ুন বসে একঘণ্টা দু-ঘণ্টা—কেউ কিছু বলতে যাবে না।

ডকুমেন্টারি ফিলম দেখাতে নিয়ে গেল এক বাড়ি। সরকারি যাবতীয় ফিলম রাখে এখানে—সিগারেট খাওয়া কড়া ভাবে মানা করে দিয়েছে। ঘরে ঘরে নোটিশ টাঙানো। মাঝারি স্যইজের একটি ঘর, গুটিদশেক চেয়ার, দেয়ালে ছোট পাথরের সাদা পরদা—কলকাতা লাইট-হাউসে মিনিয়েচার ফিলম দেখানোর ঘর আছে, এ ঘরের আয়তন তারও চেয়ে ছোট। যিনি ছবি দেখাচ্ছেন, উশেকে বলে গেলেন মাঝের সীটে বোতামের কাছে বসতে। ঐ বস্তুটা একটু-আধটু ঘুরিয়ে আওয়াজের কম-বেশি করতে হয়।

যা যা ঘটেছে, হুবহু সেই ছবি—ঘটনার সময়ে তুলে নেওয়া। কল্পনা মেশানো নেই কোথাও, ছবির একটুকরো ফরমাশ-মাফিক বানানো নয়। গোড়ার দিকটা অতি-পুরানো আমলের—মুখর ছবি তো নয়ই, এমন কি সিনেমা-ছবিরও চলন হয় নি তখন। ফোটোগ্রাফ ছিল, সেই সমস্ত জুড়ে গেঁথে দিয়েছে। জায়গা কম, কলোনি চাই, বিশ্ববিজয় করতে হবে—জিগির তুলেছে জর্মনরা। মতলব হাসিলের অতি-পুরানো মানচিত্র। মানচিত্রে ভারতবর্ষ দেখছি ; ভারত ছাড়িয়ে উদ্দাম জিগীষা চলে গেছে আরও পুব অঞ্চলে। সুগোপনে তারই সর্বগ্রাসী করাল আয়োজন।

প্রথম-মহাযুদ্ধের ভূমিকায় কাইজার উইলহেলমিনের দাম্ভিক ভাষণ। রেকর্ডে তোলা ছিল, সেলুলয়েডে বসিয়ে নিয়েছে। প্রথম-মহাযুদ্ধের বিস্তর ফোটো—তখনকার কামান বন্দুক বোমা সাবমেরিন জেপলিন—জীবন নিয়ে ছিনিমিনির নানা দৃশ্য। হেরে গিয়ে নাকে-খত দিল জর্মনি। দেশের চৌহদ্দি বাড়াবার জন্য লড়াই ; হেরে গিয়ে

ছোট দেশ সঙ্কীর্ণতর হল। মরল যত মানুষ, তাদের একরকম কাঁচোয়া; বেঁচে থেকে কঙ্কালসার হয়ে তিলে তিলে মরছে, সেই ছবিগুলো বড্ড বেশি ভয়ানক।

কাইজার বাতিল হয়ে গণতন্ত্র গড়ে উঠল। হিণ্ডেনবার্গ প্রেসিডেন্ট। সাধারণ মানুষের ভরসা হয়েছে—লড়াই আর কখনো নয়, শান্তির দিন এবার থেকে। স্থির-চিত্র থেকে চলন্ত সিনেমা-ছবিতে এসে গেছে ইতিমধ্যে; নিঃশব্দ ছবি থেকে মুখর ছবিতে ক্রমশ।

হিটলারের অভ্যুদয়—রাইখ ভোট দিয়ে হিটলারকে সর্বময় প্রভু বানাল, শুধুমাত্র একটা ভোট বিরুদ্ধে। জর্মন খেপে গিয়েছে আবার, শক্তিমদে মাতাল। জায়গা চাই, কলোনি গড়ব তুনিয়ায়। হিণ্ডেন-বার্গকে সরিয়ে হিটলার তারপরে একাই চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেন্ট। শিল্পপতিরা একজোট হয়েছে হিটলারের পিছনে, ফ্যাক্টরির যাবতীয় কাজকর্ম থামিয়ে ভারে ভারে যুদ্ধাস্ত্র বানাচ্ছে। ইতালি ও জাপানের সঙ্গে মিতালি। নর-রাক্ষসেরা হানা দিয়ে পড়ছে সকল অঞ্চলে। পোল্যাণ্ড পুড়ল, ফ্রান্স-ইংল্যাণ্ড পুড়ল, রাশিয়া ছারখার হল পুড়ে গিয়ে। কনসেনট্রেশন-ক্যাম্প—একটা-তুটো নয়, গুনতিতে তিন-শ। যাকে শত্রু ভাবে, তাকে এনে পুরছে ক্যাম্পের ভিতরে—বাঘ-সিংহ তো রীতিমতো দয়ালু মানুষের তুলনায়। শেষ মুখে আগুন ঘুরে এসে পড়ল নিজেদের উপর। যত অত্যাচারের শোধ নিচ্ছে জয়ী পক্ষ। বোমা মেরে মেরে বার্লিনের রক্ষা-ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়েছে। শহর চুরমার হয়ে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। গোটা জর্মনি জ্বলছে। মরা মানুষের হিসাব লাখে আর কুলায় না। জাত ধরেই নিরন্ন, পথের ফকির। বিধ্বস্ত নগরীর পথে গর্জন তুলে দলে দলে রাশিয়ার ট্যাঙ্ক এসে পড়ল। ভিন্ন দিক দিয়ে অন্যেরাও এল এর পরে। গোটা জর্মনদেশ লুটের মাল এখন—তাড়াতাড়ি যে যতদূর দখল করে নিতে পারে।

ছবিতে দেখাচ্ছে রাশিয়ার সদয় ব্যবহার। জয়ী হলেও অনেক ক্ষতি হয়েছে—তা সত্ত্বেও রাশিয়া ভারে ভারে খাদ্য-বস্ত্র পাঠাচ্ছে জর্মনিতে। হয়তো বা বলবেন, পূর্ব-জর্মনি ছবিতে খোশামুদি করেছে রাশিয়াকে। যা খুশি বলুন গে—ডকুমেণ্টারি ছবিতে যেমন যেমন দেখেছি, আমি লিখে গেলাম।

রাত হয়েছে। হেঁটেই যাই না কেন গল্প করতে করতে। মোটরে ঘুরলে দেখা হয় না, হেঁটে হেঁটে শহর দেখতে দেখতে যাই। কচিৎ-কদাচিৎ দুটো-চারটে মেয়ে-পুরুষ চলাচল করছে। একজনের কোটের হাতা অবশ্য দুটোই, একটা হাতা ঢলঢল করছে চলার সঙ্গে—একটা হাত লোকটার। এক খোঁড়া যাচ্ছে ওদিকে কাঠের পা ঠকঠকিয়ে। বার্লিনের পথে হাঁটতে হাঁটতে নজরটা ছড়িয়ে রাখলে এমন অনেক দেখবেন। লড়াইয়ে খুবলে খেয়েছে। চলার ধরনটাও দেখুন। জ্যান্ত মানুষ নয় যেন—রাত্রিবেলা ভাঙাচোরা গলিঘুঁজি থেকে মড়ারা বেরিয়ে এসেছে।

গা ছমছম করে। পা চালিয়ে চলুন। ছুটে গিয়ে হোটেলের ঘরে উঠে তো বাঁচি! সভ্যতায় না বাধলে দৌড়ানোও যেত।

কিন্তু হোটেলে এসেই বা রেহাই কোথা? এখানে রাজকন্যা। বাইরের চেয়ে বেশি আতঙ্ক তাঁকে নিয়ে। সেই দেড় প্রহর বেলায় উপরে এসেই নজরে পড়েছে। হাজার লোকের ভিড়েও নজর পড়ত, আর তখন তো একলা সে করিডর দিয়ে যাচ্ছে। আসল রাজকন্যা চোখে দেখি নি—তবে চেহারা লাবণ্য ও বয়সের দিক দিয়ে রাজকন্যার যে ছবি মনে রয়েছে, মেয়েটা অবিকল তাই। হীরা-মুক্তার অলঙ্কার কি, নিতান্তই ন্যাড়া হাত, ন্যাড়া গলা। অতএব ধরে নিয়েছি—কোনো এক অতি-আধুনিক রাজকন্যা এই বনেদি প্রাচীন হোটেলে এসে উঠেছেন।

ক্ষণপরে দেখি, সেই মেয়েটা বুকের উপর থেকে পা অবধি সাদা কাপড় ঝুলিয়ে লম্বা বুরুশ দিয়ে করিডরের ধুলো সাফ করছে। হায়রে হায়, হোটেলের মেইড। রাজপ্রাসাদে যাকে মানায়, চাকরানী সেই রূপসী মেয়ে। হঠাৎ একসময়ে আমার ঘরে ঢুকল। ধোপদুরস্ত

চাদর পেতে বিছানা ঠিক করছে, কম্বল পাট করছে। ইংরেজি একবর্ণ বোঝে না। একটা-কিছু বললে ঘাড় ঝাঁকাবে, বুড়ো আঙুল নাড়বে। পনেরো মিনিট ধরে বলেছি, গোসলখানা কোথায় দেখিয়ে দাও, আকারে ইঙ্গিতে হরেক চেষ্টা করছি—হাঁ করে চেয়ে থাকে। নিজেই তখন খুঁজে পেতে বের করি। অবস্থা এই, অথচ যখন তখন সেই মেয়ে আলাপ জমাতে ঘরে আসবে। ফড়ফড় করে জর্মনে বলে যায় একগাদা কথা। কী করে জানি নে, একটা কথা ধরে ফেললাম: কতদূর থেকে এসেছ? জবাব: ইণ্ডিয়া। আর রক্ষে নেই, কথার তুফান বয়ে চলল এর পরে। আমি কী করব—হাসি-হাসি মুখ করে বেকুবের মতো তাকিয়ে থাকি। কভু-বা নো-নো ইয়েস-ইয়েস—ডাইনে-বাঁয়ে উপরে-নিচে ঘাড় নাড়ি আন্দাজমতো। যেন বাংলা কাগজের সম্পাদকীয়—হাঁ-না, লোকে যেটা ইচ্ছে বুঝে নিতে পারে। কিন্তু জর্মনির সুন্দরী-মেইড সদাশয় বাঙালি পাঠকের মতো যা-হোক বুঝে চুপ করে যাবার পাত্র নয়। কথায় হল না তো, মুখে মুখে উৎকট শব্দ করছে—ফু-র্-র্-র্-র্। এবং দু-হাত জুড়ে দু-হাতের আঙুল পাখির পাখনার মতো মেলে ধরে যেন ঢেউ দিয়ে সামনে ঠেলে দিচ্ছে। ভাগ্যবশে আর-এক মেইড এসে পড়ায় রক্ষে পেলাম। সে কিছু ইংরেজি জানে।—জানতে চাইছে, কিসে আমরা এসেছি—এরোপ্লেনে? হাতের ইশারায় মুখের আওয়াজে এরোপ্লেন ওড়া দেখাচ্ছে।

মুখ ম্লান করে মাথার উপরে একটা আঙুল ঠুকে বলছে, মাথা খারাপ বুঝতে পারছেন না? নয়তো, এমন করবে কেন?

মন খারাপ হয়ে যায়, এমন মেয়ের এই দশা! আরও গল্প শুনলাম তার পরে। ভালোঘরের মেয়ে—প্রায় রাজকন্যাই। দশ-বারো বছর বয়স তার, সেই সময়টা হঠাৎ একদিন ঘর-বাড়ি ভেঙে-চুরে খোয়া-রাবিশের গাদা, সেই গাদার নিচে বাপ-মা ভাই-বোনের জীবন্ত কবর, এবং কেমন করে পাশে ছিটকে পড়েছিল ফাটা-মাথা

চেতনাহীন মেয়েটা। তাকেও মড়া ভেবেছিল, কিন্তু ঠাহর করে ধুকপুকানি একটু পাওয়া গেল পাঁজরের নিচে। প্রাণে বাঁচল বটে শেষ অবধি, ফাটা-মাথার দাগও ঘন চুলে ঢেকে গেল—কিন্তু মাথা আর ভালো হল না। ঝি-গিরি ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো কাজে আসবে না এমন সুন্দর মেয়ে।

জর্মনি দুই খণ্ড হয়েছে—পূর্ব আর পশ্চিম। যেমন পূর্ব-বাংলা আর পশ্চিম-বাংলা। পুরানো রাজধানী বার্লিনও দুটো—পূর্ব-বার্লিন, পশ্চিম-বার্লিন। আমাদের কলকাতা শহরটা কিন্তু খুব বেঁচে গিয়েছে —কী বলেন?

শনিবার। পুরো দিন এবং পুরো রাত্রি কাটল বার্লিনে। অতএব বার্লিন সম্পর্কে লায়েক হয়ে গেছি বলা যায়। তদুপরি কালকের পঞ্চাশ মার্ক পকেটে—বলতেই হবে বড়লোক। কারও তোয়াক্কা রাখি নে অতএব—সকালবেলা নিজেরাই বেরিয়ে পড়ছি এ-বার্লিনে ও-বার্লিনে। সকাল মানে এগারোটা—ব্রেকফাস্ট সেরে গড়িমসি করছি, হাবিব তানবির বড্ড দেরি করে ফেলল। দিল্লির ছেলে হাবিব —এঁদের কেউ নয়—নাটুকে মানুষ, অল্পস্বল্প উর্দু কবিতা লেখারও অভ্যাস আছে। ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল নাটক-থিয়েটার-অপেরা সম্পর্কে শিক্ষানবিশি করবার জন্য। সেখানে পনেরো মাস কাটিয়েছে। এখানে খবরের কাগজে লিখে কিছু কিছু পায়, তাইতে চলে একরকম। ইয়োরোপের নানান তল্লাটে ঘুরে থিয়েটারের যাবতীয় ঘাঁতঘোঁত দেখেবুঝে নিচ্ছে। কাগজে আমাদের আসার খবর জেনে কাল রাত্রে হোটেলে এসেছিল এক তরুণী অভিনেত্রীকে সঙ্গিনী করে। খানাপিনা সেরে অনেক রাত্রে চলে গেল। পুরো ছয়মাস বার্লিনে আছে, পথঘাট সমস্ত জানা।

হাবিবকে মুরুব্বি ধরে পশ্চিম-বার্লিনের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। বাসাও তার ঐ দিকে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ও যাবতীয় কাজকর্ম

পুব এলাকায়। আধলা পয়সা খরচ করবে না পশ্চিম-বার্লিনে। পেরে উঠলে সবাই এমনি ব্যবস্থা করত। কী বিদঘুটে ব্যাপার শুনুন তবে—কতবড় সর্বনাশের মুখে পদে পদে জর্মনিকে সামাল হয়ে চলতে হয়।

কলকাতা শহরটা ধরুন দু-ভাগ করে দিয়েছে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট-কলেজ স্ট্রীট-ওয়েলিংটন স্ট্রীট-ওয়েলেসলি স্ট্রীট বরাবর। রাস্তার পুবের এলাকা অর্থাৎ পুব-কলকাতা পশ্চিমবঙ্গে ; এবং পশ্চিম-এলাকা অর্থাৎ পশ্চিম-কলকাতা ঢুকিয়ে দিয়েছে বিহারপ্রদেশের ভিতর। অবিকল এমনিধারা ঘটেছে বার্লিন শহর নিয়ে। হয়তো ভেবে বসে আছেন, পশ্চিম-বার্লিন থেকেই একনাগাড় পশ্চিম-জর্মনি চলল। (বিচক্ষণ আমার পাঠকেরা, তাঁরা এমনধারা ভাবতে যাবেন কেন ? কিন্তু লজ্জা করছে বলতে, আমার নিজেরই ঐ গোছের একটা ধারণা ছিল।) পশ্চিম-বার্লিন পশ্চিম-জর্মনির রাষ্ট্রভুক্ত বটে, কিন্তু শহরটুকু ছাড়িয়েই আবার পূর্ব-জর্মনির এলাকা। (ঠিক যেমন, পশ্চিম-কলকাতা বিহারে ঢুকিয়ে দিলেও হাওড়া থেকে অনেকদূর অবধি পুনশ্চ পশ্চিমবঙ্গ।) চতুর্দিকেই পূর্ব-জর্মনি, মাঝখানে শুধুমাত্র পশ্চিম-বার্লিন জায়গাটুকু পশ্চিম-জর্মনির অধিকারে। যেমন ব্রিটিশ-ভারতের মধ্যে চন্দননগর জায়গাটুকুতে ছিল ফরাসির অধিকার। একটানা আসল পশ্চিম-জর্মনি—অনেক, অনেক পশ্চিমে—শ-তিনেক মাইল অন্তত। আন্তর্জাতিক রাস্তা আছে, এবং রেল-লাইন। পশ্চিম-জর্মনি যেতে ভারতের লোকের ভিসা লাগে না। অতএব ঢুকে পড়লেন আপনি পশ্চিম-জর্মনিতে। তারপর প্লেনে হোক, ট্রেনে হোক, মোটর গাড়িতে হোক—ঐ আন্তর্জাতিক পথ ধরে পূর্ব-জর্মনির এলাকা ফুঁড়ে এসে পৌঁছলেন বার্লিনে। পূর্ব-বার্লিন থেকে পশ্চিম-বার্লিনে যাতায়াতের বাধা নেই, পাসপোর্ট-ভিসা লাগে না। যেমন চন্দন-নগর—সেটা ফরাসি এলাকা হলেও আমরা অবাধে যেতে পারতাম। যাতায়াতে বাধা দেওয়া সম্ভবও নয়। বার্লিনের কেউ কোনোদিন কি

শক্রো ভেবেছে, এক শহর দু-টুকরো হয়ে দুটো আলাদা রাষ্ট্রে চলে যাবে? তাই দেখবেন, কোনো রাস্তার এ-ফুটপাথ হয়তো পূর্ব-বার্লিন, ঐ ফুটপাথ পশ্চিম। আপনার বাড়িটা পূর্ব-বার্লিনে; বাড়ির কানাচে পশ্চিম-বার্লিন, এমন কি, একই বাড়ির দুটো ঘর পূর্ব-বার্লিনে, পাঁচটি হয়তো পশ্চিমে। ঠেকাবেন তবে কেমন করে? অতিবড় শক্র হলেও ড্যাং-ড্যাং করে আমি পূর্ব-বার্লিনে ঢুকে তাদের বুকের উপর চেপে বসব, কর্তৃপক্ষ ঠেকাতে পারবেন না। জেনে-বুঝেও কিছু করবার জো নেই, শুধুমাত্র সতর্ক নজর রাখা ছাড়া। কিন্তু যদি আন্তর্জাতিক রাস্তা থেকে এক পা নামি, কিংবা যদি বার্লিন শহর থেকে বেরিয়ে পড়তে চাই, কঁ্যাক করে টুঁটি টিপে ধরবে: *ভিসা বের করো এবারে জাদুমণি, ফোটোগ্রাফ মিলিয়ে দেখি।* শতেক বায়নাক্কা।

জর্মনির টাকা হল মার্ক। তা-ও নিয়ে গোলমাল। সেটাই বিষম মারাত্মক। এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে দু-রকমের মার্ক—পূর্ব-মার্ক ও পশ্চিম-মার্ক। আইনের চোখে দু-মার্কেরই সমান দাম। যেমন আমাদের ভারতের টাকা আর পাকিস্তানের টাকা। আপনি বিদেশি মানুষ, একটা পাউণ্ড ধরুন মার্কে ভাঙাবেন। পূর্ব-জর্মনিতে ভাঙালে ছয় মার্ক দেবে, পশ্চিমেও ছয়। কিন্তু পশ্চিম-জর্মনিতে (পশ্চিম-বার্লিনও এর ভিতর) ভাঙানো পশ্চিম-মার্ক ফের যদি পূর্ব-মার্ক করে নিতে চান, প্রতি পশ্চিম-মার্কের বদলে সাড়ে-চার থেকে আট পূর্ব-মার্ক অবধি দেবে। আইন যেমনই হোক, লেনদেন প্রায় প্রকাশ্য ভাবেই চলে। অতএব পূর্ব-বার্লিনে পাউণ্ড না ভাঙিয়ে পশ্চিম-বার্লিনে ভাঙানোই সুবিধা—ছয়ের জায়গায় আটচল্লিশ অবধি পূর্ব-মার্ক পেতে পারেন। ওদের যারা শক্র, তারাই এই লাভের পথ খুঁজবে; পূর্ব-জর্মনির বাসিন্দা কেউ করবে না। শক্ররা ওদের অর্থনীতিক বিপর্যয় ঘটাবার জন্য গাঁটের টাকা গচ্চা দিয়ে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে—বলতে বলতে আগুন হয়ে উঠল একদিন লীবার্গ। কতবড়

সর্বনেশে ব্যাপার, ভাবুন। পশ্চিম-জর্মনির লোক যদি পূর্ব-বার্লিনে এসে (অবাধেই তারা আসতে পারে) কেনাকাটা করে, তাদের প্রতিযোগিতায় এরা দাঁড়াবে কেমন করে? চারগুণ মার্ক তাদের হাতে—হুড়হুড় করে সমস্ত জিনিসপত্র কিনে ফেলবে। একবার হয়েওছিল তাই—সেই থেকে অতি সতর্ক। ফোটো-আঁটা নিশানার কার্ড পূর্ব-জর্মনির প্রতি মানুষকে রাখতে হয়। ঐ কার্ড যাদের আছে, দোকানদার শুধুমাত্র তাদেরই মাল বেচবে। পশ্চিম-জর্মনিতে যাতে মাল পাচার হয়ে না যায়। তাই কি ঠেকানো যায় ষোলো আনা? ভিড়ের মধ্যে দোকানদারের কার্ড দেখতে হয়তো মনে থাকল না। বিষম অপরাধ সেটা—প্রায় স্বদেশদ্রোহিতা। ইচ্ছে করে করবার লোকও যে নেই এমন নয়—মনে রাখবেন, এটা সত্যযুগ নয়—এ-জর্মনির ভাই-ব্রাদার ও-জর্মনিতে—ভাষা-সাহিত্য, জাত-জ্ঞাত, আত্মীয়তা-কুটুম্বিতে কোনো দিক দিয়ে তিলেক ফারাক নেই—মালপত্র যদি কিছু দিই পাচার করে অপর-জর্মনির আত্মীয়ের কাছে? ধরতে পারলে গোলমাল—কিন্তু ঐ তো শুনলেন, দুই বার্লিনের কত জায়গায় শুধু হয়তো একটুকু পাঁচিলের ব্যবধান। দিলাম ছুঁড়ে পাঁচিল পার করে—কী করতে পারেন, করুন।

ভালো ভালো খেত-খামার পড়েছে পূর্ব-জর্মনির ভাগে; পশ্চিম-জর্মনিতে রুড় ইত্যাদি উৎকৃষ্ট খনিজ অঞ্চল। পশ্চিম তল্লাটে অতএব ভারী ভারী শিল্প গড়ে তোলবার সুবিধা, পুবের তল্লাটে চাষবাস। পূর্ব-বার্লিনে অন্য সব বস্তু নিয়ে কড়াকড়ি—কিন্তু পশ্চিম-বার্লিনের কেউ এসে উত্তম উত্তম মালে সস্তায় জঠর ভরতি করে যায়, তাতে এদের আপত্তি নেই। আসলে একই গোষ্ঠীর মানুষ তো! পাটোয়ারি ব্যক্তি অনেকেরই তাই পূর্ব-বার্লিনে খানাপিনা। হাবিবও মহাজন-পন্থা ধরেছে।

হোটেল থেকে কয়েক পা গিয়েই রেলিং-ঘেরা একটু গর্তমতো জায়গা—পাতালের সিঁড়ি নেমে গেছে। নেমে যান পাতালপুরী।

[illegible]-স্টেশন। বিজলি-ট্রেন পাতাল তোলপাড় করে মিনিটে মিনিটে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। উপর থেকে কিছু টের পাবেন না। চেপে বসা গেল একটায়। বসবারও ফুরসত হল না, নেমে পড়তে হল লহমার মধ্যে ছুটো স্টেশন পার হয়ে গিয়ে। স্টেশন কত কাছাকাছি রে বাপু! অথবা বিষম জোরে চলে বলেই এমনিধারা ঠেকে। এস্‌ক্যালেটর অর্থাৎ চলতি-সিঁড়িতে উঠে আবার উপরে। এবং এক ফুটো দিয়ে রোদে-ঝলমল ভূপৃষ্ঠে বেরিয়ে পড়লাম।

পাতাল থেকে বেরিয়ে এবারে স্বর্গমুখো ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উঠছি উঁচুতে—আরও উঁচুতে। একতলা সমান উঁচুর ট্রেন ধরলাম। এরও উপরে আছে—আমাদের মাথার উপর দিয়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে ট্রেন। সড়াক-সড়াক করে স্ত্রী এবং খাল পার হয়ে যাচ্ছি। হাবিব বললে, পশ্চিম-বার্লিনে এখন আমরা। নেমে পড়লাম।

স্টেশন থেকে ভূতলে নেমে হাঁটছি। খুব ঝকমকানি এদিকটায়। দেদার মোটর। ঝকমকে দোকানপাট। ঐশ্বর্য উপচে পড়ছে, একনজরে মালুম হয়। বোমা পড়েছে এদিকে সামান্যই। হিটলারের যাবতীয় দপ্তরখানা ছিল পুব অঞ্চলে। পুব দিক দিয়ে রুশরা ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুবের তল্লাট দলে-পিষে গুঁড়ো-গুঁড়ো হবার মুখেই বার্লিনের পতন—পশ্চিমে আরও ঢুকে লড়াই করবার আর তখন গরজ রইল না।

হাঁটছি তো হাঁটছি-ই। রোদ বেশ চড়া। রাস্তার ওপার থেকে এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে এলেন। চেহারায় ও সাজপোশাকে ষোলো-আনা জর্মন। কাছে এসে সমস্ত গোলমাল করে দিলেন। ইংরেজিতে কথাবার্তা : আপনারা ভারতীয় নিশ্চয়? আমিও ভারতীয়। দেখুন কতদূর থেকে চিনতে পেরেই ছুটেছি।

কার্ড বদলাবদলি হল। বি. এল. শাহ—বাড়ি গুজরাট। জর্মন বউ নিয়ে তিরিশ বছর এই শ্বশুরবাড়ির দেশে আছেন। আণ্ডাবাচ্চা অনেকগুলো। ক্যামেরা এবং ঐ-জাতীয় জিনিসপত্র বাইরে সরবরাহ

করেন। হরেক শৌখিন মাল আমদানি করেন ভারত ও পূর্বাঞ্চল থেকে। লক্ষ্মীঠাকরুনের কৃপা আছে, হাবেভাবে মালুম। কথাটা উঠতে মোলায়েম হেসে ঘাড় নাড়লেন: উঁহু, এমন আর কী। অর্থাৎ বিলক্ষণ দু-পয়সা আসছে ঘরে, পরম আনন্দে আছেন।

আমার কার্ড পড়ে শাহ মশায় বললেন, বসু দেখছি। বম্বে এলফিনস্টোন কলেজে পড়তাম—একজন বসুর লেখা অ্যালজেব্রা পড়েছি তখন। তাঁদের কেউ আপনি?

ঘাড় নাড়ি: হাজার-লক্ষ বসু আছেন বাংলাদেশে। কোনো সময় হয়তো এক ছিলাম। অনেক আগের কথা।

রাস্তার ধারে ধারে ত্রিপল খাটিয়ে রেস্তোরাঁ—ফুলে ফুলে নন্দনকানন বানিয়েছে। যত্র তত্র। ত্রিপল খাটানোর মানে ইচ্ছা হলেই খুলে ফেলে খোলা আকাশ করা যায়। বসা গেল পছন্দসই একটা জায়গায়। অধমের জন্য আপেল-রস; এবং মালদার ব্যক্তিরা উৎকৃষ্টতর মাল উদরস্থ করছেন।

শাহ মশায়ের গল্প শুনছি—বার্লিনে বোমা পড়ছে, তখন এখানেই তিনি। আটচল্লিশ রাত্রি, মশায়, পর পর বোমা পড়ল। সন্ধ্যে হলেই দুড়দাড় লেগে যায়। আলো-নেভানো শহর—বোমার আগুন ক্ষণে ক্ষণে উপরের আকাশ উজ্জ্বল করে তুলছে। বাড়ির পর বাড়ি ভেঙে পড়ছে, আহতের আর্তনাদ উঠছে এদিকে-সেদিকে। অন্ধকার শহরের উপর দশ-বিশ হাজার প্রলয়ঙ্কর দৈত্য ছেড়ে দিয়েছে যেন। সারা রাত্রি চলত এইরকম, সকালবেলা চারিদিক ফরসা হয়ে গেলে তবে ঠাণ্ডা। এরা তাড়িয়ে দিচ্ছে কখনো আকাশে উঠে। তাড়া খেয়ে এরাই বা নেমে এসে ভূতলে মুখ লুকায়। অথবা ধীরে সুস্থে নামবারই ফুরসত দিল না, বোঁটা-ছেঁড়া আমের মতন গড়িয়ে পড়তে হয়। রোজ আমি একটা জায়গায় আশ্রয় নিতাম, সন্ধ্যে হলেই চলে যেতাম সেখানে। সে-রাত্রে ভাগ্যিস যাই নি। ভগবানের ইচ্ছা, বেঁচে থাকব—নয়তো কেন যাবার ইচ্ছে হল না বলুন? এগারো-শ

মানুষ কবরস্থ হল সেই একটি জায়গায় সে-রাত্রে। দশজন মাত্র কী গতিকে ফিরে এল, তাদের কাছে সব শুনলাম।

—আপনি মশায় সে সময়ে বার্লিনে কেন পড়ে ছিলেন?

—বউ-ছেলেপুলে মাইল ত্রিশেক দূরে এক গাঁয়ে গিয়েছিল। আমিও যেতাম সেখানে। কিন্তু ভাতভিত্তি সমস্ত বার্লিনে—শহরের পাট চুকিয়ে একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসি কী করে? ব্রিটিশ তখন জর্মনির শত্রু—আমি হলাম ব্রিটিশ-প্রজা। গোড়ার দিকটা আমেরিকার উপর আমাদের খবরদারির ভার। তারপর আমেরিকা নেমে পড়ল তো নিরপেক্ষ সুইসেরা অভিভাবক হল। লড়াই অন্তে সুইস অ্যাম্বাসি-সুদ্ধ ধরে নিয়ে গেল রাশিয়ায়—একেবারে ন-পিতা ন-মাতা ন-বন্ধু ন-ভ্রাতা অবস্থা আমাদের। উঃ, কী অবস্থায় যে দিন কেটেছে!

—দু-দুটো লড়াইয়ে আচ্ছা রকম শিক্ষা হল এদের, কী বলেন?

একটু ইতস্তত করে শাহ বললেন, কোথায়! আবার তো মাতামাতি দেখছি। লড়াইয়ের আগে যেমন দেখতাম, খানিকটা সেইরকম। পশ্চিম-জর্মনির আঠারো জন বাঘা-বাঘা বৈজ্ঞানিক অ্যাটম-বোমার বিরুদ্ধে কড়া মন্তব্য ঝেড়েছেন, এই যা। ইহুদিরা আবার সব ফিরে এসেছে। হিটলার কেড়ে-কুড়ে নিয়েছিল—আমেরিকা মুরুব্বি হয়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি ফেরত দিয়েছে। জর্মনদের মনোভাব জানতে তো বাকি নেই—শুধু তারা হলে এক আধলাও দিত না। যার যত সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, লড়াই মিটে গেলে সরকার তার দাম ধরে অর্ধেক দিয়ে দিলেন। টাকা অবশ্য আমেরিকার। নগদ টাকা পেয়ে সুবিধা হল সামলে ওঠার। বড় বড় শিল্পপতি স্পষ্টাস্পষ্টি অনেকেই বলে, লড়াই হয়ে ভালো হয়েছে। যন্ত্রপাতি ছিল সেকেলে—ফ্যাক্টরিগুলো বজায় থাকলে তো ওরই উপর কিছু তালিতুলি দিয়ে কাজ চালাতাম। বিলকুল নিপাত গেল, বাতিল জিনিসের বদলে করকরে একগাদা টাকা পেয়ে গেলাম। আধুনিক কলকব্জায় ফ্যাক্টরি ঢেলে সাজা হয়েছে একেবারে।

ছয়

স্প্রী নদী শহরে পথ হারিয়ে ঘুরপাক খেয়েছে শতেক বার। তার পর বেরিয়ে পড়ে এক ছুটে অনেক দূর গিয়ে লেকে পড়েছে। লেক ছাড়িয়ে গায়ে-গতরে ভারিক্কি হয়ে ধীর মন্থরে চলেছে উত্তরসাগর-মুখো। রবিবার পেয়ে আমরাও বেরুলাম বার্লিন থেকে। স্প্রীর পথ দেখে আসি। স্প্রীর সঙ্গে সঙ্গে চলব। লেক অবধি তো যাচ্ছিই—লেক ছাড়িয়েও দেখা যাক কদ্দূর যাওয়া চলে।

স্ফূর্তিবাজ নরনারীর ভরা নিয়ে স্টিমার ছুটছে আজ আধ ঘণ্টা অন্তর। স্টিমার ঠিক নয়, বড় আয়তনের স্টিমলঞ্চ। ঘাট বেশ-খানিকটা দূর—ছাত-ভাঙা বাড়ি, চূড়া-ভাঙা গির্জা দেখতে দেখতে যাচ্ছি। তার পরে এল জঙ্গল—রাস্তার এদিকে জঙ্গল, উলটো দিকে জনালয়। ছুটো ট্যাক্সিতে ঘাট মার্কের মতো উঠে গেল। ডিটজেল নিয়ে যাচ্ছে—ভাড়া সে-ই দিল, ব্যাগ খুলতে দিল না আমাদের কিছুতে।

ট্যাক্সি থেকে নেমেছি, স্টিমারও অমনি ঘাট ছেড়ে বেরুল। আধ ঘণ্টা অতএব চুপচাপ বসে বসে জলশোভা দেখুন। সারি সারি বেঞ্চি পাতা—বসবার অতি উত্তম ব্যবস্থা। জলের হাওয়া খান, আর রোদ পিঠ করে বস্থন বেঞ্চিতে। ঘাট নয়, রীতিমতো এক পার্ক। নদীর কিনারা ধরে ছায়াতরু সাজানো, এ-ধারে রকমারি ফুলের বাগান। বড় বড় বাড়ি—কতক বাড়ি নদীর জলের ভিতর থেকে গেঁথে তুলেছে। বিরাট তিনটে খিলানের উপরে প্রাচীন পুল—পুলের উপরে গাড়ি-সাইকেল-মানুষজনের স্রোত। ছোট্ট ছোট্ট নৌকো যাচ্ছে বৈঠা বেয়ে—হাওয়া তেমন নেই বলে পাল গুটিয়ে রাখা। তরুণী আর তরুণ ছু-তিনটি করে ফি নৌকোয়। রবিবার—তায় বসন্তকাল, উজ্জ্বল রোদ, উষ্ণ আবহাওয়া—ঘরে তাই একজন কেউ পড়ে নেই

বোধহয় আজকে। মাতামাতি করতে বেরিয়ে পড়েছে। এমন জীবন আমরা ভাবতে পারি নে।

নদী মানে বড় কিছু নয়—কলকাতার গঙ্গার আধাআধি বড় জোর এখানে। জোয়ারবেলা জল বাড়ছে, স্রোতে ভেসে ভেসে যাচ্ছে নৌকো। একটা-দুটো লঞ্চ বিষম শব্দে উজান কেটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। জেটি যেখানটা, ঠিক তার পাশে অতিকায় উইলো গাছ। প্রশাখা ও পাতা ঝুঁকে পড়েছে কেশবতীর বিস্রস্ত চুলের রাশির মতো। এমনি চেহারার জন্যই বলে উইপিং উইলো। সত্যিই আপনার মনে হবে, নদীকূলে ঝাঁকড়া-চুল শোকাতুরা কে-একজন দাঁড়িয়ে।

স্টিমার দেখে দ্রুতপায়ে উইলোর ছায়ায় কিউয়ের ভিতর এসে দাঁড়ালাম। বেঞ্চির উপর রাও ব্যাগ ফেলে এসেছেন—এক বুড়ি চেঁচামেচিতে সাড়া না পেয়ে এদ্দূর এসেছে সেই ব্যাগ হাতে নিয়ে। কড়া রকম বকুনিও দিল বোধ হয়। কিন্তু ভাষা জানা নেই—আদরের বুলি নয়, তাই বা কে বলতে পারে? মানুষজন ওঠানামা করছে—সে কি একজন দু-জন, কিংবা এক-শ দু-শ? আর জায়গা নেই, স্টিমার তবু দাঁড়িয়ে। লোক উঠছে, চেয়ার বের করে করে দিচ্ছে তাদের জন্য। শেষটা চেয়ারে আর কুলায় না। এক তরুণ আর এক তরুণী—প্রেমিক না আর-কিছু? সন্দেহ অচিরাৎ কেটে গেল—কী কথার উপর মেয়েটা বাঁ-হাতে বিরাশি সিক্কার চড় কষিয়ে দিল ছেলেটার গালে। দিয়ে হাসতে হাসতে তার চোখের গগলস কেড়ে নিয়ে পরল। ঐ বিষম চড় এবং চড়ের সঙ্গে সঙ্গে হাসি প্রেমিকা ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভবে না। হিটলারের দেশের প্রেমিকা তো!

ছাড়ল স্টিমার। পুলের নিচে দিয়ে বাঁক কাটিয়ে চলল। সবুজ গাছপালায় ভরা স্নিগ্ধ তটভূমি। গির্জা এখানে ওখানে। ফ্যাক্টরি-পাড়া শুরু হল—একের পর এক অবিচ্ছেদ দাঁড়িয়ে আছে নদীর জল ছুঁয়ে। লড়াইয়ে খতম হয়ে গিয়েছিল, সবগুলো চালু হয়ে ওঠে নি এখন পর্যন্ত। কোডাকের কারখানা দেখছি। এক কাণ্ড হয়েছে

জর্মনি ছু-ভাগ হয়ে যাবার পর—এ-জর্মনি এবং ও-জর্মনিতে একই নামের ফ্যাক্টরি। সাবেকি ফ্যাক্টরি হয়তো পূর্ব-জর্মনির মধ্যে; সরকার সেটা নিয়ে নিয়েছেন। মালিকরা পশ্চিম-জর্মনিতে সরে গিয়ে সেখানে পূর্বনামে নতুন ফ্যাক্টরি গড়েছেন।

আর-এক নদী এসে পড়ল স্প্রীতে—স্প্রী বেশ ডাগর হয়েছে। এত বড় নদীর তীরভূমি কিন্তু পরিচ্ছন্ন। বাঁকে বাঁকে সাঁতারের ঘাট। গোলাপফুলের মতো রং, নগ্ন গায়ে সাঁতরাচ্ছে কত ছেলে কত মেয়ে। জলে ঝাঁপাচ্ছে। যারা কিছু পারে না, পা ডুবিয়ে বসে আছে জলের কিনারায়। ঘাসের উপর ক্যাম্বিসের চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে খানাপিনা করছে, আড্ডা জমাচ্ছে। একটা মেয়ে ঐ ঝুঁকে-পড়া ডাল ধরে আলসে তাকিয়ে আছে চলন্ত স্টিমারের দিকে। উঁচু কাঠের বোঝা সাজিয়ে গদাই-লস্করি চালে চলেছে বড় বড় বোট। বিশাল এই জলের বুকে মোচার খোলার মতন ছোট্ট ডিঙিতে জোড়া বোঠে বেয়ে চলেছে ছুটি শিশু—পাশ দিয়ে স্টিমার চলে যায় জল তোলপাড় করে, একবার তারা তাকিয়েও দেখল না।

কৃষ্ণ মূর্তি দেখে অনেকে আশেপাশে ভিড় করছে। হাতের কলম ছুটে চলেছে, যা-কিছু চোখে আসে লিখে যাচ্ছি খসখস করে। কৌতূহলী সবাই, কিন্তু কথা বলে না।

ডিটজেল বলে, বলবে কী করে? ইংরেজি জানলে তো! রুশ-ভাষাটা শিখতেই হবে, ইংরেজির তাই আদর কমে যাচ্ছে। সামান্য সাধারণ লোকে কটা ভাষা শিখতে পারে বলুন?

আর-একটি ইংরেজিনবিশও আছে দেখি এপাশে। টুক করে বলে উঠল, হোকগে মশাই। সিলেবাসে আছে বটে রুশভাষা, কেউ আমরা তা শিখি নে। মাস্টাররাও দায়সারা গোছের পড়ায়।

মানুষটার মুখে তাকাই। পূর্ব-জর্মনির যেখানে যাচ্ছি, রাশিয়ার নামে শিরনি পড়ে। রাশিয়া অমুক করেছে তমুক করেছে, রুশের মতন ভালো জাত চাঁদের নিচে নেই। তার মধ্যে হঠাৎ এক উলটো সুর।

আচমকা [illegible] বেরিয়ে পড়ল যেন। হিটলার আর্য-আর্য করে মাথা খারাপ করে দিয়েছিল—সেই দেমাকই মানুষটার মুখে।

জঙ্গল ও ছোট ছোট পাহাড় পার হয়ে গিয়ে আবার জনপদ। রবিবারের বিকালবেলা বাড়ি-ঘরে আজ একটি মানুষও নেই বোধ হয়; বেরিয়ে সব জলের ধারে এসেছে। পোলো খেলছে। ছোট ছোট নৌকো ডাঙায় টেনে তুলছে, তার উপরে বসে মনের সুখে আড্ডা দিয়ে সময় হলে আবার জলে ভাসাবে। বাদামি রঙের খুদে খুদে তাঁবু খাটিয়েও আছে অনেকে। একেবারে কোলের বাচ্চাটি নিয়ে বেরিয়েছে কত মা! ইস্কুলের ছেলে কয়েকটা ঘিরেছে আমায়। নতুন ইংরেজি শিখেছে, সেই ইংরেজি প্রয়োগ করে: এত কী লেখো?

তোমার কথা।

আমায় জানলে কী করে?

জানি—

বলো দিকি আমার নাম।

পল।

হি-হি-হি—হল না। বেকুব!

কিন্তু বেকুব হতে বয়ে গেছে আমার। বলছি, নাম তোমার পল-ই। তুমি মিছে কথা বলছ—পল ছাড়া হতেই পারে না।

তরুণীর দল দাঁড় টেনে যাচ্ছে—জন পনেরো এক-এক নৌকোয়। এমনি পাঁচটা নৌকো। বইচের মতন কিছু হচ্ছে। আর ঐ দেখুন, পাল খাটিয়ে দিয়ে হালের হাতল আলগোছে ছুঁয়ে কর্তা-গিন্নি গড়িয়ে পড়েছেন, নৌকো ভেসে চলেছে। দুপাশে এবারে ঘন অরণ্য; পাড়ের উপর মানুষ দেখি না এখন, যত মানুষ জলের উপরে।

নদী এখানটা রীতিমতো প্রশস্ত। বার্লিনের আঁটোসাটো দুই কূলের গাঁথনির ভিতরে বন্দিনী স্প্রী ঝিমিয়ে চলে; এত কাছেই তার এমন বৃহৎ মুক্তি, কল্পনায় আসে না। তেমনি ভাবতে পারি নে,

বার্লিনের মড়ার মতো মানুষগুলো ছাড়াও যৌবনপ্রমত্ত এত মানুষ রয়েছে দেশ ভরে। অতি-বুড়োরাও এখানে যৌবনে জীবন্ত। জঙ্গলের গাছের ছায়ায় নদীর ধারে ঘুমিয়ে আছে জোড়ায় জোড়ায়; নৌকোটা বেঁধেছে এক গাছের সঙ্গে। অথবা শহর থেকে মোটরে এসেছে, মোটর রেখে দিয়েছে অবহেলায় একদিকে। এমনি কত! বেশরম, বে-আবরু। যৌবনের উচ্ছল আবেগে মাতাল হয়েছে যেন। জলের কিনারে অতি প্রকাশ্যে জড়াজড়ি হয়ে শুয়ে। নৌকোয় যাচ্ছে—স্বল্পবাস মেয়েটা গায়ে-গায়ে এক হয়ে। এর মুখে ওর মুখ চেপে স্টিমারেই যাচ্ছে কতজনে পাশাপাশি। কেউ কিছু মনে করে না—অত্যন্ত সহজ সাধারণ ব্যাপার, তাকিয়েও দেখে না কেউ।

কাটা-খাল নদী থেকে বেরিয়েছে। খালে ঢুকে পড়লাম, পথ খানিকটা সোজা হবে। বাঁক ঘুরে এসে দেখি, ইলিশ-ধরা নৌকোর মতো সাদা পালের বহরে জল দেখবার জো নেই। ঘুরে বেড়াচ্ছি স্টিমারের পাটাতনে। দেখাশোনা আলাপ-পরিচয়ের জন্য আসা—একটা জায়গায় ঘট হয়ে থাকতে যাব কেন? ছোট্ট এক মেয়ে ড্যাবডেবে চোখ মেলে চেয়ে আছে, তাকে পাকড়াও করলাম। ইংরেজি জানে না। কিন্তু ডিটজেল আছে, সে-ই প্রশ্ন বুঝিয়ে দিল। প্রশ্ন মামুলি—চীন-রাশিয়া সর্বক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করেছি, সঙ্গে সঙ্গে জবাব মিলে গেছে।

—ভারতের প্রধান-মন্ত্রী কে?

—প্রধান-মন্ত্রী? জানি, হ্যাঁ বলছি, প্রধান-মন্ত্রী হলেন···

ভুলে গেছে, ভাবছে তাই। মা কড়া বকুনি দিয়ে উঠলেন; সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে: নেহরু—নেহরু!

ছিপ নিয়ে বসেছে অনেকে। পুরুষ আছে, মেয়েও আছে। মাছ যা পেয়েছে, স্টিমারের দিকে তুলে ধরে আমাদের দেখায়। হ্রদে এসে গেলাম এবার। কূলহীন—পদ্মা-মেঘনার মতো। মিজেল (Muggelsee) হ্রদ। স্প্রী নদী হ্রদে এসে পড়েছে, হ্রদ ফুঁড়ে

বেরিয়ে চলে গেছে। একটা পাহাড়, তারও নাম মিজেল। আর বেশি দূর যাব না, পাহাড়টা বেড় দিয়ে আবার নদীতে পড়ে ফিরে চললাম বার্লিনে।

চেস্টনাট-গাছ থোপা থোপা সাদা ফুলে ভেঙে পড়েছে। আমাদের গাঁয়ে সোঁদালিগাছে ফুল ধরে যেমন। সোঁদালিফুল হলদে, চেস্টনাট সাদা। ফুলের কাঙাল এরা। আমাদের অনেক আছে—হেলাফেলা করি। ঘাটে নেমে চেস্টনাট-গাছে চড়ে সবাই ফুল ভাঙছে, শুধু হাতে কেউ ফেরে না।

দিনটা খাসা কাটল। বার্লিনে ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় মরামানুষের শহর। শহরের বাইরে প্রাণোল্লাসে ভরপুর হাজার হাজার তাজা মানুষ দেখে এলাম। বাচ্চা ছেলে আর থুখ্‌ড়ে বুড়োর মধ্যে ফারাক নেই—সবাই মিলে ছুটি কাটাতে গিয়েছে।

যাবার সময় ডিটজেলের একগাদা মার্ক খরচ করেছি, এবারে দেখো কম খরচে কিসে হোটেলে ফিরতে পারি। বাসে ট্রামে যাওয়া যাক। ডিটজেল বলে, বাস এখানে নয়। ঐ মোড় অবধি হেঁটে চলুন, ওখান থেকে যাবে।

পোয়াটাক যাওয়া হল হাঁটতে হাঁটতে। সারা দিনের ধকলে পা আর চলতে চায় না, তবু যাচ্ছি। বাসও এল একটা। ওরে বাবা, এর মধ্যে এতগুলো মানুষ ঢোকাবেন, একখানা করে হাত বা পা ঢোকে কিনা তাই দেখুন দিকি চেষ্টা করে! অফিস-টাইমে আমাদের লালদীঘির বাসগুলো নস্যি এর কাছে। রবিবার বলেই এমনি, এদেশে অফিসের দিনে নাকি এত ভিড় নেই।

ঘাটের কাছাকাছি এদিকটা এখন এমনি চলবে। এগিয়ে চলো। যাচ্ছি, যাচ্ছি। রাস্তার পাশে টেলিফোনের খোপ—ডিটজেল এক দৌড়ে তার ভিতর ঢুকে ফোন করে এল। ফিরে এসে বলে, দেখো, বাসে সুবিধে হবে না। অনেক বদলাবদলি, বিস্তর হাঙ্গামা। ট্রামে চেপে যাব রেলস্টেশনে, ট্রেন ধরব।

মাথার উপরের রেল-লাইন একটা ধরা হল। নটা স্টেশন পার হয়ে নেমে পড়লাম। নামছি পাতালে, পাতালের লাইনে এবার। একটা মাত্র স্টেশন গিয়ে পাতাল ফুঁড়ে ফুড়ুত করে ধরার উপর উঠে এলাম। আমাদের হোটেলের গায়ে।

বোদো উশে সন্ধ্যাবেলা খানায় ডেকেছেন। বিস্তর গুণী-জ্ঞানী আসবেন, আমাদের সঙ্গে মোলাকাত হবে। জর্মনি দেশটা ভাগ হয়েছে, লেখকরা কিন্তু হন নি। রাষ্ট্রধুরন্ধরদের কী ক্ষমতা, বাঁটোয়ারা করবে আমাদের! এদেশ-ওদেশের সীমানা-সরহদ্দ নিয়ে তারা নানান সমস্যা বানায়, শক্তির হুমকি ছাড়ে। লোকের দুঃখের অবধি থাকে না। আমরা লেখকরা বানচাল করে দিই সেই চক্রান্ত, কেউ তাদের তাঁবেদার নই। দুনিয়ার মানুষের এক পরিবার গড়ে তুলব। তাই অন্তত দেখলাম জর্মনিতে। এ-জর্মনি ও-জর্মনির লেখক-শিল্পীদের মধ্যে মেলামেশা খুব। অশেষ ভালোবাসা। পশ্চিম-জর্মনির ষোলোজন বৈজ্ঞানিক অ্যাটম-অস্ত্রের বিপক্ষে রায় দিয়েছেন। বোদোর বাড়ি পশ্চিম-জর্মনিরও অনেকে আসছেন। আমাদের দেরি হয়ে গেছে— পথ সংক্ষেপের মানসে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ভাঙাচোরা ইট-পাথরের মধ্য দিয়ে হোটেলে ঢুকছি। হঠাৎ দেখি, সাঁ করে মোটর বেরিয়ে গেল হোটেলের উঠান থেকে।

ডিটজেল বলে, এই রেঃ, উশের গাড়ি। খোঁজ করতে এসেছিলেন, না পেয়ে ফিরে গেলেন।

দৌড়ল সে গাড়ির পিছুপিছু। চেঁচিয়ে ডাকছে। বোদোর কানে গেল না। সবাই এসে হয়তো বসে আছেন, ভারি লজ্জার ব্যাপার। সেইজন্যে বোদো নিজে ছুটেছিলেন। ফোন করে দাও ডিটজেল, দশ মিনিটের মধ্যে আমরা গিয়ে হাজির হচ্ছি।

সাত

আকাশ ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়ছে অনেকক্ষণ থেকে। ট্রেন থেকেই শুনছি। এবার বৃষ্টি নামল। বার্লিন শহর ভাসিয়ে দেয় বুঝি! অবিরল জলের মধ্যে ছুটো গাড়ি ছুটেছে।

বোদোর বাড়ির বাইরের বারান্দায় ক-জনা। ছাতা নিয়ে রাস্তায় নেমে এল মোটর থেকে আমাদের উদ্ধার করবার জন্য। কলকল করে স্রোত বইছে রাস্তা দিয়ে। ছাতা ধরে নিয়ে তুলছে এক রূপসী তরুণী। বোদোর স্ত্রী মেক্সিকোর মেয়ে—আজকে বিশেষ রকম সাজ-সজ্জায় আছেন, নয়তো প্রৌঢ়াই বলতে পারতাম তাঁকে। এ রূপসী হল বাড়ির ঝি—হোটেলের সেই রাজকন্যার মতো মেইড একজন। চেহারা ও পোশাক-আশাকে বুঝবার কথা নয়—বুঝলাম যখন বাসন ধুয়ে ধুয়ে আমাদের হাতে এনে দিচ্ছে।

রসিক মানুষ বোদো। বলছেন, খুঁজে-পেতে তোমাদের জন্য বিশেষ এক খানার যোগাড় করেছি। এসো, এই পদ থেকে লেগে যাও। কাঁটা-ছুরি ধরো।

সেই বিশেষ খানা ঢাকা দেওয়া রয়েছে প্রকাণ্ড পাত্রে। লোলুপ দৃষ্টিগুলোর সামনে সন্তর্পণে বোদো ঢাকা তুললেন। কী কাণ্ড, হাড় একখানা! কোন জীবের এত বড় হাড়, বলতে পারব না। প্রচণ্ড হাসি। যারা ছুরি উদ্যত করেছিল, হাত নামিয়ে নিয়ে গোপন করে।

ঐ হাড়কে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে আরও অনেক ঢাকা-দেওয়া বস্তু। একে একে ঢাকা সরছে। রকমারি মাংস ও সবজি। আর মদ। ইয়োরোপ-এসিয়ার দেশ-দেশান্তরে ঘুরলাম, মদের অবাধ সমারোহ। আমি বড় মুশকিলে পড়ি। মদ ওসব দেশে গঙ্গাজলের মতোই মাঙ্গলিক। এদেশে-ওদেশে দোস্তির কথা উঠল তো ছুটে এসে পাত্র ভরে দিল—পূর্ণপাত্র গলায় ঢেলে দোস্তি মজবুত করে ফেলুন।

বাইরে মুষলধারা, ঘরের ভিতরে উষ্ণ আরাম। বড়রা অনেকে এসেছেন, এখনো আসছেন। দেরি করে এসে আমরা লজ্জা পাচ্ছিলাম —কিন্তু আরও দেরি করেন এবং লজ্জাও পান না, এমনিধারা বীরই বহু। বক্তৃতার ব্যাপার নেই—এঁর সঙ্গে গল্প করুন, ওঁর কাছে যান, কিংবা উনিই উঠে এলেন আপনার পাশে। এমনি সব চলছে। জমজমাট আড্ডা। আধঘণ্টা আগেও যে কেউ কারো মুখ-দর্শন করি নি, এমন কথা কে বলবে? তাঁতের মাকুর মতো বোদো একবার ঘর একবার বারাণ্ডা করছেন। যাঁরা পরে আসছেন, অভ্যর্থনা করে বসাচ্ছেন তাঁদের। এক ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন—তুমুল হট্টগোল—মুখের সামনে ডুখানা হাত মেলে ধরেছেন, মুখ দেখতে দেবেন না।

—বলুন, ইনি কে। বলুন, বলুন।

বার্লিনে পা দেওয়া অবধি এক বাঙালির নাম শুনছি—ব্যানার্জি। বিনু ব্যানার্জি। বোদোর পরম বন্ধু। আমাদের সাজ্জাদ জাহিরের সহপাঠী—জাহিরও বার বার ব্যানার্জির কথা বলছেন। সেই ভদ্রলোক একটু আগে বার্লিনে এসে পড়েছেন বন্ থেকে সোজা মোটর হাঁকিয়ে। বোদো হাত সরালে দেখি, খুবই চেনাজানা আমার। একসঙ্গে আমরা চীনে গিয়েছিলাম। কলকাতা য়ুনিভার্সিটিতে আছেন। ছুটি নিয়ে এখন ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন জর্মনির নানান তল্লাটে।

আশ্চর্য সাহসিক জীবন। চীনে একসঙ্গে কাটিয়েছি, ঘুণাক্ষরে জানি নে। বার্লিনে এই খাতির দেখে চমকে যাই। ছাত্র-জীবনেই বিনা পাসপোর্টে একদা তিনি লণ্ডনে গিয়ে হাজির। পুলিশ গ্রেপ্তার করে কোর্টে নিয়ে তুলল। হাকিমের কাছে তখন ঝাড়া ডু-ঘণ্টা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। সেই গল্প শোনা গেল জাহিরের মুখে। নাৎসি আমলে বোদো উশে দেশ ছেড়ে পালালেন। অনেক জনের এমনি অবস্থা। এদেশ-ওদেশ করে শেষটা মেক্সিকোয়

গিয়ে উঠলেন। বিনু ব্যানার্জিও গিয়েছিলেন মেক্সিকো। ভাবসাব সেই তখন থেকে।

আমার ক-খানা বই নিয়ে গেছি, দিয়ে আসব। বাংলা জানে না, অতএব বারকয়েক নেড়েচেড়ে রেখে দেবে। কিন্তু বাংলা-জানা যাঁদের দিই, তাঁরাও কি ছাই পড়েন? দোষ দিই না, আমার নিজের বেলাতেও ঠিক এই। এক লেখক অন্য লেখকের বই পড়ে না—জানাশোনা স্বগোত্রের তো নয়ই। নিজের বইও নয়। লিখে লিখে বই সম্পর্কে এক বিন্দু মোহ নেই। বই উপহারের ফলাফল স্বদেশে বিদেশে অতএব একই রকম। বই ছাড়া আর এনেছি কৃষ্ণনগরের কিছু পুতুল এবং টুকিটাকি এটা-সেটা। একটা পুতুল—লাঙল-কাঁধে চাষী—দিলাম বোদোকে। বোদো ঘাড় নাড়েন: উঁহু, আমার স্ত্রীকে দিন। তাকে ডাকি। বড্ড খুশি হবে।

—তাঁর জন্যেও রয়েছে।

পকেট থেকে বের করলাম মিনা-করা সেকেলে ধরনের কৌটা। বোদো উল্লাসে চেঁচাতে লাগলেন: এসো গো—কী এসেছে এই দেখো তোমার জন্য। মেক্সিকো-থেকে জুটিয়ে আনা স্ত্রী। কৌটো হাতে নিয়ে মহিলা দু-তিন পাক প্রায় নেচে নিলেন। সকলের কাছে নিয়ে নিয়ে ঘুরছেন: দেখো গো—দেখো গো—। ড্রইংরুম ওঁদের আর্ট-গ্যালারি বললে হয়—নানান দেশের শিল্প-সংগ্রহে সাজানো। আমার দেওয়া জিনিস দুটো তাকের উপর চোখের সামনে রেখে দিলেন।

খানাপিনা ও আলাপ-সালাপ চলছে। খুব নাম-করা লেখিকা, কত টাকা রোজগার করেন তার লেখাজোখা নেই—আনা সেগের্‌স্ (Anna Seghers)। স্বাস্থ্যবতী, মাথার চুল পেকেছে, সদাই হাসছেন, মাতৃত্বের মাধুর্য মুখের উপর। আর একজন লেখক ফ্রান্‌স্ ফেবিয়ান (Franz Fabian)—বড় ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার। এঁরও বয়স হয়েছে, সদালাপী, কানে অত্যন্ত কম শোনেন। বললেন,

হিটলারের আমলে জেলে পুরেছিল। বেরিয়ে এসে ফ্রান্সে পালাই। ফ্রান্স দখল হয়ে গেল তো চ্যানেল পেরিয়ে ইংল্যাণ্ডে।

কনসেনট্রেশন-ক্যাম্পের স্বাদ পেয়েছেন?

উঁহু, অতদূর নয়। অত্যন্ত বনেদি বাড়ির মানুষ আমি। ভেবেছিল, জপিয়ে-জাপিয়ে আমায় দলে নেওয়া যাবে। শুধুমাত্র আটকে রাখল, গায়ে হাতখানাও ছোঁয়ায় নি। জর্মনির যত লেখক মিলে আন্দোলন আরম্ভ করলেন, তখন ছেড়ে দিল। বুঝে দেখলাম, লড়াই যত জমবে মরিয়া হয়ে উঠবে ততই নাৎসিরা; তখন মরে গেলেও ছাড়বে না। বুঝে-সমঝে সরে পড়লাম।

হীরামানিক কত আজ জমেছেন একটি ঘরে! কোনদিকে মুখ ফেরাই, কার্কে বা পিছন ফেলি। স্টিফান হাইন—উপন্যাসে খুব নাম। লড়াইয়ে গেলেন, সেখানেও কাজ করলেন। ভালো ভালো খাতির-সম্মান পেলেন বাহাদুরি দেখিয়ে। তারপর মত ঘুরে গেল। বড় বড় উপন্যাস লিখে ফেললেন লড়াইয়ের পাশবতা নিয়ে। আইসেনহাওয়ারের কাছে গিয়ে সম্মান-পুরস্কার সমস্ত ফিরিয়ে দিলেন নিজ হাতে। বলিষ্ঠ দীর্ঘ-দেহ, দৃঢ়কণ্ঠের কথাবার্তা—ভদ্রলোকের চেহারা হাবভাব মনের উপর দাগ কেটে যায়। এসীয় লেখক-সম্মেলনে আমার অভিভাষণ এক কপি দিলাম তাঁকে। পাতা উলটালেন, বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে দু-এক কথা হল। নদী আর লেক ঘুরে আসছি শুনে বললেন, আমি এক পাকা মাঝি তা জানো, নিজের নৌকো আছে। আর একদিন চলো আমি ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। লেক ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূর চলে যাব। নিজের গাড়ি আছে, সোজা নৌকো-ঘাটে নিয়ে হাজির করব, হাঙ্গামা পোহাতে হবে না। যাবে?

ছুটে গিয়ে গাড়ি থেকে ম্যাপ নিয়ে এলেন। টিপটিপে বৃষ্টি তখনো। বার্লিন ও গোটা জর্মনির বড় ম্যাপ। দেশটা কী রকমে দু-ভাগ হয়েছে, আঙুল বুলিয়ে দেখাচ্ছেন। বললেন, ম্যাপটা তোমায়

দিয়ে দিচ্ছি। জর্মনি ঘুরছ, তোমার খুব কাজে আসবে। বুঝতে পারবে, কত বড় সর্বনাশ হচ্ছে দেশ-বিভাগের এই শয়তানিতে।

জন কয়েক মেয়ে এক জায়গায় হয়ে আলাপ করছেন। টিপ্পনী কাটছি আমরা : ওঁদের কথাবার্তা আন্দাজ করতে পারেন ? সাজগোজ নিয়ে নিশ্চয়—তা ছাড়া আবার কি ! মেয়েদের ডেকে শুনিয়ে দিলেন একজনে : শুনছেন—হের অমুক বললেন, আপনাদের আলোচনা নাকি পোশাক-আশাক আর সেণ্ট-পাউডার নিয়ে। উশে-গিন্নির জবাব সঙ্গে সঙ্গে : না গো, আমরা বলাবলি করছি প্রেমে পড়া নিয়ে। হাসি উঠল। তা সত্যি, তুনিয়ায় মোটমাট তিনটে সমস্যা মেয়েদের—পোশাক, প্রসাধন আর প্রেম।

আর-এক মহিলার সঙ্গে আলাপ করছি। জাত্যংশে জর্মন, কিন্তু রং ময়লা।

—আপনি লেখেন ?

—উঁহু, আমার স্বামী। ঐ তিনি। আলাপ করুন আমার স্বামীর সঙ্গে।

স্বামীকে জায়গা দিয়ে স্বামী-গরবিনী সরে গিয়ে বসলেন। জাঁদরেল লেখক—গুন্ট্‌হের ভাইসেনবোর্ন (Gunther Weisenborn), পশ্চিম-জর্মনির হামবুর্গে থাকেন। ওখানকার লেখক-সমিতির সভাপতি। বললেন, আমাদের ওদিকটা দেখে যাবে না ?

আমরা একপায়ে খাড়া, ঘোরাঘুরির জন্যেই তো এসেছি। মানুষজন দেখব, খোদার তুনিয়া দেখে যাব তু-চোখ মেলে। হামবুর্গের আর-এক লেখক ফ্রাঙ্ক পেকাক (Frank Pecak) বললেন, পশ্চিম-জর্মনি যেতে ভিসার হাঙ্গামা নেই। ভারতের সঙ্গে ভাবসাব আমাদের। লেখক-মানুষেরা এসেছ, দেখেশুনে তুটো অংশের বিচার করে দেখা উচিত।

সেই কথা রইল। গিয়ে ওঁরা নিমন্ত্রণ পাঠাবেন লেখক-সমিতির তরফ থেকে। রাহাখরচের বন্দোবস্ত করবেন। বার্লিনে আছি কয়েকদিন এখনো, তার মধ্যে সব এসে যাবে।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। হামবুর্গের চিঠি এল না। ভুলেই মেরেছেন, কিংবা হয়তো লেখক-সমিতি চান না আমাদের। পূর্ব-জর্মনির দাওয়াতে এসে পশ্চিম-জর্মনিতে ঘোরাঘুরি করব, খুব সম্ভব এটা তাঁদের পছন্দ-সই নয়।

অধ্যাপক হাইন্‌স্‌ কামনিফার (Heinz Kamnifzer) এসেছেন। বয়সে তরুণ, বার্লিন য়্যুনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়ান। মনোরমা তরুণী স্ত্রী সঙ্গে। আমায় বলছেন, ইংল্যাণ্ডে ছিলে তুমি? নয়তো এমন ইংরেজি শিখলে কী করে?

বুঝুন। এ-কথার পৃষ্ঠে ও-কথা জুড়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বলি, গ্রামার-ভুলের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত—তাই হল ওদের মতে ভালো ইংরেজি। তোমাদের শখের শেখা, আমাদের ছিল অন্নের দায়ে। ইংরেজ ঘাড়ের উপরে চেপে ছিল পৌনে দু-শ বছর। ইংরেজির তুফান বইয়ে দিয়েও তো চাকুরি মেলে না কত হতভাগার!

নাৎসি-আমলে কামনিফার ইস্কুলের পড়ুয়া। ছেলেদের মাতব্বর হয়ে রাস্তায় মিছিল বের করলেন একবার। কর্তাদের নজর পড়ল। আর-একবার বেনামিতে লিখলেন নাৎসিদের বিরুদ্ধে। নাম না থাকলে কী হবে, ঠিক ধরেছে। ধরে নিয়ে জেলে পুরল। কিছুকাল আটকে রেখে প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিল। ছাড় পেয়ে এক দৌড়ে অমনি লণ্ডনে। লড়াই বাধল। একটানা বারো বছর ইংল্যাণ্ডে। লণ্ডন ইস্কুল অব ইকনমিক্‌সে পড়ছেন, ইংরেজি শিখে নিতে হল সেই সময়।

অধ্যাপক বললেন, বড্ড ভালো লাগল তোমার সঙ্গে আলাপ করে। সত্যি, বড় আনন্দ পেলাম।

—কিন্তু আমার লেখা আর তোমার লেখায় তো আকাশ-পাতাল ফারাক। তোমার কারবার সত্য নিয়ে, ইতিহাসে মিথ্যের ভেজাল চলে না। আর আমি গল্পকার, কলম ধরেই মিথ্যে বানাতে বসে যাই।

—আমার চেয়ে ঢের ঢের বড় সত্য বানাও তোমরা। নয়তো অত মানুষের মনে ধরবে কেন?

ভিজতে ভিজতে এক নিগ্রো ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন। লেখক নন, কিন্তু মজলিশি মানুষ। সবাই কাছে ডাকে : আসুন, আসুন। ভারী ভারী এই গুণিজনদের মধ্যে দু-মিনিটে আচ্ছা রকম তিনি জমিয়ে নিলেন।

এরই মধ্যে একসময় উশে-গিন্নি গ্রামোফোনে বাজনার রেকর্ড চাপিয়ে দিলেন। বুফে-খানা—যে যার মতো নিয়েথুয়ে খাচ্ছেন। গিন্নি বড় বড় চোখ মেলে তদারকে ছিলেন, ফাঁকিজুকি দিচ্ছে কিনা কেউ। সন্দেহ মাত্রেই বিনা বিচারে যথেচ্ছ চাপিয়ে দিচ্ছেন—আপিলে রেহাই নেই। বাজনা হতেই গিন্নি ওদিক ছেড়েছুড়ে বল-নাচ শুরু করলেন নিগ্রো ভদ্রলোকটির সঙ্গে। এক পাক হয়ে যেতে স্টিফান হাইন ধরলেন তাঁর হাত। কামনিফারের সুন্দরী বউও নাচছেন একজনের সঙ্গে। সাকুল্যে এই দু-জোড়া। সবাই উসখুস করছে সুন্দরীর হাত ধরে নাচবার জন্য। পাত্রের পর পাত্রে রসিকদের কণ্ঠ অবধি টইটুম্বুর। অধ্যাপক বোধ করি গতিক বুঝেই বউয়ের হাত ধরে উঠে পড়লেন রাত হচ্ছে বলে। উশে-গিন্নি আমার উপর বিষম খুশি—উপহার দিয়েছি, এবং মেক্সিকোর মায়া-সংস্কৃতি ও ভারত-সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ আছে বলে খুব একচোট গুণগান করেছি। একেবারে মিছাও নয়—গ্রামোফোনে মেক্সিকোর লোক-সঙ্গীত শোনালেন, বাংলাদেশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে অবিকল এমনি সুরই শুনতাম একদিন। বাপের বাড়ির প্রশংসায় গিন্নি গলে গিয়েছেন। আমায় ডাকছেন : এসো নাচি, এসো না—

আমি কানে শুনছি নে, আলাপনে মত্ত আর-একজনের সঙ্গে। গিন্নির কথা শুনতে পেলাম না, কী করব!

আর-এক মহিলা কাছে এসে বললেন, তুমি ইংরেজি জানো, ঠাহর করি নি। আমিও লেখিকা, বাচ্চাদের বই লিখি। আমার

স্বামীও লিখতেন। নামী লোক ছিলেন তিনি—ভাইসকোফ (Weis-copf)। আমার ফ্লাটে চলো তোমরা একদিন। তোমাদের দলের সবাইকে বলেছি, তোমাকেও বলি। ভারত সম্পর্কে আমার মোহ আছে, তোমাদের একটু জানতে বুঝতে চাই।

আর-এক মার্কিন মেয়ে—কী কাণ্ড, বাপরে বাপ! আনন্দের সঙ্গে আগের চেনা। দু-হাতে আনন্দের গলা জড়িয়ে ধরে মুখের উপর প্রায় মুখ রেখে হাসিঠাট্টা ও রসালাপ করছেন। এ প্রক্রিয়া দেখার অভ্যাস নেই, হঠাৎ কিছু উৎকট লাগে। ঘরময় হাসি উঠল, সকলে বেশ রসিয়ে উপভোগ করছেন। শ্রীমতী আব্রে প্যাংকে (Aubrey Pankey), ইউনেসকোয় কাজ করতেন, ইন্দোনেশিয়ায় ছিলেন অনেক দিন, কী কারণে চাকরি গেছে—আপাতত বার্লিনে এসে আছেন। নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াবেন, আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করলেন। বার বার বলছেন, তারিখ দাও কবে যেতে পারবে।

—ভাত খাওয়াবেন তো ?

—হ্যাঁ, ভাতই তো। ইণ্ডিয়ান কারি-পাউডার যোগাড় করে রেখেছি, তাই দিয়ে তরকারি রাঁধব। খুব ভালো রাঁধি আমি, ইন্দোনেশিয়া থেকে অভ্যাস। খেয়ে দেখবেন।

আনন্দ বললেন, আমিও ভালো রাঁধি। অতি চমৎকার। আমার বউয়ের চেয়ে অনেক ভালো। সে-ও তা স্বীকার করে। বউকে আমি রাঁধতেই দিই না অনেক দিন।

—কী বললে ? হায়, হায়—বউ আছে তোমার ?

আনন্দের গলা ছেড়ে ঘুরপাক খেয়ে শ্রীমতী প্যাংকে যেন ছিটকে পড়লেন এদিকে। আর্তনাদ করছেন : তোমার বউ আছে, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। আজ আমার দুঃখের দিন, কান্নার দিন। হায়, হায়, হায় ! হাসবেন না আপনারা কেউ, আমার সর্বনাশ নিয়ে মজা করবেন না।

আর হেসে সবাই গড়িয়ে পড়ছে। আনন্দও তেমনি অভিনয়ের

জঙে বললেন, কুছ পরোয়া নেই—বউকে আমি ডাইভোর্স করব। সকলের সামনে এই কথা দিয়ে রাখছি।

রাত সাড়ে-বারোটা। একে ছয়ে নিমন্ত্রিতেরা সকলে বিদায় নিয়েছেন। ক-জন মাত্র আমরা। বৃষ্টি থেমে গেছে। কিন্তু ইঞ্জিনে জল ঢুকে একটা গাড়ি কিছুতে স্টার্ট নিচ্ছে না। ঠেলেঠুলে অনেক চেষ্টা করে দেখা গেল। বিমু ব্যানার্জি বললেন, চলো, আমার গাড়িতে তোমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যাব। সরকারি গেস্ট-হাউসে উঠেছি, তোমাদের হোটেলের খুব কাছে।

প্যাংকে রাস্তা অবধি নেমে এসে জনে-জনের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করে বললেন, আসবে কিন্তু আমার বাড়ি। নিজে রাঁধব। খেয়ে দেখো, তোমাদের দেশি তরকারির স্বাদ পাবে।

প্যাংকের বাড়ির খাওয়ায় অন্য সবাই গিয়েছিলেন, আমার যাওয়া ঘটে নি। স্বামী সঙ্গে আছেন, নামজাদা গায়ক, তিনিও দিলদরিয়া মানুষ। স্বামী আর স্ত্রী আনন্দের নীড় রচনা করে আছেন বার্লিনে।

আট

জর্মন আকাদেমি অব আর্টস দাওয়াত করে এনেছেন হাজার হাজার মাইল দূরের ভারত থেকে। বিকাল চারটেয় আজ কানুনমাফিক সংবর্ধনা। আকাদেমি অত্যন্ত বনেদি সংস্থা—১৬৯৬ অব্দে প্রতিষ্ঠা, সাড়ে-তিন-শ বছরের বেশি হয়ে গেল। তখন নাম ছিল প্রাশিয়ান আকাদেমি অব আর্টস। লড়াইয়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ১৯৫০-এর মার্চ থেকে নতুন করে চালু হয়েছে, নামও বদলেছে সেই তখন থেকে।

আকাদেমির সভ্য রামা-শ্যামা কেউ নয়, জর্মনির বাঘা-বাঘা শিল্পী-সাহিত্যিক। দেশের মাটির দুটো ভাগ হল, কিন্তু শিল্পী-লেখকদের বখরা-বাঁটোয়ারা হয় নি। সংস্কৃতির বিভেদ এঁরা স্বীকার করেন না। হবেই বা কিসে—ভাষা জাতি ধর্ম জীবনচর্যা কোনো দিক দিয়েই তিলেক ফারাক নেই। পুব ও পশ্চিম উভয় জর্মনির দিক-পালেরা আকাদেমিতে আছেন। হাজির হতে না পারেন, তার জন্যে আটকাবে না। সভ্য তিন রকমের—সাধারণ সভ্য, লিপি-সভ্য এবং সম্মানী সভ্য। সাধারণেরা আকাদেমির কাজকর্মে অহরহ লেগে থাকেন, উত্তম ভাতার ব্যবস্থা এঁদের জন্য। বার্লিনের বাইরে যাঁরা থাকেন, সর্বদা হাজিরা দিতে পারেন না, তাঁরা সব লিপি-সভ্য; আকাদেমির সঙ্গে চিঠিপত্রের মারফতে যোগাযোগ রাখেন। সম্মানী সভ্যেরা প্রায়ই বুড়ো-হাবড়া মানুষ, সাহিত্য-শিল্পের নেতৃস্থানীয়; তাঁরা মেম্বার আছেন বলেই দেশবিদেশে আকাদেমির নামডাক।

শহরের কেন্দ্রে নিজস্ব বিশাল অট্টালিকা, আলিসার উপর বড় বড় হরফে আকাদেমির নাম লেখা। বোমার ঘায়ে হানাবাড়ি হয়ে আছে। ভাড়া বাড়িতে এখন কাজ চলে। দোতলার হলঘরে লম্বা টেবিল ঘিরে আমরা ওঁরা বসেছি। টেবিলের উপর বিবিধ অনুপান সহ চা কফি এবং রকমারি পানের আয়োজন। বিস্তর ভালো ভালো

কথা, সে আর কী লিখব—আপনারা চোখ ঠারবেন : নিজেদের ঢাক পেটাচ্ছে, এই দেখো। জওহরলালের প্রশংসা, তাঁর পঞ্চশীলের কথা। টেগোরে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও উঠল। অর্ধেক পৃথিবী প্রায় তো ঘোরা হয়ে গেল ; যথাধর্ম বলছি, ভারতের দুটো নাম বার বার কানে এসেছে—রবীন্দ্রনাথ আর জওহরলাল। আরও এক-আধজন কালেভদ্রে উঠতে পারেন, সে কিছু ধর্তব্যের ব্যাপার নয়। এত বড় ভারতে ঐ দুজন মাত্র মানুষ।

বই উপহার দিচ্ছেন আকাদেমির সভ্যদের লেখা। নাম লিখে হাতে হাতে দিচ্ছেন। জর্মন বই—নেড়েচেড়ে রেখে দিই। ছবির অ্যালবাম কতকগুলো—আকাদেমির শিল্পীদের আঁকা ছবি। ছবির ভাষা সবাই বোঝে—পাতার পর পাতা উলটাচ্ছি, মুগ্ধ হয়ে দেখি এক-একটা ছবি। চিত্রবিদ্যার বিদ্যাসাগর নই, তবু এটা মনে হচ্ছে ইম্প্রেশনিজমের জোয়ার এখন জর্মনিতে। একটা ছবিতে অবাক হলাম—ঘোরতর হিটলারি আমলেও হিটলারকে ছেড়ে কথা কয় নি। তাই দেখলাম, আষ্টেপৃষ্ঠে শিকল বেঁধেও শিল্পীর হাত পঙ্গু করা যায় না।

আমি কী দিই, কী দিতে পারি পালটা ওঁদের ? বই একখানা তো বটেই—আমার লেখা বাংলা বই। কেউ পড়বেন না, বাংলা-জানা একটি জর্মনও নেই বার্লিনে, কোনোদিন কেউ বাংলা শিখে নেবেন তারও সম্ভাবনা দেখি নে। সেই কথা লিখে দিলাম বইয়ে : এক বাঙালি লেখক একদা এসে আদর-আপ্যায়ন নিয়ে গেছে, তার স্মৃতি-স্বরূপ এই বাংলা বই। আর দিলাম কৃষ্ণনগরে গড়া মাটির এক বুদ্ধমূর্তি। এবং ফাউ হিসাবে মিনিট দুয়েকের এক বক্তৃতা : মিলিটারি জাত তোমরা, গোটা দুনিয়া বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এবারে তোমাদের মুখে অহিংসার বুলি, সহ-অবস্থানের প্রস্তাব। আমাদের দলে এসে গেছ তা হলে। ইতিহাস পড়ে দেখো, আমার ভারতের লোকজনও সীমান্ত পার হয়ে ভিন দেশে গিয়ে পড়েছে। তাদের হাতে কিন্তু মারণাস্ত্র নয়, ঘর ভাঙে নি তারা কোনো মানুষের।

শান্তি ও আনন্দের বার্তা তাদের মুখে, সর্ব মানুষের কল্যাণ-ভাবনা তাদের অন্তরে। অহিংসাবাণীর প্রাচীন উদ্গাতা হলেন প্রভু বুদ্ধ। তাঁর এই প্রতিমূর্তি তোমাদের আকাদেমিতে রেখে দিও। এতদিনে তোমাদের সময় এসেছে বুদ্ধবাণী বুঝবার, বুদ্ধের সমাদর হবে এইবার এদেশে।

[ডায়েরি—মঙ্গলবার, ২১শে মে ১৯৫৭]

সাড়ে-আটটা। সূর্য ডুবল এতক্ষণে, সন্ধ্যা হবো-হবো। আরও আধ-ঘণ্টাখানেক নেবে ঘোর হতে। দিনমান নড়তে চায় না। সকাল-বেলা ধড়মড়িয়ে উঠি, চারিদিক রোদে ভরা। কত বেলা হয়ে গেছে না জানি! ঘড়িতে দেখি পাঁচটা।

বসন্ত কাল। রাতের আয়ু বড্ড ছোট। এরা কিন্তু নটার আগে সকাল বলে মানবে না। হোটেলের ঘরে কাচের জানলা; কাচের এদিকে নেটের পর্দা, তার উপরে ভারী কাপড়ের পর্দা। বেলাবেলি দুটো পর্দা ফেলে ঘর অন্ধকার করে দিয়ে যায়। অর্থাৎ পাঁচটার আগেই রাত্রি করে দিল ঘরের মধ্যে। নটায় শয্যা ছেড়ে উঠে পর্দা সরিয়ে আবার দিনমান বানাও। চায়ের ইচ্ছা কর তো হুকুম দিয়ে রেখো, ছটায় কিংবা যে সময় বলো দরজায় ঘা দেবে। আলুথালু বেশে উঠে কোনো গতিকে দরজা খুলে দাও। চোখ বুজে বুজে চাটুকু গলায় ঢেলে আবার লেপের নিচে ডুব মারো। কেউ কোনো রকম ঝামেলা করতে যাবে না।

আমার গতিক আলাদা। ঘরে ঢুকেই পরদা দুটো দিই সরিয়ে। টেবিলের পাশে জানলা। কলম নিয়ে বসি, কিন্তু লেখা এগোয় না। ভয়াবহ ধ্বংসের চেহারা চারিদিকে। ইটের পাহাড়, দু-চারটে খাড়া দেয়াল। দুয়োর-জানলা পুড়ে নিশ্চিহ্ন, ঘোর কালো ঐ সব জায়গায়। কংক্রিটের গাঁথুনি ভেঙেচুরে গিয়ে ভিতরের লোহালক্কড় বেরিয়ে পড়েছে। আজ সকালেই দেখলাম, ইট-বালি সরাচ্ছে এক ভাঙা

[illegible]কা থেকে, খান আষ্টেক লরি-ভরতি রাবিশ কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়। লড়াই কবে চুকে গেছে, তার পর থেকেই কাজ চলছে, শ্মশানের চেহারা আজও তবু বদলাল না।

গোড়ায় যে ঘর দিয়েছিল, তার সঙ্গে বাথরুম নেই। স্নানের এরা পরোয়া করে না, কিন্তু আমার অভ্যাস আলাদা। অসুবিধা জানাতে ঘর বদলে দিল। না বুঝে অমন ঘর দিয়েছিল, মাপ চাইল তার জন্য। এবারের ঘর কিন্তু সাংঘাতিক আর-এক দিক দিয়ে। জানলা দিয়ে চ্যানসেরি দেখা যায়—হিটলারের বাসের জায়গা ও কর্মকেন্দ্র, শেষ দিনের আশ্রয়স্থল। দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য করে গড়েছিল মাটির নিচে অনেক সুগোপন রম্য কক্ষ। সেই চ্যানসেরির ধ্বংসাবশেষ বলব না, অবশেষ কিছুই নেই—বড় বড় কংক্রিটের চাঁই, খানাখন্দ আর জঙ্গল। বিজয়ীর সকল আক্রোশ বারংবার ফেটে ফেটে পড়েছিল ঐ জায়গার উপর, ইমারতের চিহ্নমাত্র থাকতে দেয় নি। জনহীন কবর-ভূমির মতো। আগাছা ও বড়-ঘাসে ভরে আছে, কাঁটা-তারের বেড়ায় ঘেরা চতুর্দিক। একটা নিচু টালির ঘর তুলেছে একদিকে। বোধ করি জায়গাটা পরিষ্কার করবার মতলব হয়েছে—লোকজন থাকবে ঐ ঘরে। উইলো গাছ একটা—ছোট গাছ, বছর পাঁচ-সাত বয়স হবে। ছোট্ট ছোট্ট ডাল-পাতা লম্বা হয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে—বিস্রস্তবেশবাস নারীর মতো। সেই নারী সারা দিন এবং সমস্ত রাত্রি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আলুলিত চুল ছড়িয়ে দিয়ে কাঁদছে। সত্যি বলছি, সর্বদেহ শিরশির করে ওঠে। বুঝেসুজে ওরা জানলায় ভারী পর্দা খাটিয়েছে। ওদিকটা ঢাকা থাকাই উচিত।

কিন্তু আমায় কেমন নেশায় ধরেছে। ঘরে এসেই পর্দা ঠেলে এক নজরে তাকিয়ে থাকি। আর ভাবি। সাড়ে নটা। সত্যি রাত হয়েছে এবার, আলো জ্বলছে ধ্বংসভূমির কিনারা দিয়ে। ঐ দিকটা রাস্তা। দিনমানে গাড়ি-মানুষের সামান্য চলাচল, রাত্রিবেলা এখন একেবারে হা-হা করছে। আলোগুলো নির্জন নিঃশব্দ প্রেতপুরীর পাহারাদার।

ভেবে দেখুন, অহরহ ঐ জায়গাটায় কী কাণ্ড হত হিটলার ছুনিয়াময় যখন তাণ্ডব জুড়েছিল। পাতালের মন্ত্রণাকক্ষে গুপ্ত পরামর্শ, উপরে মানুষজনের ভিড়, কাজকর্মের ছুটোছুটি। অনেক রাত্রে এক-বার উঠে কাল ঐ আলোর সারির দিকে তাকিয়েছিলাম। আলোরা নড়েচড়ে বেড়ায় নাকি? আলোর তলায় ছায়া-ছায়া— যেন প্রেতের মিছিল। অনেক হাজার মানুষ মরেছে ঐ জায়গাটুকুতে, ভাঙা বাড়ির নিচে কবরস্থ হয়ে আছে কতজন। হয়তো বা হিটলারও আছে, এবং তার প্রেমিকা। ভিত খুঁড়ে আবার নতুন অট্টালিকা বানাবার যদি মতলব থাকে, সেইসব মানুষের করোটি-কঙ্কাল হয়তো বেরিয়ে পড়বে।

এই হোটেল এডলনে আছি—সবচেয়ে বড় আর বনেদি হোটেল গোটা জর্মনির মধ্যে। দেশবিদেশের ধনী-বিলাসী জ্ঞানী-গুণীরা এসে উঠতেন। সকল রকম আরামের ব্যবস্থা। আরও এক বড় হোটেল এর পাশেই, প্রায় একই দরের। এখন তার কিছুমাত্র চিহ্ন নেই। এডলনের পিছনের একটা হাতা কোনো রকমে টিকে ছিল, সেই অংশে তালিতুলি দিয়ে নতুন আবার এডলন হোটেল চালু করেছে।

যেখানটায় আদত হোটেল, ইট-কাঠের পাহাড় সরিয়ে ফেলে সে জায়গায় মাঠ এখন। ছুটো-চারটে ফুলের গাছ মাঠের এদিকে সেদিকে। ভাঙাচোরা একটা দিক খাড়া আছে—কেন যে রেখে দিয়েছে জানি নে। উই উঁচু—আকাশ ছোঁয়ার গতিক, ছাত উড়ে গেছে, ছুয়োর-জানলা পুড়ে ছাই, ইট-লোহা অবধি কয়লার মতন কটকটে রং। নড়বড় করছে, জোরে খানিকটা ঝড়-বাতাস এলেই ঝুরঝুর করে ভুঁয়ে পড়বে—এমনিধারা মনে হয়।

দরজা-জানলা আলো আসবাবপত্র এমন কি দরজায় ছিটকিনির কারুকার্য দেখে বোঝা যায় কী বাহার ছিল হোটেলের! চৌকাঠে তিন রকমের বেল ঝি-চাকরদের ডাকবার জন্য। কোনোটাই

[illegible] না। ঘরে ঘরে দেয়ালের সঙ্গে আঁটা কারুকর্মখচিত ঘড়ি। সমস্ত অচল, কলকব্জা বিগড়ে আছে বোমার ঝাঁকুনি খেয়ে। এই ভাঙন-দশাতেও এডলন পূর্ব-বার্লিনের এক সেরা হোটেল। সরকারের পরিচালনা। খাবার ভালো, দামটা বেয়াড়া রকমের চড়া। মানুষজন আসে কম। ভূতুড়ে বাড়ি কিংবা চার্জ বেশি—কোন কারণে ?

ঠিক আমায় নেশায় পেয়েছে। শ্রীমতী আবেরি পানকির বাড়ি নেমন্তন্ন আজ সন্ধ্যাবেলা। সেই যে বোদো উশের বাড়ি হাত ধরে বললেন, *বাঙালি তুমি—ভাত আর মসলার তরকারি নিশ্চয় খুব পছন্দ করো।* নিজ হাতে রান্না করব, যাওয়া কিন্তু চাই। কিন্তু মাঝপথ থেকে মিথ্যে করে বললাম, শরীর বেজুত লাগছে, হোটেলে ফিরি আমি। নেমন্তন্নে যেতে পারলাম না, পানকির কাছে আমার হয়ে ক্ষমা চাইবেন। অলক্ষ্য টানে হিড়হিড় করে নিয়ে এসে বসাল এই জানলার কাছে। রক্তাক্ত আকাশে সূর্য ডুবে গেল, দুটো পাঁচটা করে ক্রমশ আলোয় ভরে গেল এ-বার্লিন ও-বার্লিন।···

সকালবেলা গিয়েছিলাম এক আর্ট-ইস্কুল দেখতে। বেঁটেখাটো টাকওয়ালা কর্তামশায় রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছেন, কখন এসে পৌঁছব আমরা। আনকোরা নতুন বাড়ি, আগেকার বাড়ি ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। কলাচর্চা এখানে উভয় রীতির—ললিত কলা ও ব্যবহারিক কলা।

নতুন নতুন ডিজাইনের বেতের চেয়ার। থিয়েটার-অপেরার সাজ-পোশাক—সম্প্রতি 'কিং লিয়র' পালার সাজ-পোশাক ও সিন-সিনারি বানাচ্ছে। মেয়েদের পোশাকের নতুন নতুন ডিজাইন বেরোয় এখান থেকে। উমা রাও স্ত্রীজাতি, অতএব পোশাক সম্পর্কে কৌতূহল দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে অমনি অপেরার নাচের সখীর মতো একগাদা মেয়ে রকমারি পোশাক পরে বেরুতে লাগল। জন পনেরো হবে,

পোশাকের ঝলমলানি দেখিয়ে আবার তারা নেপথ্যে লুকাল। দিনকে দিন ফ্যাশান পালটায়, মানুষ এক চেহারার জিনিসে খুশি থাকে না। ক্যামেরা রেডিও এবং আসবাবপত্রেরও নতুন ডিজাইন এরা ভেবে-চিন্তে বের করে। হালফিলের একটা রেডিও বের করে বলে, কেমন দেখাচ্ছে বলুন। বাজিয়ে শোনাল। বার্লিন এবং জর্মনির অনেক জায়গায় বসতবাড়ির অভাব ; ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে, এখনো সামলে উঠতে পারে নি। এখান থেকে নানা রকম প্ল্যান এঁকে মডেল বানিয়ে পাঠায়। কম খরচে মজবুত ইমারত। দেখতেও সুন্দর।

নানান রকম স্কেচ করছে ঘরে ঘরে। পোস্টার লেখা হচ্ছে—ছেলেমেয়েরা লিখছে। খানাঘর—দেয়াল-ভরা ফ্রেস্কো ছবি। খাওয়া ভুলে দেয়ালে তাকিয়ে থাকতে হয়। ঘরের আলোগুলোও আলাদা ঢঙের—শহরে হামেশা যে-বস্তু দেখেন তা নয়। নতুন উঠান বানাচ্ছে একদিকে, উঠানে ঘাস বসিয়ে হোস-পাইপে জল দিচ্ছে। তারই মধ্যে হঠাৎ গিয়ে পড়ে ভিজতে ভিজতে পালিয়ে এলাম। আর-এক ঘরে গেছি। প্রবীণ অধ্যাপক, ইনিই সর্বাধ্যক্ষ, গোটা কয়েক ছেলেমেয়ের সঙ্গে কাদার মডেল বানাচ্ছেন। চতুর্দিকে কাদার মূর্তি—মূর্তিরাও যেন ডেকে কথা কইছে আমাদের সঙ্গে। কাজ থামিয়ে অধ্যাপক সম্ভাষণ করলেন। মৃদুভাষী, এমন আস্তে বলছেন যে শোনা যায় না।

—লেখক হয়ে তোমরা যে বড় শিল্পভবনে এলে ?

—লেখাও শিল্প। তা-ই কিনা বলুন।

—কিন্তু খুব কম লেখকই আসেন আমাদের কাছে। আমাদের সম্বন্ধে বোধ হয় অবজ্ঞা আছে।

—ভারতে আসুন একবার। আমাদের পুরনো ভাস্কর্য দেখবেন। হাজার হাজার বছর আগেকার।

অধ্যাপক বললেন, আমি ছবিতে দেখেছি। চোখে দেখবার লোভ হয় সত্যি। কিন্তু সে তো সোজা কথা নয়!···

নয়

শ্রীমতী ভাইসকোফ চায়ে ডেকেছেন বিকালবেলা। বিধবা মাঝবয়সি, পনেরো তলার উপর ফ্লাট নিয়ে আছেন। লড়াইয়ে বিস্তর লোক বাস্তু হারিয়েছে। আকাশ-ছোঁয়া বড় বড় সৌধ বানিয়েছে তাদের বসবাসের জন্য, এখনো বানাচ্ছে। তার একটা। কোন দিকে কত নম্বরের ফ্লাট, ঠিক করা দায়। মৌচাকের উপমা মনে আসে। দোভাষিণী লিজেল ছিল ভাগ্যিস, তার চেষ্টায় বেরুল। রুচিবান বিদগ্ধ মহিলা—বাড়ি কে বলবে, ছোটখাট মিউজিয়াম একটি। স্বামী পিকিনের অ্যাম্বাসিতে ছিলেন—লেখক তিনি। আর স্ত্রীর কাজ ছিল, নানান মহল্লায় ঘুরে ঘুরে শিল্পবস্তু যোগাড় করা। যেটা যে কৌশলে যোগাড় হয়। তা চোখ আছে বটে, বাছা-বাছা জিনিস। সেই সাত সমুদ্রের পার থেকে নিয়ে এসে বার্লিনের পনেরো তলায় তুলেছেন।

নকশাদার বেনারসি শাড়ি ও কাঁচুলি কিনেছেন গেল বছর বার্লিনের একজিবিশন থেকে। কিছু কিছু ভারতীয় জিনিস এসেছিল সেখানে। কিনেছেন বটে, কিন্তু অমনি ভাঁজ করাই থাকে—পরতে জানেন না। বের করে এনে দেখাচ্ছেন : তোমাদের মেয়েরা কেমন করে পরে বলো দিকি? পরলে বেশ সুন্দর দেখায়, কিন্তু কায়দাটা কী?

উমা রাও তাঁর হাত ধরে ও-ঘরে নিয়ে চললেন : আসুন আমি পরিয়ে দেব। ভাইসকোফের চেহারা সুন্দর, প্রতিমার মতো চোখ দুটি—শাড়ি চমৎকার মানিয়েছে। মাথায় অল্প ঘোমটা, যেন এক রূপসী ভারতীয় মহিলা। আনন্দ বলেন, দেখাচ্ছে আপনাকে রানীর মতো।

শ্রীমতী হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বলেন, তা জানেন না বুঝি? সত্যিই আমি রানী হতে যাচ্ছিলাম, ইচ্ছে করলেই হতে পারতাম। এক বুড়ো রাজা প্রেমে পড়ে গেল। এই তো ক-বছর

আগে। কী চোখে দেখল, কিছুতে পাছ ছাড়ে না। ভালোবাসার কথা বলে। কী নাম যেন···রোসো বলছি—। ঠোঁটে আঙুল রেখে শ্রীমতী ভাবতে থাকেন।—ওঃ হো, কপূরতলা—মহারাজা অব কপূরতলা। আহা, বেচারা মারা গেল তার পরেই।

বুড়ো রাজার সম্বন্ধে অনেকেই জানে দেখলাম। শিক্ষিত সংস্কৃতিবান মানুষ। রাজ্য ছাড়তে হল, রাজ্য হারিয়ে এদেশ-সেদেশ ঘুরে বেড়াতেন। প্রেম করা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেল শেষটা।

রাজরাজড়ার কথা চলছে। রাজা খুব কম দেশেই আছে। কিন্তু রাজার সম্বন্ধে সম্ভ্রম আছে বিস্তর লোকের মনে—বিশেষ করে সেকেলে বুড়ো-বুড়ি যাঁরা। অনেক শতাব্দী ধরে মনোভাব গড়ে উঠেছে, দশ-বিশ বছরে সকলে কাটিয়ে উঠতে পারে না। কাইজার কবে উৎখাত হয়ে গেছে, কাইজার উইলহেলমিনের নামে জর্মনির বিস্তর বুড়ো-বুড়ি এখনও গদগদ। দেবতা-গোঁসাইয়ের মতন ভাবে। তবে বেশি দিন আর নয়, ঐ প্রাচীনদের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে এই সম্ভ্রমবোধ। নতুন আমলের ছেলেমেয়েদের কাছে কাইজার নামের খাতির নেই—নতুন তাদের ধ্যান-ধারণা, নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় তারা বড় হচ্ছে।

আমি সায় দিই : ঠিক বটে। আমারও দেখা আছে এমনি বস্তু। কুচবিহারে রাজা নেই—কিন্তু নিজ চোখে দেখেছি, গ্রামের চাষা শহরে তরিতরকারি বেচতে এসে বাঁক নামিয়ে প্রাসাদের দরজার সামনে গড় হয়ে প্রণিপাত করে। রাজা ঈশ্বরের অবতার, রাজ-ভবন অতএব মন্দির-বিশেষ। মস্কোর এক বাড়ি দেখেছি, ছেলে-বউ নিরীশ্বর ঘোরতর কমিউনিস্ট, বুড়ি মা কিন্তু বিপ্লবের এত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও আইকন আঁকড়ে রয়েছেন একটা ঘরে।

শ্রীমতী বললেন, পটসডামে যেও তোমরা অতি অবশ্য। দেখবার মতো। দুর্ধর্ষ কাইজারেরা থাকত। শহর জুড়ে দেখতে পাবে আশ্চর্য শিল্প-রুচির পরিচয়।

এক বুদ্ধমূর্তির সামনে নিয়ে দাঁড় করালেন। চীন থেকে এনেছেন। চিন্তাকুল ভগবান বুদ্ধ। শ্রীমতী বললেন, এ মূর্তি জীবন্ত। তোমার আমার মতো। ক্ষণে ক্ষণে মুখের ভাব বদলায়। সকালের প্রসন্ন আলোয় দেখবে হাসিমাখা মুখ, সন্ধ্যায় আবছা আঁধারে দেখতে পাবে সেই মুখ বিষণ্ণ।

বইয়ে ঠাসা আলমারিগুলো। সকল জাতের বই, একেবারে হালের ছাপা বইও দেখছি। পনেরো তলার ঘরের ভিতরে সবুজ লতা তুলে দিয়েছেন ছাতের উপরের টব থেকে। লতায় লতায় জড়াজড়ি। টেবিলে নানা বর্ণের মোলায়েম লিলি। শ্রীমতী বই লেখেন ভারী এক মজার কায়দায়। লেখেন না, টাইপ করেন। যখন যেমন মনে আসে টাইপ করে যান। সেগুলো কাঁচি দিয়ে এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি এমনি মাপের টুকরো টুকরো করে কাটেন। তারপর আগের লাইনগুলো মাঝে, মাঝেরগুলো শেষে—এমনি ভাবে সাজিয়ে সাদা কাগজের উপর এঁটে আদত লেখা তৈরি হয়ে যায়।

খুব বড় এক মেশিন-ফ্যাক্টরি দেখতে এসেছি। নাম হল : ওয়েব বার্গম্যান-ভোরসিগ (Web Bergman-Borseg)। বার্লিনের আয়তন মোটামুটি পঁয়তাল্লিশ বর্গমাইল। এক প্রান্তে এই ফ্যাক্টরি। লিজেল ও লীবার্গ সঙ্গে করে নিয়ে এল।

ভারী ভারী যন্ত্রপাতি বানায়। বিদ্যুৎ তৈরির যন্ত্র—পাওয়ার-হাউসে যেসব টারবাইন লাগে। স্টিম তৈরির নানাবিধ দানবাকার যন্ত্র। হালফিল আবার ছোটখাট কল বানানো শুরু করেছে। যেমন দাড়ি কামানোর বৈদ্যুতিক খুর। সারা দুনিয়ায় ভারী-শিল্পের যত বড় বড় ফ্যাক্টরি আছে, এটা তার ভিতরে পড়ে।

ঐ যে ভোরসিগ নাম পাচ্ছেন, মস্ত বড় ধনিক তিনি। লড়াইয়ের আগে ফ্যাক্টরি ছিল ধনিক-প্রতিষ্ঠান। হিটলারের সঙ্গে খুব আঁতাত। পুরো দমে অস্ত্র বানিয়ে লড়াইয়ে যোগান দিয়ে গেছে। এখন জাতীয়

প্রতিষ্ঠান। সরকার অর্থাৎ জনসাধারণ মালিক। পুরানো মালিকরা পশ্চিম-জর্মনিতে নতুন কারখানা বানিয়েছেন। সে-ও খুব বড় কারখানা।

বোমা মেরে তছনছ করে দিয়েছিল। তিন ভাগ একেবারে গুঁড়োগুঁড়ো, এক ভাগ টিমটিম করছিল কোনো গতিকে। এখন আবার ষোলো আনা চালু হয়ে গেছে। আগের চেয়ে ঢের ঢের ভালো ব্যবস্থা। কর্মিদলের আরামবিরাম আর সাংস্কৃতিক উপভোগের সকল রকম বন্দোবস্ত—আগে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না।

খোদ ডিরেক্টর মশায় আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন। দু-কথায় গোড়ার ইতিহাস একটু শুনিয়ে দিলেন। উনিশ শতকে ফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠা। জগৎজোড়া নাম, অঢেল মুনাফা। কিন্তু সবই প্রায় চুরমার হয়ে গেল। এই যত ঘরবাড়ি যন্ত্রপাতি দেখতে পাচ্ছেন, ১৯৪৮-এর আগের কোনোটি নয়। নতুন করে গড়তে হল। দশ বছরও পোরে নি, দুনিয়ার এক সেরা ফ্যাক্টরি বলে এর মধ্যেই নামডাক হয়েছে। চার হাজার কর্মী—সবাই এক বাড়ির ছেলে-মেয়ের মতো আছি। এক পাক ঘুরে দেখলে মালুম হবে। ডিরেক্টর নিজে আমি ইঞ্জিনিয়ার বটে, তবু কামারশালায় হাপর টেনে নিজ হাতে কাজ করেছি অনেক-দিন। ফ্যাক্টরির সবরকম কাজ জানি।

বলছেন, তোমাদের ভারত সম্বন্ধে বড় ভালোবাসা আমাদের। ভারত উন্নতির পথে ছুটেছে, আমাদের তাতে ভারী আনন্দ। আমাদের এই রাষ্ট্র নতুন, তোমাদের পরে জন্ম হয়েছে। বিস্তর কষ্টে গড়ে তোলা হচ্ছে হাজার রকম অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভুক্তভোগী আমরা, দেশ-বিভাগের ধাক্কায় নাস্তানাবুদ হচ্ছি তোমাদের মতোই। তাই বুঝতে পারি, কী কঠিন বিপত্তির সঙ্গে ভারতকে লড়তে হচ্ছে। দুনিয়ার উপর আর লড়াই হবে না, সকল মানুষ শান্তি ও আনন্দে থাকবে—এই আমরা চাচ্ছি। ভারতও তাই চায়। এক লক্ষ্য আমাদের। অতএব ভারতের মানুষ তোমরা এখানে

অতিথিমাত্র নও, একেবারে ঘরের লোক। তোমরা এসেছ,—কত যে কাজ হয় এমনি আসা-যাওয়ায়! সামনাসামনি হলেই মানুষে মানুষে তবে ভাব জমে—শুকনো বই-কেতাবে সে জিনিস হয় না। এখানকার কর্মীরা ফ্যাক্টরিকে নিজের জিনিস বলে মনে করে। আসলেও তাই। পরের জন্য খাটে না, খাটছে নিজের কাজে। সত্যি কিনা, ভিতরে গিয়ে বুঝবে। এসো—

ঘুরে ঘুরে দেখছি। প্রশ্নের খই ফুটছে আমাদের মুখে। জবাবও পাচ্ছি। কিন্তু যা প্রলয়ঙ্কর আওয়াজ, কানে ঢোকে না ওদের বারো আনা কথা।

ছুটা খানাঘর। খানাপিনা একরকম সকলের, ইতর বিশেষ নেই। ইঞ্জিনিয়ারদের পোশাক সাদা, ফারাক শুধুমাত্র এই পোশাকের রঙে। পোশাকের ঘর—কর্মীরা বাড়ির কাপড়চোপড় ঐখানে ছেড়ে আসে, কাজকর্মের শেষে সেই কাপড় পরে বাড়ি যায়। কারখানা অষ্টপ্রহর চলছে, তিন ক্ষেপে কাজ হয়। আগে ছিল আট ঘণ্টার খাটনি, মার্চ (১৯৫৭) থেকে এক ঘণ্টা কমিয়ে দিয়েছে। চার হাজার কর্মীর মধ্যে মেয়ে সাড়ে-আট-শ। পরিচালন-ব্যবস্থা যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যেও মেয়ে আছে।

বিশাল সাংস্কৃতিক হল। বোতাম টিপে দিল, ঘরঘর শব্দে চারিদিক থেকে কালো পরদা পড়ে ঘর অন্ধকার করে দিল চক্ষের পলকে। সিনেমা হয় এই হলে, থিয়েটার হয়। কর্মীরা থিয়েটার আর নাচ-গানের দল করেছে। বাইরের থিয়েটারেও যায়, তার জন্য মরসুমি টিকিটের ব্যবস্থা। টিকিটের দামের ভিতর এক মার্ক ইউনিয়ন থেকে দেয়, বাকিটা নিজেদের।

লাইব্রেরি। ঘরে বারান্দায় কর্মীদের ফোটো। যেমন আর সব জায়গায়, গল্প-উপন্যাসই বেশি চলে। কার্ল মার্কসের বই, লেনিনের বইয়ের জর্মন অনুবাদ। ভারতীয় লেখকদের ভিতর কমলা মার্কণ্ডেয়, আব্বাস, ভবানী ভট্টাচার্য ও মুল্‌কুরাজ আনন্দ আছে। ভারতের

নানা ছবি নিয়ে মোটাসোটা এক অ্যালবাম—চেক-সংস্করণ থেকে জর্মন করে নিয়েছে। ডক্টর রুবেনের গ্রন্থ 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' রয়েছে।

ডিরেক্টর বললেন, আমরা কারিগরি উন্নতি করেছি। এই দিক দিয়ে যত রকমে সম্ভব, আমরা তোমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

—আমাদের ছেলেরা যদি এখানে আসে, ভালো করে শেখাবে তো?

—হাতে ধরে শেখাব প্রত্যেকটি জিনিস। ভারতের ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দাও, তাই আমরা চাই।

চীন পোল্যাণ্ড এবং আরও নানা দেশে ফ্যাক্টরির তৈরি জিনিস চালান যায়। প্রশ্ন করলাম, আমাদের দ্বিতীয়-পঞ্চবার্ষিক প্ল্যানে তোমাদের মাল যাচ্ছে না?

—উঁহু, অর্ডার পাই নি এখনো। ব্যাপার-বাণিজ্যের চুক্তি তোমাদের সঙ্গে অল্পদিন মাত্র হয়েছে। দিল্লি-কলকাতা-বোম্বাই অফিস বসেছে। হবে এইবার আরও ঘনিষ্ঠতা। নিশ্চয় হবে।

শুধু বার্লিনে জর্মনির কতটুকু? মফস্বলে যাব, তার যোগাড়-যন্তর হচ্ছে। যা শুনতে পাচ্ছি, এলাহি ব্যাপার। ছুটো বড় কারে ছুটো-ছুটি হবে দেশের ভিতরে। সঙ্গে যাচ্ছে দোভাষিণী লিজেল এবং সংস্কৃতি-দপ্তরের লীবার্গ। তারাই দেখিয়ে বুঝিয়ে বেড়াবে। কোন পথে কোথায় কবে যাচ্ছি, কোন হোটেলে খানাপিনা, কোনখানে রাত্রিবাস—হিসাবপত্র করে ছকে ফেলছে সমস্ত। তারে ও ফোনে হোটেলের বন্দোবস্ত হচ্ছে। টাকাপয়সা লিজেলের কাছে, গিন্নিপনার যাবতীয় দায় তার উপর। কমসে কম হাজার তিনেক মাইল চক্কোর দিয়ে পুরো আটটা দিন পথে পথে ঘুরে আবার বার্লিনে আসব। হাজার শুনে চমকাবেন না—হাজার মাইল পথ ইয়োরোপের

উপর নিতান্তই নস্যি। সকালবেলা এই জায়গায় বসে চা খাচ্ছি, দুপুরের খানা রাঁধছে চার-শ মাইল দূরের অন্য এক হোটেলে। এবং রাতের বিছানা হয়তো আরও শ-চারেক মাইল দূরের এক ঘরে।

খুব বেশি দিন আর থাকছি নে জর্মনিতে। পোল্যাণ্ড যাব, পোল লেখক-সংঘ দাওয়াত পাঠিয়েছেন। দুনিয়ার মধ্যে যে যেখানে থাকি, লেখকমাত্রেই আমরা এক জাতের। কাছাকাছি এসে পড়েছি, অন্তত একটু মুখ শোঁকাশুঁকি করে যাব। আবার শুনতে পাই চেক লেখকদেরও ডাক আসি-আসি করছে। চেক অ্যাম্বাসি আছে বার্লিনে, সেইখানে শুনে এলাম। তাড়াতাড়ি এর ভিতরে জর্মনির যতটা দেখেশুনে নেওয়া যায়।

রেডিওর নতুন স্টুডিও বানিয়েছে, সেটা দেখাতে নিয়ে গেল। আজকালকার গবর্নমেণ্ট চালানোর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল প্রচার। প্রচারের তোড়জোড় ইয়োরোপের সর্বত্র। মস্কো-স্টুডিও, লণ্ডনের বি.বি.সি—দুনিয়ার এমনি সব বড় বড় জায়গায় বাক্যদান করে এসেছি। কিন্তু বার্লিনের মতন সকল সুবিধার এমন বৃহৎ আয়োজন আর দেখি নি। আগেকার যা-কিছু চুরমার হয়েছিল—গোড়া থেকে গড়ে তুলতে হচ্ছে, হালের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আমদানি করা তাই সম্ভব হয়েছে।

—আপনাদেরও বলতে হবে দু-চার কথা। কাল বলবেন। ইংরেজিতে। লিখতে-টিকতে হবে না। আমরা জিজ্ঞাসা করব, তারই জবাব দিয়ে যাবেন। রেকর্ড করে নেব।

এইটে বড় ভালো। বক্তৃতার ঝামেলা নেই, কাগজে এরা কলম ছোঁয়াতে বলে না কখনো। গুণী-জ্ঞানীদের সঙ্গে একত্র খানাপিনা—কখনো হোটেলে, কখনো অ্যাক্টরস-ক্লাবে। খেতে খেতে গল্পগুজব, নানা রকমের আলোচনা। আজ এক দলের সঙ্গে খেলাম, কালকে আবার নতুন আরেক দল। কত জনের সঙ্গে মন-জানাজানি হল

এমনি ভাবে, কত খবর জানলাম। সভার মাঝে দাঁড়িয়ে লাগসই কথা খুঁজে খুঁজে গলদঘর্ম হওয়া—তাতে এ বস্তু মেলে না।

রেডিও-য় বলবার জন্য ডাকতে এল পরদিন সকালে। স্টুডিও অবধি অত দূর নয়, পাড়ারই মধ্যে। পায়ে হেঁটে চলেছি, লীবার্গ সঙ্গে। এডলন হোটেলের লাগোয়া ভাঙাচোরা অট্টালিকার সারি—সরকারি দপ্তরখানা ছিল। তার পরেই প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ, ভন হিণ্ডেনবার্গ যেখানে থাকতেন। বিস্তর কারুকর্ম—এখন বিজীর্ণ পরিত্যক্ত পুরী। আর একটু গিয়ে কাঁটাতারে ঘেরা জঙ্গল, জঙ্গল ফুঁড়ে কংক্রিটের চাঁই উঁচু হয়ে উঠেছে—হিটলারের শেষ আশ্রয়-গৃহ চ্যানসেরি যেখানটা ছিল। চ্যানসেরির সামনাসামনি বড় রাস্তার ঠিক ওপারে চিকন সবুজ ঘাসে-ঢাকা অপরূপ লন। এখন বসন্তকাল—রঙ-বেরঙের মরসুমি ফুল ফুটে মাঠ আলো হয়ে আছে। এই যে লন, এখানেও ঘরবাড়ি ছিল। ডক্টর গোয়েবলসের বাড়ি ও অফিস। প্রচার-দপ্তরের কর্তা গোয়েবলস, হিটলারের ডান হাত। ঐ একটা মানুষের দাপটে দুনিয়ায় ধুন্ধুমার লেগেছিল, রোজ সকালে কাগজ খুলে বিশ বার তার নাম পড়তাম। সেই মানুষকে আজকে পরিচয় দিয়ে বোঝাতে হচ্ছে। গোয়েবলসের শেষ দিনের কথা ভাবুন। বাচ্চা কটিকে কোলে তুলে নাচাল, চুমো খেল, আদর করে চকোলেট দিল হাতে: খাও—খেয়ে ফেলো। মুখের মধ্যে পুরেছে, তখন গোয়েবলস বাইরে গিয়ে দাঁড়াল: কী খবর? খেয়ে ফেলেছে, শেষ হয়ে গেছে তবে? মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করল নিষ্পাপ অবোধ শিশুরাও। নিজ চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তার পরে বিষ খেল গোয়েবলস ও তার স্ত্রী। এইখানে—এই সবুজ লন, যেখানটায় আজ এত রঙের বাহার।

লনের ওদিকে নতুন নতুন বাড়ি—সরকারের নানা দপ্তর। রেডিও-র অফিস এরই একটায়। দোতলার একটা ঘরে নিয়ে তুলল।

যন্ত্রপাতি সহ তৈরি হয়ে আছে। আমাদের কথাবার্তা রেকর্ড করে নেবে। সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে আমাদের উত্তর।

আমায় বলল, তোমাদের পেয়ে খুশি হয়েছি। বড় ভালো তোমরা, কারও ক্ষতি করতে চাও না, মিলেমিশে থাকতে চাও সকলের সঙ্গে। তবু জিজ্ঞাসা করি, কোন বিশেষ বস্তু দেখবার প্রত্যাশা নিয়ে এসেছ আমাদের দেশে ?

আমার জবাব : তোমরা ছিলে দাম্ভিক শক্তিমান জাতি। অনেক শতাব্দীর সামরিক ঐতিহ্য তোমাদের। ইয়োরোপ তো বটেই, গোটা ছুনিয়া বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলে। শাস্তিও হয়েছে তেমনি। এবারে দিব্যজ্ঞান পেয়েছ, শান্তিতে থেকে সামলে নিতে চাও। ভারতেরও ঠিক এই পথ—পঞ্চশীল গ্রহণ করেছি আমরা। সামরিক জাতি চিরকালের রীতি ছেড়ে কেমন করে অহিংস পথে এগুচ্ছে, দেখবার আমার বড় কৌতূহল। আরও এক ব্যাপার, আমার দেশের মতন জর্মন দেশও দু-ভাগ হয়েছে। দুই জর্মনির মধ্যে কেমন সম্পর্ক, সমস্যাগুলোর কী রকম নিষ্পত্তি হচ্ছে, এই সমস্ত জানতে চাই আমি। তোমাদের নিমন্ত্রণ যখন গিয়ে পৌঁছল, তিলেক আমি দ্বিধা করি নি—বোঁচকা ঘাড়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছি।

প্রশ্ন : কেমন দেখছ বলো। কী ভালো লাগল সবচেয়ে বেশি ?

জবাব : এসেছি মোটে দিন সাতেক। এত বড় দেশের কতটুকুই বা দেখেছি ! সেদিন স্প্রী নদীতে বেড়াতে গেলাম, বড় ভালো লাগল। প্রাণে ভরভরতি হাজার হাজার মানুষ ছুটির দিনে জলে জঙ্গলে বেরিয়ে এসেছে। বোমা মেরে ঘরবাড়ি চুরমার করা যায়, কিন্তু এত বড় জাতকে মারা যায় না। তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, নতুন মহিমায় আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছ। আর দেখলাম, কী ভালোবাসা ভারতের উপর ! ভারতীয় বলে একরত্তি বাচ্চার কাছেও আমাদের খাতির।

ডিটজেলের কথা অনেক শুনেছেন। মিষ্টি হাসি সর্বক্ষণ মুখের উপর। কথা বলতে বলতে থেমে যায়, ভুল ইংরেজি বলছে মনে পড়ে হঠাৎ। অতি আস্তে একটা একটা কথা হিসাব করে বলে তখন। লাজুক অপ্রতিভ চাউনি। এ ছেলে যেন সত্যযুগের। দুনিয়ার ময়লা দিকটায় নজর পড়ে নি কোনোদিন।

সেই কথাই হচ্ছিল। ডিটজেল চুপ করে শোনে। হাসি নিভে মুখের উপর বিষণ্ণ ছায়া ঘনিয়ে আসে। বলে, শুনতে চাও ?

না থাক। ভিন্ন কথা তুলি : হাতে তোমার আংটি কিসের গো ? বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেছে ? কনে কোথায় ? কবে কনে দেখাচ্ছ বলো।

ডিটজেল বলে, বিয়ের সময় চিঠি পাঠাব তোমায়।

—সময় থাকতে পাঠিও। উড়ে চলে আসব বিয়ে দেখতে। হনিমুন করবে তোমরা ইণ্ডিয়ায়—কলকাতায়, আমার বাড়িতে। এই আমি নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি।

ঘাড় নাড়ে ডিটজেল : সত্যি কি আর আসছ ! আচ্ছা, দেখা যাবে সেই সময়। বাবা নেই, বাবা থাকলে কী আমোদ করতেন আমার বিয়েয় ! তাঁর কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়।

আবার বলে, বলছিলে না সংসারের ময়লা দিকটা আমি দেখি নি। শোনো তবে—

নাৎসিদের বড় জাঁকজমকের সময়টা। ছোট ছেলে ডিটজেল, ইস্কুলে পড়ে। বাপ ভিন্ন দলের, তাঁকে জেলে নিয়ে পুরেছে। ক্লাস বসবার মুখে বলতে হয়—হেইল হিটলার, হিটলারের জয় হোক। জয়ধ্বনি দিয়ে পড়াশুনো শুরু। ডিটজেল কিছুই বলে না, ঘাড় নিচু করে থাকে। মাস্টারের নজর পড়ে গেল একদিন : তুমি যে বড়

চুপচাপ ? বলো হিটলারের জয় ! ছোট ছেলে সাপের মতন ফোঁস করে উঠল : বাবাকে যে লোক অত কষ্ট দিচ্ছে, তার জয় আমি দেব না। কক্ষনো দেব না আমি।

বটে, জেঁপোমি বড্ড হয়েছে ! সপাসপ চাবুক,—গা কেটে কেটে রক্ত পড়ছে। দাঁতে দাঁত চেপে ছোট ছেলে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। —কক্ষনো না, মরে গেলেও না।

সেই ছেলে ডিটজেল। শান্ত হাসির আড়ালে অত ব্যথা লুকিয়ে আছে, কে জানত ! গভীর কণ্ঠে বলল, বাবা থাকলে আমার বিয়ের দিনে কত খুশি যে হতেন !

থিয়েটারে যাচ্ছি। ভাঙাচোরা বার্লিনে অপেরা-থিয়েটারের ঝকঝকে বাড়ি তড়িঘড়ি তুলে ফেলেছে। ইয়োরোপে দেখা যাচ্ছে অপেরা-থিয়েটারের বড় কদর। শুধু ইয়োরোপ কেন, চীন ও মধ্য-এসিয়ার দেশে দেশেও এই বস্তু। শুধু খেয়েপরে মানুষ বাঁচে না, রসের উপভোগ চাই। ভয় করেছিলেন, সিনেমা এসে থিয়েটারের টুঁটি টিপে মারবে। কোথায় ? রক্ত-মাংসের কাঁচা মানুষের অভিনয় —তার সঙ্গে টক্কর দিয়ে পারে ছবি !

যাচ্ছি থিয়েটারে সকলে মিলে। ডিটজেল নিয়ে যাচ্ছে। স্ফূর্তিটা আজ তার বাড়াবাড়ি রকমের। কানে কানে বলে, কনে দেখতে চাচ্ছিলে, আজকে আসছে সে থিয়েটারে। একসঙ্গে আমরা পালা দেখব।

তাই নাকি ? উঠানে নেমে এসে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি : দাঁড়াও ডিটজেল—এক মিনিট। দৌড়ে ঘরের ভিতর গিয়ে জয়পুরি কাজ-করা একটা কৌটো পকেটে পুরলাম। বই ছাড়াও এসব বস্তু এনেছি দু-দশটা। আনতে হয়—শুধুই এক তরফের আতিথ্য ও আদর-ভালোবাসা ভোগ করব, এমন মতলব ভালো নয়। অতি সামান্য একটা বস্তু হাতে তুলে দিলে কী রকম করতে লাগে, সে যদি দেখতেন !

কনে থিয়েটারের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে। সতৃষ্ণ চোখে পথ চেয়ে আছে। কলেজে পড়ে। নীলোৎপলের মতো চোখের মণি, বড় মিষ্টি মেয়ে। নাম হল ইনগেবোর্গ শ্মিট্ (Ingeborg Schmidt)। শাঁখা-শাড়ি-সিঁদুর পরিয়ে পায়ে আলতা দিয়ে কমলাবালা নাম রাখলে বেমানান হয় না। পালকি থেকে নেমে ঝুমুঝুমু গুজরিপঞ্চম বাজিয়ে মাথায় আধ-ঘোমটা—উঠানে গিয়ে যদি দাঁড়ায়, ঘরবাড়ি আলো হয়ে যাবে।

কৌটো হাতে দিলাম, সিঁদুরকৌটো দিয়ে নতুন বউয়ের যেমন মুখ দেখে।—সুদূর ভারতের অজানা বন্ধু এই অতি সামান্য উপহার দিচ্ছে তোমায়। মেয়েটা জবাবের কথা খুঁজে পায় না, অভিভূতের মতন চেয়ে রইল। বললাম, খুব সুখী হবে তোমরা জীবনে।

ডিটজেলের ভুল ইংরেজি পুলকের আতিশয্যে একেবারে অবোধ্য হয়ে উঠল। বলে, তাই বলছ তুমি? ঠিক তাই হবে, তোমার কথা ফলবে নিশ্চয়।

ভেবেছে কী বলুন তো? প্রাচ্যদেশের মানুষ, ভূত-ভবিষ্যৎ নখ-দর্পণে—ওদের ললাট গণনা করে বলছি, এইটে ধরে নিল বোধ হয়।

মুশকিলে ফেলল। অতিথি আমাদের টিকিট একেবারে পয়লা সারির। ওরা ছুটিতে, নিভৃতে বসার জন্য হোক কিংবা কম পয়সার জন্যেই হোক, বেশ খানিকটা পিছনের টিকিট করেছে। ভালো দেখা যায় না সেখান থেকে, শুনতেও পাওয়া যায় না তেমন। ওদের অসুবিধা নেই—দেখতে এসেছে নিজেদের, এ-ওর মুখে তাকিয়ে থাকবে; শুনবে প্রাণ ভরে নিজেদের ফিসফিসানি কথা। কিন্তু ভদ্রতা করে আমায় ডিটজেল বসিয়ে দিল মেয়েটার পাশে: আলাপ-পরিচয় করুন। এবং নিজে চলে গেল আমার জন্য কেনা সামনের সারির সীটে। আলাপ···তাই তো, কী নিয়ে আলাপ চালানো যায় কলেজের ছাত্রী এই তরুণীর সঙ্গে? কী পড় তুমি, বাড়িতে কে কে আছেন? ইণ্ডিয়ার সম্পর্কে জানা আছে কিছু? বিয়ের পরে চলে যাবে

একবার ইণ্ডিয়ায়, তোমার বরকে বলে দিয়েছি। কলকাতায় গিয়ে আমার কুঁড়েঘরে উঠো। একেবারে লেকের উপরে—ঐখানে হনিমুন হবে। পাঁচ আঙুল দিয়ে ভাত খাই আমরা। ভয় নেই, সমস্ত শিখিয়ে দেব। মজা পেয়ে যাবে তখন, কাঁটা-চামচে ধরতে আর মন যাবে না।

এমনি দু-পাঁচ কথা। দুটো-পাঁচটা কথায় ফুরিয়ে গেল। বুদ্ধিমতী শান্ত স্বভাবের মেয়ে—কথা সামান্যই বলে, হাসে কেবল মিটিমিটি। নাটকের একটা অঙ্ক শেষ হতেই টুক করে নিজের প্রথম সারিতে গিয়ে চেপে বসলাম। ডিটজেল তখন প্রিয়াকে নিয়ে করিডরে ঘুরছিল। হলে ঢুকে বলল, এ কী? ভারি অন্যায় কিন্তু—

—*থিয়েটার দেখাতে নিয়ে এলে। আমি যে কিছুই দেখতে* পাই নে ঐ পিছন থেকে।

থিয়েটারের পরে হোটেল অবধি এল আমাদের সঙ্গে।—খেয়ে যাবে আজ আমাদের এখানে, নয়তো কিছুতে যেতে দেব না।

তাই হল, দুটো টেবিল জুড়ে নিয়ে একসঙ্গে বসলাম সকলে। খাওয়ার পরেও টেবিল ছাড়ি না। গল্প, গল্প। ঘড়ির আওয়াজে চমক লাগে: ওহে ডিটজেল, ওঠো তোমরা, এগারোটা বাজে।

ডিটজেল কানে নেয় না: এগারোটা তো কী হয়েছে? আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ট্রেন রাত দুটো অবধি। বড়জোর আধঘণ্টা লাগবে আমাদের পৌঁছুতে। ওকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি চলে যাব, অন্য কোনো কাজ নেই।

আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে দুটিতে মধুগুঞ্জন করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

খবরের কাগজের অফিস দেখাতে নিয়ে গেল। কাগজের নামের বাংলা করলে দাঁড়াবে 'নতুন জর্মনি' (Neues Deutachland)। বিরাট অট্টালিকা, অগণ্য বিভাগ। সরকারের পরিচালনা। দরজায়

পুলিশ মোতায়েন ; ইচ্ছে হলেই যে হুট করে ঢুকে পড়বেন, সেটা হচ্ছে না। অতি-সাবধানী এরা, অহরহ সন্ত্রস্ত। অকারণ নয়, সেটাও বুঝি। মাথার উপর যেন খাঁড়া ঝোলানো আছে, তিলেকের অসতর্কতায় দেবে ঘ্যাঁচ করে বসিয়ে। দুটো দিনে আমাদের হাঁপ ধরে যায়—আর বারোমাস তিরিশ দিন যাদের ঘরবসত, তাদের দশাটা বিবেচনা করুন। কেবল জর্মনি বলে নয়—ইয়োরোপের আটটা দেশে কিঞ্চিৎ ঘোরাঘুরি করে এলাম—আমার ধারণা, সন্দেহাকুল কমবেশি সকলেই। বেপরোয়া এর মধ্যে সুইজারল্যাণ্ড। ব্যাপার-বাণিজ্য দেদার ছড়িয়ে বসেছে—লড়াইয়ের মধ্যে কোনো দিন মাথা গলাতে যায় না।

যাক গে। বড় টেবিলের চতুর্দিকে চারিয়ে বসেছি। সম্পাদকীয় বিভাগের এক-একটি মানুষ আমাদের ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিয়েছে। চা-কফি কেক-স্যাণ্ডউইচ ফল-পাকড়ের যথাবিধি সদ্‌গতি হচ্ছে। এবং নানান কথাবার্তা, যথাসম্ভব খবরাখবর নিচ্ছি।

—আপনাদের তো সরকারি কাগজ। ব্যক্তিগত মালিকানার কোনো কাগজ আছে ?

—নেই। তবে সমিতি আছে বিস্তর, তারা অনেক কাগজ বের করেছে। খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশন—যাতে জনমত গড়ে ওঠে, সে সব প্রতিষ্ঠানে সরকারি কর্তৃত্ব। আমাদের নীতি এই।

—দুই জর্মনির মিলনের আশা করেন কত দিনের মধ্যে ?

—সেটা শুধু আমাদের উপর নির্ভর করে না। আমাদের প্রোগ্রাম হল বুঝসমঝের মধ্য দিয়ে শান্তির পথে একীকরণ। লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম আমরা অনেক কমিয়ে দিয়েছি। কিন্তু অপর পক্ষ তড়পে বেড়ালে মিলমিশ হওয়া তো মুশকিল। বন্ন্‌ গবর্নমেণ্ট আমাদের স্বীকার করে না, ষোলো আনা কর্তৃত্ব চায় আমাদের উপর। কিন্তু বুঝতে পারি, আমাদের সোস্যালিস্ট গবর্নমেণ্ট ও-তরফের গণ-

মানুষকে প্রভাবিত করছে। লড়াইয়ের কৃত্রিম আবহাওয়া জিইয়ে রেখে ওদেরই বরঞ্চ বেশি দিন টিকে থাকা মুশকিল।

এরই মধ্যে দুঃখ করে বলে, বন্‌-এ তোমাদের রাষ্ট্রদূত আছে। তাদের প্রোপাগাণ্ডা-যন্ত্রের সমস্ত কোলাহল তোমাদের কানে যায়। আমাদের সঙ্গে আধা-সরকারি সম্পর্ক—হালফিল এদেশে-ওদেশে ব্যাপার-বাণিজ্যের কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। এই মাত্র। অথচ তোমাদের নীতি আমাদেরও নীতি; তোমাদের পথ আমাদেরই। গোয়া ইণ্ডিয়ার একটা অংশ, পোর্তুগিজদের কিছুমাত্র দাবিদাওয়া নেই—এই কাগজেই আমরা কতবার লিখেছি। ভারতীয়েরা আমাদের চেয়ে হীন, কোনো সূত্রে কেউ একথা উচ্চারণ করলে আইনের বলে তার শাস্তি হতে পারবে—জান তোমরা এ খবর?

বার্লিন আকাদেমি অব সায়ান্সের একটা হল ও গোটাকয়েক ঘর নিয়ে ভারত-চর্চা বিভাগ। ডক্টর রুবেন হলেন কর্তা। লম্বা-চওড়া দেহ, প্রশস্ত কপাল—সাহেব হলেও অতিরিক্ত সংস্কৃত পড়ার দরুনই বোধ হয় মুখের উপর টুলো-পণ্ডিতের ছাপ পড়েছে। ডক্টরের কোটের উপরে নামাবলী ঝুলিয়ে দিলে বিন্দুমাত্র বেমানান হবে না। ভারতে, এবং কলকাতায় এসে গেছেন বছর দুয়েক আগে—সেই সব গল্প হল। ছাত্র-ছাত্রী সবাই ভারত সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান, ভারতের কথা জানতে বুঝতে চায় ভালো করে। খরচপত্র করে নয়তো ইণ্ডোলজি পড়তে আসবে কেন? আমাদের পেয়ে একেবারে বর্তে গেছে,—আমাদের সঙ্গে বাতচিত করে কিছু দুর্লভ ভারত-রস পান করবে। কাছে এসে বসবার জন্য, দুটো কথা বলবার জন্য ছেলেমেয়েগুলো আকুলি-বিকুলি করছে। বার্লিন শহরের কেন্দ্রে হঠাৎ এক বিচিত্র ভারত-পরিবেশ। দেশে ঘরে ফিরে এসেছি, এমনিধারা মনে হচ্ছে। এক হাসকুটে মেয়ে ডাশা—হিন্দি অতি চমৎকার শিখেছে; ইংরেজিও ভালো বলে। কারিন গ্রুনের (Karin Gruner)—একেবারে

ছেলেমানুষ ; অনেক দূরের গ্রামে বাড়ি, বার্লিনে একা থাকে। চালাক মেয়ে, কথাবার্তা বড় মিষ্টি, কলকাতায় আসতে চায়। —চিঠিপত্র দেবেন কলকাতায় ফিরে গিয়ে, ভুলে যাবেন না। লম্বা চিঠি চাই—কলকাতার অনেক কথা থাকবে তাতে। আর এক মেয়ে—গিসেলা বোরিশ (Gisela Borisch) ; আরও একটি ইভা ট্রিয়লভ (Eva Triallv)। ঠিকানা আর নাম লিখে দিয়েছে আমার খাতায় ভারতীয় লেখকের কাছ থেকে কোনো একদিন দু-ছত্র পাবার আশায়। দেদার সংস্কৃত শিখছে। একালের ভাষাও শিখতে চায়, কিন্তু শুধুমাত্র একটি হিন্দির মাস্টার আছেন—ডাক্তার আনসারি। পাকেচক্রে ভদ্রলোকের এই অবস্থা—ছাত্র পড়াতে হবে কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেন নি। টি-বি হয়েছিল, চিকিৎসার জন্য চেকোস্লোভাকিয়ায় আসেন। ওখানকার হাসপাতালের সুনাম আছে। রোগ সেরে গেল তো কী করা যায়—এক ডাক্তারি কলেজে ঢুকে পড়লেন। পাস করে বেরুলেন ডাক্তার হয়ে। কিন্তু লক্ষ্ণৌর মানুষ, হিন্দি অল্পবিস্তর জানা আছে, য়্যুনিভার্সিটিতে হিন্দি পড়ানোর চাকরি জুটে গেল। প্রাগ থেকে এখন বার্লিনে। দেশে ফিরবেন আরও কিছুকাল কাটিয়ে।

টমাস সিলবেরস্টাইন (Thomas Silberstein) ছেলেটি বাংলা শেখার জন্য পাগল। নিজের চেষ্টায় একটু আধটু শিখেছে। কষ্টে-সৃষ্টে ছাপা বইয়ের দু-চার পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতে পারে। এমন আরও আছে। কাতর হয়ে বলে, বাংলাভাষার লেখক এসেছ তো বাংলা শেখার উপায় কিছু বাতলে দিয়ে যাও। আমার নিজের ভাষা বাংলা, এবং ভালোমানুষ বাঙালি পাঠকদের অতি সহজে ভোলানো যায়, এই দুটি কারণেই বাংলা লিখি—তাই দেখুন আমায় একেবারে শাহানশাহ্ ধরে নিয়েছে। মুখের একটি বাক্য ছাড়লেই বার্লিন শহরে তৎক্ষণাৎ বাংলার চেয়ার-স্থাপনা হয়ে যাবে! হোটেলের ঠিকানা আর ঘরের নম্বর নিয়ে নিল, পরদিন সকালে সেই অতদূর ধাওয়া

করেছে।—বাংলা শেখার কোনো ব্যবস্থা হতে পারে কিনা বলো। আমার একটা বই দিয়ে দিলাম তার হাতে। আর কী করতে পারি —কী আমার ক্ষমতা! দুনিয়ার কত দেশের কত লেখক নিয়ে সোরগোল, হতভাগা আধুনিক বাংলা-লেখকের একটি নাম অবধি কেউ জানে না। দেশে দেশে এই কাণ্ড দেখি। সেই এক বুড়ো টেগোরে—তার পরে একেবারে উৎখাত হয়ে গেছে বাংলার সাহিত্য। হাসবেন না, এমন প্রশ্ন পেয়েছি বিদগ্ধজনের মুখেও। অবাক হয়ে বলেছেন, তোমাদের সাহিত্যের অত বড় ঐতিহ্য নিঃশেষ হয়ে যায় কেমন করে?

মরিয়া হয়ে আমি এক চিঠি পাঠালাম আকাদেমির সেক্রেটারির নামে: ত্রুটিহীন তোমাদের আতিথ্য। কিন্তু এত পাহাড়-সমুদ্র ডিঙিয়ে এসেছি শুধুমাত্র খানাপিনা এবং দু-পাঁচটা ভালো জিনিস দেখে মধুবাক্য উদ্‌গিরণের জন্য নয়। শ্রদ্ধাটা দু-তরফের হলেই মিতালি পাকাপোক্ত হবে। আমরা কী করছি তারও কিছু পরিচয় পাওয়া উচিত। ইংরেজি ছাড়া বুঝবে না—তা ভাগ্যবশে গোটা চারেক গল্পের ইংরেজি তর্জমা সঙ্গে আছে। একটি অত্যন্ত ছোট—সুযোগ দাও, গুণী-সমাজে পড়ব। অথবা রেডিও বা অন্য কোনো খানে। ছ-সাত মিনিটের বেশি লাগবে না।

এ চিঠি আমাদের দলের কেউ জানেন না। ডিটজেলের হাতে দিয়েছি: পৌঁছে দিও ভাই। সুবিধা হল, সেই রাতেই এক মজলিশ কবি স্টেফান হের্‌ম্‌লাইনের (Stefan Hermlin) বাড়ি। রাতের বার্লিন—নির্জন অরণ্য-ভরা শহরের একটা দিক। সেই অরণ্য ভেদ করে ভিন্ন পাড়ায় গিয়ে উঠলাম। এই প্রান্তে কবি-নিলয়।

প্রবীণেরা আছেন, হালফিলের ছোকরা লেখকও অনেকে এসেছেন। পরিচয় এবং দু-দশটা কথাবার্তার পর কবিতা পড়া শুরু হল। ঐটেই আসল ব্যাপার আজকের আসরের। একটা পড়া হয়ে যায়, ইংরেজি তর্জমায় মোটামুটি ভাবটা বুঝিয়ে দেন। অনেক

বেদনা ও রক্তক্ষয়ের পর নতুন জর্মনি জন্ম নিচ্ছে—ইতিহাসের বহমান ধারা উলটোমুখো পাক নিয়েছে। একালের লেখায় তারই প্রতিচ্ছায়া পাই। আমাদের রাও-মশায় গোটা দুয়েক হিন্দি কবিতা পড়লেন—পড়া নয়, একরকম গান গেয়ে শুনানো। একটা লাইন হয়ে যায়, ইংরেজিতে মর্মার্থ বোঝান। প্রচুর তারিফ কুড়োলেন।

অধমের পালা। বোদো উশে প্রস্তাব করলেন, হের বসু গল্প পড়বেন এইবার। আমার সেই চিঠি লেখার ফল। এবং যা আশঙ্কা, আপত্তি উঠল আমাদেরই দলের ভিতর থেকে।—উঁহু, বসু মশায় বাংলাদেশ থেকে আসছেন, টেগোরের কবিতা আবৃত্তি করুন একটা।

আপত্তি টিকল না। রাও নেড়েচেড়ে দেখেছেন আমার গল্পটা, অভয় দিলেন : সময় বেশি লাগবে না, গল্প পড়ায় দোষটা কিসের ?

অতি-ছোট গল্প আছে আমার কতকগুলো, তারই একটা। ইংরেজি হয়ে কাগজে বেরিয়েছিল। সেই কাগজের কপি ছিল সঙ্গে। ভয়ে ভয়ে পড়ছি। নমুনা অপছন্দ হলে এরা ভাববে, গোটা বাংলা-সাহিত্যই বুঝি এমনি যাচ্ছেতাই। পড়া হয়ে গেছে। তখন আমি আরও ঘাবড়ে যাচ্ছি। কী সর্বনাশ, এসব কী বলে! ঠাট্টা—না কি অতিথির খাতির ? ডক্টর আর্নল্ড সুভাইগ—অতি প্রবীণ ঔপন্যাসিক, আকাদেমির চেয়ারম্যান ছিলেন যিনি এককালে—এমন ভাষায় বললেন যে মনে মনে মাথা খুঁড়ছি, ঘরের মেঝে এক্ষুনি দ্বিধা হোক, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। বলছেন, বাংলার গল্প এমন উঁচুদরের!

ইতিমধ্যে সামলে নিয়েছি। আর—তখন ছাড়ব কেন ?—এ আর কী দেখেন, আরও বহুতর আছেন, তাজ্জব কলম তাঁদের। এই যে গল্প—আমারও এটা সর্বোত্তম নয়। হাতের কাছে পেয়েছি—আর আকারে ছোট, সেইজন্য শুনিয়ে দিলাম।

বোদো উশে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করেন : কবিতা হল, গল্প হল—আমরা উপন্যাস লিখি, এইবার তবে উপন্যাস পড়া

হবে আমাদের। বেশি নয়—আমার একটা, আর আনন্দের একটা।

হাসি উঠল। রাত আড়াই প্রহর। মজলিশের ইতি এইবারে। কবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর লাইব্রেরি দেখাচ্ছেন। কোনো একটা বিশেষ ঘর নয়, সারা বাড়ি ছড়ানো বইয়ের আলমারি। একতলায়, দোতলায়, শোবার ঘরে, খাবার ঘরে, বারাণ্ডায়, এমন কি সিঁড়ির চাতালের উপরে। তার মধ্যে গোটা দুই-তিন আলমারি ঠাসা সংস্কৃত বই—জর্মন টীকা-টিপ্পনী। যেহেতু আমরা ভারতীয়, কবি ক্রমাগত আমাদের সেই দিকে টানছেন। 'তাবচ্চ শোভতে—' ইত্যাদি নীতিবাক্য স্মরণ করে আমরা পাকসাট মারছি। কটি মেয়ে ওদিকে আমায় ডাকছেন : *গল্প তো শোনালে—এবার ইংরেজিতে নয়, খাঁটি বাংলায় একটা* কবিতা বলো। টেগোরের কোনো কবিতা। মানে বুঝব না, বুঝতেও চাই নে—আওয়াজটা পাব।

বেশ ভালো লাগছে। বাংলা সাহিত্য একেবারে গোল্লায় যায় নি, এই কটি মানুষ অন্তত কিছু জানলেন। পরের দিন আরও কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। ব্রেকফাস্টের পর সওদায় বেরিয়েছিলাম লিজেলের সঙ্গে। স্টালিন-আলি—পূর্ব-বার্লিনের ইন্দ্রপুরী, দরকারি বেদরকারি হাজার-লক্ষ বস্তুর ব্যাপার-বাণিজ্য যেখানটায়। অধম আদার ব্যাপারি মাত্র, সুচ-সুতা এবং গোটাকয়েক বোতামের প্রয়োজন। জামার বোতাম ছিঁড়েছে। কাল বেরিয়ে যাচ্ছি বার্লিন ছেড়ে, তার আগে মেরামতের প্রয়োজন।

অর্ধেক পথ গিয়ে লিজেল বলে, পাসপোর্ট নিয়ে এসেছ? পাস-পোর্ট ছাড়া জিনিস দেয় না।

—এই রেঃ!

লিজেল অভয় দেয় : ফিরতে হবে না। আমার কার্ডে নিয়ে নেব। সুচ বলেই হবে, ক্যামেরা-ট্যামেরা হলে হত না।

দাম দিয়ে জিনিস পকেটে পুরে বেরিয়ে আসছি, দোকানের একটা মেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ডেকে ফিরাল। ভুল হয়ে গেছে, কার্ড না দেখেই জিনিস দিয়ে দিয়েছে। কার্ড দেখিয়ে যাও।

খদ্দেরের ভিড়ের ভিতর ভুল হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ভাবছি, অষ্টপ্রহর মানুষ অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় সতর্ক হয়ে চলাচল করে, জীবনের রসকষ কিছু যে আর রইল না এদের পোড়া ইয়োরোপে।

আরও কিছু ঘোরাঘুরি করে দোকানপাট দেখে জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে ফিরে এলাম। বেলা হয়েছে। শ্রীমতী চারীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বার্লিনে এসে। স্বামী বম্বের বড় অ্যাডভোকেট। শ্রীমতী, যতদূর বুঝতে পারি, এখানে আছেন সমাজ-সেবার কাজকর্ম নিয়ে। সাধু মহিলা, কথাবার্তায় মন প্রসন্ন হয়, আজ দুপুরে সমাদরে তিনি আমাদের খেতে বলেছেন। ততক্ষণ কী করা যায়—ঘরে ঢুকে খাতা টেনে নিয়েছি দু-চার ছত্র টুকে রাখার মতলবে।

লিজেল টোকা দিল দরজায়: মাপ করো, তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করলাম। কাগজের লোক এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করবে।

খবরের কাগজ নয়, সাহিত্য ইত্যাদির পাঁচমিশেলি কাগজ, হপ্তায় হপ্তায় বেরোয়। নাম হেবোচেনপোস্ট (Wochenpost)। বিস্তর প্রচার, রাজ্যের মধ্যে সকলের সেরা।

বলে, ভালো একটা গল্প পড়েছ কাল। তাই শুনে এলাম।

—পড়েছি একটা বটে। কিন্তু ভুল শুনেছ। ভালো নয়, অতিশয় মন্দ।

ওরা হেসে বলে, তা সে যাই হোক। গল্পটা চাই। জর্মনে তরজমা করে কাগজে ছাপব। সেইজন্যে এসেছি।

অনেকক্ষণ গল্পগুজব হল। ভারতের সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। বলে, ভারতের গল্প এর আগে না পেয়েছি এমন নয়। কিন্তু লেখকরা কেন জানি ভেবে বসেন, সমস্যার গল্পেরই কদর

আমাদের কাছে। তোমার এই ছোট্ট গল্প তো রাখছি, মধ্যবিত্ত জীবনের একেবারে ঘরোয়া কোনো গল্প দিতে পার ?

তা-ও ছিল। 'একদা নিশীথ কালে'র ইংরেজি তরজমা। দুই গল্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম তো জর্মনির মফস্বলে। পরের ব্যাপার শুনুন। ন-দিনের দিন বার্লিনে ফিরলাম হাজার কয়েক মাইল ঘুরে। এসে এক চিঠি—ঐ কাগজ থেকে দিয়েছে। 'একদা নিশীথ কালে'র তরজমা হয়ে গেছে, ছেপে দিচ্ছি। দক্ষিণা পাঁচ-শ মার্ক অমুক ঠিকানা থেকে নিয়ে এসো। ছোট্ট গল্পটা পরে যাবে। দেশে ফিরে গিয়ে অন্য লেখকের লেখা পাঠিও। এবং তোমার নিজেরও। ইত্যাদি।

টাকার দরকার ছিল। জর্মনিতে এসে ক্যামেরা প্রভৃতি দু-পাঁচটা যান্ত্রিক জিনিস নেব না, কেমন করে হয়! বেমক্কা জুটে গেল। ওদের আটচল্লিশ মার্কে নাকি এক-শ টাকা—তবে তো বিস্তর হয়ে গেল একটা গল্পেই।

ঠিক দুপুরে শ্রীমতী চারীর বাড়ি খেতে চলেছি। শোনা গেল, বিয়ের বার্ষিকী। স্বামী দেশে রয়েছেন তো দেশের মানুষজন ডেকে খাইয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীমতী নিরামিষ খান, কিন্তু ভোজে বাছবিচার নেই। গুরুতর আয়োজন—ভারতীয় রান্নায় একটা দিন মুখ বদলানো গেল। এই তল্লাটে যে কটি ভারতীয় পাওয়া যায়, সকলকে ডেকেছেন। এবং নিজের যে কটি বিশেষ বন্ধু ও বান্ধবী।

লক্ষ্ণৌর সেই ডাক্তার আনসারি এসেছেন। সংসার করে বসেছেন, সেটা এই টের পেলাম। বউ হল ডাশা। কাল দেখলাম ডক্টর রুবেনের ইণ্ডোলজির ক্লাসে—তখন ভেবেছি নিরীহ ছাত্রী শুধুমাত্র। চেকোস্লোভাকিয়ার মেয়ে—বড্ড হাসে। একটুকু কথা বলে, আর হেসে ফেলে। দুঃখের কথায় হাসি, ভাবনার কথায় হাসি। হাসি

তার নিশ্বাসের মতো। নিজেই পরিচয় দেয় : জানো না বুঝি—ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, আনসারি আমার স্বামী।

—কদ্দিন হল বিয়ে ?

—পাঁচ মাস। খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বলে, গাঁয়ের মেয়ে—প্রাগ থেকে অনেক দূরে বাড়ি। শহরে থেকে য়্যুনিভার্সিটিতে পড়তাম। ইণ্ডিয়ার সম্বন্ধে জানতে বুঝতে চাই, ঢুকে পড়লাম হিন্দির ক্লাসে। আনসারি মাস্টার—পাঁচ বছর মেডিকেল কলেজে পড়ে পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে, তারপরে মাস্টারি করছে। য়্যুনিভার্সিটি ডেকে চাকরিটা দিয়েছে। হপ্তায় ঘণ্টাকয়েক হিন্দি শেখায়। চেক বলতে পারে আমাদের চেয়েও ভালো। এতদিন ধরে আছে আর খুব চালাক-চতুর, কেন পারবে না বলো ?

খিলখিল করে আবার একচোট হেসে নেয়। বলতে লাগল, হিন্দি শিখতে গেলাম—মরণ হল আমার। তারপরে, বুঝতে পারছ, বিয়ে হয়ে গেল। দেখো, আমার নাম কিন্তু ডাশা নয়। সংক্ষেপ করে সবাই ঐ বলে ডাকে। শোনাচ্ছে জর্মনের মতো। বার্লিন য়্যুনি-ভার্সিটির সঙ্গে দু-বছরের চুক্তি করে এখানে হিন্দি পড়াতে এসেছে, আমিও সুবিধা পেয়ে রুবেনের কাছে শিখছি। তারপরে ইণ্ডিয়ায় চলে যাব। বড্ড গরম দেশ তো ইণ্ডিয়া ?

—বার্লিনে গরম বলে আইঢাই করছ, আমাদের সে গরম ভাবতে পারবে না। বিশেষ করে তোমার শ্বশুরবাড়ি ঐ লক্ষ্ণৌ অঞ্চলটায়।

ডাশা মৃদুকণ্ঠে বলে, সে যাই হোক, যেতেই তো হবে নিজের দেশে। গরমের জন্য ভাবি নে। তোমরা সব রয়েছ, আমিই বা পারব না কেন ? দু-দিনে অভ্যাস হয়ে যাবে। ভাবছি কাজকর্মের কথা। ও যদি কাজ পায়, আর আমিও একটা পাই, তবে আর ভাবনা থাকে না।

ইন্দোনেশিয়ার একটি মেয়ে ঘরকন্নার ব্যাপারে শ্রীমতী চারীর ডানহাত। বসে কখনো কুটনো কোটে, ছুটোছুটি করে কখনো এটা

সেটা নিয়ে। বড় ঘরের মেয়ে—নাকি পুরানো এক রাজপরিবারের। সাজপোশাকে কিন্তু ঠিক উলটো, বংশ-পরিচয়ে লজ্জা পায়। সমস্ত ছেড়েছুড়ে শ্রীমতী চাষীর কাজে ভিড়ে গেছে। আলাপের মুখে আমাদের নিমন্ত্রণ করে: যেও ইন্দোনেশিয়ায়, আমাদের বাড়ি থাকবে। ঠিকানা দিল—জাকার্তার কাছাকাছি একটা জায়গা। লিখেও এনেছিলাম। ভুবনের কত জায়গার মানুষ ঠিকানা দিয়েছে—সেই ভিড়ের ভিতর কোনখানে মেয়েটার নাম-ঠিকানা তলিয়ে গেছে। নামটাও আজ মনে নেই।

এগারো

বার্লিন ছেড়ে বেরুচ্ছি। দেশের ভিতরটা ঘুরে বেড়াব। সকাল-বেলা, তায় রবিবার। ঘুম ভাঙে নি এখনো শহরের। মার্কস-এঙ্গেলস পার্কে রঙ-বেরঙের ফুল মাথা দুলিয়ে এ-ওকে তারিফ করছে বুঝি। নদী পার হয়ে এলাম। গাছপালায় ভরা পথ। সোবিয়েত-সেনাদের নামে বিশাল পার্ক ও মন্নুমেন্ট। সাদা রঙের ট্রাম, পুরানো ঢঙের। তুনিয়ার বিস্তর জায়গা দেখলাম, কলকাতার ট্রামের মতো কোথাও নয়। বড় বড় কারখানার পাশ দিয়ে ছুটেছি, খেলার হুল্লোড় লেগে গেছে এরই মধ্যে। পরিচ্ছন্ন চারিদিক, কুটোগাছটা পড়ে নেই পথের কোনোখানে। সব কারখানার সামনে লাল পশ্চাৎপটের উপর হলদে বা সাদা হরফে লেখা নানা স্লোগান। তরুণী মেয়েটা ঐ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে একা একা। মেঘলা আকাশ। বিশাল কবরখানা অনেকটা জায়গা জুড়ে। পাসপোর্ট-কন্ট্রোল—পাসপোর্ট দেখে চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এক এক সেলাম ঠুকে গাড়ির ও আমাদের ছাড় দিয়ে দিল।

একই এরোড্রোমের তুই ভাগ—একটা সোবিয়েতের, একটা জর্মনির। চুক্তি আছে, সোবিয়েতের প্লেন রাখতে দিতে হবে। ফসলের খেত—আমাদের বিলে কচি ধানবন যেমন দেখতে পাই আষাঢ়ের প্রথমে।

ডাইনে ড্রেসডেনের পথে বাঁকলাম। বন। খাড়া খাড়া গাছ, ঘন সবুজ, চলেছে তো চলেইছে। বনজঙ্গল হামেশাই দেখে থাকেন। যা দেখেন না সেটা হল, এ-বনের তলদেশ সাফসাফাই, একটি আগাছা নেই। ছুটির দিন। মানুষ দলে দলে জুটে রাস্তার ধারে সাইকেল-মোটর ফেলে বনে ঢুকে পড়ছে চড়ুইভাতি ও রকমারি আমোদস্ফূর্তির আয়োজনে। খানাখন্দ পেলেই জলে ঝাঁপাচ্ছে ছেলেমেয়েরা। মনে

হবে, বনের গাছ বুঝি মাপজোখ করে পোঁতা। এবং তলায় ঝাঁটপাট দেবার জন্য মাইনে-করা ঝাড়ুদার আছে।

গাড়িতে বিষম জোর দিয়েছে। ড্রাইভারের পাশের সীটে আমি। এতে দেখবার সুবিধা হয়। চেহারায় এলাকপোশাকে ও ভদ্রতায় ড্রাইভার আমার-আপনার চেয়ে কম যায় না। আপনার কথা সঠিক জানি নে, আমার চেয়ে তো বিস্তর উপরে। জর্মনির অটোবানের কথা শোনেন, এ রাস্তা হল তাই। বিশাল পথ—ঠিক মাঝখান দিয়ে ঘাসে-আঁটা হাত পাঁচেক চওড়া সরু ফালি রাস্তাটা চিরে দিয়ে চলেছে। ডাইনে ধরে চলবার নিয়ম এসব দেশে। ঘাসের ফালির ডাইনে দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, বাঁয়ের পথে ফিরে আসছে। যাওয়া ও আসার ঐ যে পথ, দাগ কেটে তা-ও আবার দু-ভাগ করা। কোনো গাড়ি পিছন থেকে এসে আগে যাবে তো সে-গাড়ি ধরবে দাগের বামদিকের পথ। এগিয়ে উঠে আবার তখন সামনাসামনি চলবে। আড়াআড়ি কোনো রাস্তা ছেদ করে যায় নি। আমরা ছুটেছি দক্ষিণমুখো—মাথার উপর দিয়ে অগণ্য পোল বানিয়েছে পুব-পশ্চিমের রাস্তাগুলোর জন্য। সাঁক-সাঁক করে সেইসব রাস্তার গাড়ি মাথার উপর দিয়ে ছুটে বেরুচ্ছে। উই টানা-রাস্তা চলে গেছে, বাঁকচুর নেই, নির্ভাবনায় জোর দিয়ে যান। স্পীডোমিটারে উঠছে আশি, এক-শ, এক-শ-বিশ, এক-শ-চল্লিশ—(মাইল নয়, কিলোমিটার), দুর্ঘটনার শঙ্কা নেই। চাকায় মাটি ছোঁয় কি না ছোঁয়, যেন উড়ে চলেছি।

শ-তিনেক মাইল ভেঙে ড্রেসডেন পৌঁছলাম। ড্রেসডেন শহর জানেন তো? অন্তত এর চিত্রশালার নাম শুনেছেন। নিদেনপক্ষে চিত্রশালার একখানা ছবি—রাফায়েলের আঁকা ম্যাডোনা? ভুবনে সকলের সেরা পাঁচ-সাতখানা ছবির একটি। শুধু ঐ ছবি চোখে দেখবার জন্য মানুষ দেশ-দেশান্তর থেকে ড্রেসডেনে ছুটত। অমনি আর একখানা হল প্যারির লুভ্‌র্ মিউজিয়মের মোনালিসা। কপাল

ভালো—ঐ দুটো ছবি এবং বাঘা বাঘা শিল্পীর আরও বিস্তর ছবি দেখা হল এবারের যাত্রায়।

ড্রেসডেনের বয়স গেল-বছর সাড়ে-সাত-শ পুরল। ১২০৬ অব্দের এক বিবরণীতে শহরের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই নিয়ে উৎসব হল বিস্তর তোড়জোড় করে। শিল্প ও সংস্কৃতির অপরূপ নিকেতন—বোমায় সমস্ত ভেঙেচুরে পুড়িয়ে তালগোল পাকিয়ে রেখে গেছে। এর মধ্যে কে হাসতে পারে? যোগাড়-যন্ত্র প্রচুর, উৎসব তবু তেমন জমল না।

এল্‌ব নদীর পুলের উপর এসে গাড়ি থামাতে বলি। ওপারে দেখছি চেয়ে চেয়ে। বুকের মধ্যে গুরগুর করে। লড়াই কী বস্তু, কেতাবে পড়েছি; ছবি দেখে মনে একটা ভয়ানক চেহারাও ভাবতে চেয়েছি। কিছু না, কিছু না। এই জায়গায় এসে চক্ষের পলকে উপলব্ধি হল। মহাশ্মশানে ঢুকছি। তবু তো প্রায় তেরো বছর হতে চলল। রূপকথায় শুনেছি রাক্ষসে-খাওয়া পুরী। সে-পুরী কত বড় আর কেমন সুন্দর ছিল, এই জায়গায় এসে চোখে দেখুন। চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে গিয়েছে।

নদীর দু-পার জুড়ে শহর—জলধারা সুপ্রাচীন গির্জা ও প্রাসাদ ওক আর চেস্টনাটের পা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়। থরে থরে পাহাড় উঠেছে একদিকে। দূর থেকে অরণ্য দেখবেন, ভিতরে ঢুকে দেখুন শহর সেখানেও। উঁচু পাহাড়ের চূড়া অবধি শহর চলে গিয়েছে। সর্বোচ্চ এক চূড়ায় কফিখানা। টেবিলে এক পাত্র কফি বা উগ্রতর কোনো পানীয় নিয়ে চতুর্দিক অবলোকন করুন। অধোদেশে শহরে তাকিয়ে মনে হবে, বড় যত্নে অনেকদিন ধরে ভারি দরের শিল্পীরা চিত্র রচনা করেছিল, দানব এসে পড়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে।

শিল্পী তাতে সন্দেহ কী? হাতে রঙের তুলি না-ই থাকুক, দেদার রঙ ছিল তাদের মনের মধ্যে। নয়তো এ-সব বস্তু সম্ভবে না। আজকের জর্মনি কিংবা হিটলারের দিনে অথবা প্রথম মহাযুদ্ধের

আসলে যা দেখছেন, চিরদিন অমনধারা ছিল না। ছোট বড় মাঝারি অনেক রাজা, অনেক রাজ্য—রাজায় রাজায় লড়ালড়ি। যত্রতত্র অগণ্য ক্যাসল বা দুর্গ সেকালের সেই বনেদিয়ানার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সাক্সোনিয়ান রাজাদের রাজধানী এই ড্রেসডেন। পুরানো এক প্রাসাদের দেয়ালে রাজাদের ছবি দেখলাম। বংশানুক্রমে। পাথরের কুচি দেয়ালে বসিয়ে বসিয়ে ছবি করেছে। ছবির নিচে নাম লিখেছে অমনি পাথরের কুচিতে। ভুল হবার জো নেই। ঘোড়ার উপরে রাজারা—ঘোড়ায় চড়ে যেন মিছিল করে চলেছেন একের পিছনে অন্য। ভাগ্যবশে বোমায় নষ্ট হয় নি এই জায়গাটুকু। একটু-আধটু যা হয়েছিল, মেরামত হয়ে গিয়েছে।

ওরই মধ্যে একজন হলেন অগস্টাস। বিশেষণ জুড়ে ফলাও করে নাম বলে—অগস্টাস দ্য স্ট্রং, বলবান অগস্টাস। সতেরো শতকের মানুষ। মরদ সত্যিই—আশপাশের রাজারা তটস্থ হয়ে থাকতেন তাঁর আমলে। পোল্যাণ্ড জয় করেছিলেন—পোল্যাণ্ড এবং স্যাক্সনি উভয় রাজ্যের রাজা। বিক্রম শুধুমাত্র বাইরে নয়, অন্দরেও। তিন-শ সাতাশ জন আইনসম্মত সন্তান তাঁর—এতগুলো তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বাড়তি আরও সব ছিল। রানীরা তো ছিলেনই, তা ছাড়া রাজ্যের নানা অঞ্চলে বিস্তর অনুগৃহীতা। ঘোড়ার গাড়ি চেপে অগস্টাস দর্শন দিতে বেরুতেন। আমাদের সেকেলে কুলীনদের মতো, 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে যেমন পাই। পোড়া একালে সমস্ত বানচাল হয়ে গেল—ওদেশে এদেশে কোথাও সংসারের রসকষ রইল না।

অগস্টাসের পাটরানী কাউণ্টেস কোসেল (Cosel)। ডাকসাইটে রূপসী, বিষম চতুরা। অমাত্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতেন, শেষে ধরা পড়ে গেলেন। রাজা তাঁকে বন্দী করে রাখলেন পাহাড়ের চূড়ার উপর এক ক্যাসল-এ। ক্যাসল স্টোলপিন—ড্রেসডেন থেকে বেশি দূরে নয়। সতেরো বছর রইলেন তিনি আটক হয়ে। তারপরে ছেড়ে

দিল। কিন্তু রানী নিজের ইচ্ছায় রয়ে গেলেন ঐ ক্যাসল-এ। আরও কুড়ি বছর বেঁচে ছিলেন তারপরে। আমরণ রইলেন। ভালোবেসে-ছিলেন জায়গাটাকে।

একটু গল্প করে নিই মাঝখানে, দোষ নেবেন না। আমাদের দোভাষিণী লিজেল গল্পবাজ মেয়ে। বার্লিনে স্বামীর হেফাজতে বাচ্চা রেখে আমাদের সঙ্গে ঘুরছে। ফাঁক পেলেই গল্প জুড়ে দেয়। ভারতের মেয়েদের কথা উঠল। বলে, তোমাদের দেশে তো নতুন আইন হল। নারীর অবাধ মুক্তি। বাপের সম্পত্তির মালিক হচ্ছে। ডাইভোর্স করে বেরিয়েও যেতে পারবে দরকারমতো।

—হলে হবে কী! অগস্টাসের ঐ পাটরানীর মতো। ক্যাসল-এর ফটক খুলে দিল, তবু গেলেন না। সারা জীবন রইলেন স্বেচ্ছাবন্দিনী হয়ে। আমাদের মেয়েদেরও ঐ গতিক। আইন পাস হয়েছে—সংসারে তবু আগে যা ছিলেন, এখনও ঠিক তাই। তোমাদেরই বা কী! মুখে লম্বা লম্বা বচন—ক-জনে বেরিয়ে এসেছে শুনি সংসার থেকে?

লিজেল দেমাক করে, সে বলতে হবে না। কাজ নিয়ে চলে এসেছি এই তো। সংসার যখন দু-জনেরই, কাজের ভাগাভাগি দু-জনের মধ্যে। ঘরকন্না করা বাচ্চা দেখা স্বামীরও দায় বটে। এখন একবার মনেও পড়ে না তাদের কথা।

—বটেই তো! কিন্তু ফোন করছিলে আজকে একটু আগে—

—আমি? ধরা পড়ে প্রগল্‌ভা একটু যেন রাঙা হয়ে উঠল, কাকে কখন ফোন করতে দেখলে আবার?

—বার্লিনে। শুধু আজ কেন, রোজই। জর্মন বুঝি নে, কিন্তু এটা বুঝি স্বামীকে ফোন করে বাচ্চার রোজ খবরাখবর নেওয়া হয়। সব নতুন মা-ই করে অমনি—ধরা পড়ে গেলে লজ্জা পায়। এদেশে, আমার দেশে—সব জায়গায়।

যাক গে। অগস্টাসের কথা হচ্ছিল। দুর্ধর্ষ রাজা। কৃষক প্রজারা

রুখে দাঁড়াল একবার, মেরেধরে ঠাণ্ডা করে দিলেন। একটা গুণে কিন্তু দোষ ঢেকে গিয়েছে। শিল্পরসিক। পুরানো রাজধানী মনের মতো করে সাজালেন, শহরের নামডাক ভুবনময় ছড়াল। ড্রেসডেনের চিত্রশালা ষোলো-আনা তাঁরই সংগ্রহ। ইয়োরোপের সকল জায়গায় তাঁর লোক টহল দিত—যেখানে যে ভালো ছবি পাও, যোগাড় করে নিয়ে এসো। দামের জন্য কথা নেই। এমনি করে বিরাট সংগ্রহ-শালা গড়ে উঠল। শুধু গুনতিতে নয়, গুণে। বাইরে থেকে ম্যাডোনা এবং আর দু-চারখানা ছবির নাম শুনেছেন—চোখে দেখে আসুন, ম্যাডোনার দুনিয়াজোড়া নাম নামজাদা শিল্পীদের কত কত বাহারের ছবি চাপা দিয়ে রেখেছে। প্রতিটি সংগ্রহ অগস্টাস বড় ভালোবাসতেন, রাজবাড়িতে সমস্ত সাজানো ছিল। মরবার পরে আলাদা এই আর্ট-গ্যালারি হল।

লড়াইয়ের সময় ছবি সরিয়ে ফেলেছিল। ভাগ্যিস পেরেছিল সরাতে, নয়তো পুড়ে জ্বলে ছাই হয়ে যেত, আজ তার কোনো চিহ্ন পেতাম না। অনেক দূরে খনি অঞ্চলে পর্বতগুহা। গুহার অন্ধকারে রেখেছিল লুকিয়ে। গ্যালারির বাড়িতে বোমা পড়ল, ভেঙেচুরে নৈরেকার হল। এখনও দেখুন, ভেঙে পড়ে আছে একটা দিক। ক্রেন বসিয়ে বিস্তর লোকজন লাগিয়ে সেটা নতুন করে বানাচ্ছে। বানাতে হবে আগে যেমনটা ছিল অবিকল তেমনি করে। এ-পাশটা মেরামত হয়ে গিয়েছে—সাবেকি কারুকর্ম, এক চুল তফাত ধরতে পারবেন না। মেরামত করে আবার ছবি দিয়ে সাজিয়েছে। ছবি মস্কোয় চলে গিয়েছিল। মাত্র গত বছর ফেরত এলো।

লড়াইয়ে হেরে নাৎসিরা তীরবেগে পালাচ্ছে—পালাবার মুখে যা সুমুখে পায়, নষ্ট করে দিয়ে যাচ্ছে। গুহার গহ্বরে ছবির নাগাল পায় নি, তার আগেই রুশ সৈন্য ঢুকে দখল করে বসল। নয়তো এসবের কী গতি হত, কে জানে! খবর পেল রুশীয়েরা গোপন গুহার। গিয়ে দেখা গেল, স্যাঁতসেঁতে জায়গায় বিস্তর ছবি খারাপ

হয়ে গিয়েছে। মস্কোয় নিয়ে গিয়ে বড় বড় শিল্পী লাগাল ছবির মেরামতের কাজে। খান কয়েক একেবারে গিয়েছে, সংস্কার সম্ভব হয় নি। মস্কোয় ছিল এত দিন। গত বছর চুক্তিপত্রে সই হল রুশ-কর্তাদের সঙ্গে। তারপরে প্লেন বোঝাই করে তারা পাঠিয়ে দিল। গুহার মধ্যে যেভাবে রেখেছিল, তার ফোটো রয়েছে। শিল্পীরা ছবির সংস্কার করছে, তার ফোটো। চুক্তিপত্র এবং প্লেন বোঝাই করে ছবি ফেরত পাঠানো—সমস্ত ফোটোগ্রাফ নিচের তলায় সর্বশেষ ঘরে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখেছে।

একতলা-দোতলায় অনেকগুলো ঘর—তবু কুলায় না, শেষটা গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করে টাঙিয়েছে। বাড়ি মেরামত শেষ হলে ভালো করে সাজাবে। ঢুকবার জন্য দেড় মার্ক দক্ষিণা, ক্যাটালগ নেবেন তো আরও তিন মার্ক। কত মানুষ খাটছে, ছবি ও ঘরবাড়ি পরিমার্জনার কত রকম ব্যবস্থা! গদি-আঁটা আসন এখানে-সেখানে। ম্যাডোনার ঘরে ঢুকে মজা লাগে। একগাদা মেয়েপুরুষ কী রসে মজে আছে—কেউ কারও দিকে তাকিয়ে দেখে না, এতটুকু ফিসফিসানি কোনো মুখে নেই। একদিককার দেয়ালটা জুড়ে বিশাল ম্যাডোনা—অন্যান্য দেয়ালেও ভালো ভালো বড় বড় ছবি: কিন্তু ম্যাডোনা তাদের নিষ্প্রভ করে দিয়েছে। মানুষ দাঁড়িয়ে দেখছে ম্যাডোনা, আসনে বসে দেখছে। এগিয়ে পিছিয়ে ডাইনে ঘুরে কত রকম করে। খুট করে কেউ বা একটা আলো নিভিয়ে আঁধার মতো করে একটুকু দেখে নিল। দেখে দেখে আশ মেটে না।

দুদিন গেলাম আর্ট-গ্যালারি, কিছুই দেখা হল না। চোখ আর ছবির কতটুকু দেখবে, ছবি দেখে মন। দু-দশ দিনে দেখে ফেলার বস্তু নয়। খাতা এগিয়ে দিল চলে আসবার সময়। লিখলাম: তীর্থযাত্রীর মতন এসেছিলাম, মুগ্ধ মন নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু বাইরে শহরের কী চেহারা—ফুলের বাগান আগুনে পোড়াল কোন পাষণ্ডেরা। কথাগুলো বাংলায় লিখলাম, ইংরেজিও করে দিলাম পাশে। নামের

বেলাতেও তাই। কত জায়গায় ঘোরাঘুরি হল, বাংলার সর্বত্র অবহেলা। দায়েবেদায়ে ইংরেজির শরণ না নিয়ে উপায় নেই।

আর্ট-গ্যালারির অন্য দিকে ঘেরা উঠান। বিস্তর ভাস্কর্য। ফোয়ারায় জল ঝরছে। উত্তম বসবার জায়গা উভয় দিকে। জর্মন কথায় জায়গাটাকে বলে স্বভাইঙ্গার—ঘেরা উঠান। আর্ট-গ্যালারি যে অট্টালিকায় তারই উঠান একটা। স্যাক্সনি-রাজ বড় বড় উৎসব করতেন, শত শত নারী নাচ-গান করত উঠান জুড়ে। রাজবাড়ির মেয়ে-বউরা বসত খানিকটা উঁচুতে আড়ালমতো জায়গায়। সামনা-সামনি প্রকাণ্ড ফটক—মুকুটফটক নাম—ফটকের মাথায় ঈগলের মূর্তিওয়ালা মুকুট। পোল্যাণ্ডের রাজমুকুট। স্যাক্সনির মানুষ অগস্টাস পোল্যাণ্ডেরও রাজা হলেন—কাজেকর্মে দেখাতেন উভয় রাজ্যের উপরে তাঁর সমান টান—ইতরবিশেষ নেই। পোল্যাণ্ড হল প্রোটেস্টাণ্ট আর স্যাক্সনি ক্যাথলিক—উভয় ধর্মই মানতেন তিনি। বাড়ির মেয়েরা যেতেন ক্যাথলিক গির্জায়। প্রাসাদের পাশেই গির্জা। পুরনারীরা গির্জায় যাবেন, সেজন্য রাজবাড়ির দোতলা দিয়ে গির্জা অবধি সোজা-সুজি পুল। এ-জায়গায় বোমা পড়ে নি। পুলের নিচে দিয়ে সাধারণ রাস্তা। উপরটা তাই বেড়া দিয়ে ঢেকেঢুকে দিয়েছে—রাজবাড়ির মেয়েরা কি আপনার-আমার চোখের উপর দিয়ে বেরুবেন ? মরবার সময় অগস্টাস বলে গেলেন, দেহ কেটে হৃৎপিণ্ড বের করে সেইটে কবর দেবে ড্রেসডেনের ক্যাথলিক গির্জায়। বাকি অংশ পোল্যাণ্ডে। তাই হয়েছে।

স্বভাইঙ্গারেও বোমা পড়েছিল। একটা দিক একেবারে চুরমার। পাথরের আশ্চর্য শিল্পমূর্তিগুলো ভেঙেচুরে গাদা হয়ে আছে এখনও। বাড়ির যতটা মেরামত হয়েছে, দেখতে পাচ্ছি, আগের সঙ্গে বেমালুম মিলিয়ে করেছে। কালের প্রকোপে পুরানো অংশ কালো হয়ে আছে, নতুন যা গড়েছে সেটা কিঞ্চিৎ হরিদ্রাভ। এই যা একটু তফাত। ভাঙা মূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে শিল্পী বাটালির ঘায়ে ঘায়ে

নতুন মূর্তি গড়ে তুলছে, যেমনটা ছিল ঠিক তেমনিভাবে বসিয়ে দেবে।

উপরতলায় একটুকু মিউজিয়ম। রকমারি ঘড়ি আর জ্যোতিষিক জিনিসপত্র সেখানে। ওটা বাদ পড়ে গিয়েছিল। ড্রেসডেন ছেড়ে যাচ্ছি, লিজেল সেই সময় মোটর বেঁধে টিকিট কিনে দেখিয়ে দিল। রাজরাজড়ার কাণ্ড আলাদা। ঘড়িঘরে ঘড়িই বা কত রকম! বালু-ঘড়ি—ঝুরঝুর করে বালি ঝরে সময় বলে দেয়। সূর্য-ঘড়ি—১৬৫২ অব্দে নিখুঁত মাপজোপে বানানো, রোদে রেখে এখনও সঠিক সময় পাওয়া যায়। ষোলো শতকের পিতলের তৈরি এক-মানুষ-সমান ঘড়ি। বানর বসে আছে এক ঘড়িতে, সেকেণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে চোখ পিটপিট করছে, ঘণ্টা পুরে গেলে টং টং করে ঘড়ি বাজায়। ১৫৮০ অব্দের এক ঘড়ি—মানুষ-কুকুর-খরগোশ-ছাগল মেরি-গো-রাউণ্ড চেপে ঘুরছে। ১৬৬০ অব্দের ঘড়ি—ঘণ্টা বাজবার মুখে সুবেশা পুতুল-মেয়েগুলো দিব্যি একপাক নেচে নেয়। ঘণ্টা পুরলে এক ঘড়িতে অনেকক্ষণ ধরে মিষ্টি বাজনা বাজে। এক ঘড়ির সঙ্গে সৈন্যদল—সেকেণ্ডের টকটক আওয়াজের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলে মার্চ করে; মিনিট পুরলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে উলটো দিকে মার্চ করে আবার। তারপরে ঐ দিকে; পুনশ্চ এদিকে। জাহাজ চলছে দুলে দুলে একটা ঘড়িতে। জ্যোতির্বিদ্যার ঘড়ি—গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ঘড়িতে পাওয়া যায়। নানারকমের কম্পাস। এক ঘরে সারি সারি গ্লোব। ১৬৮৮ অব্দের অতিকায় গ্লোব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছি। কলকাতা নেই, থাকা সম্ভবও নয়। বারাণসী বড় বড় করে দিয়েছে। আগ্রা শহর ভুল করে দিয়েছে গঙ্গার উপর। ১৬৫২ অব্দের ছাপা বই।

ম্যাক্স জিমারিং ওখানকার লেখক সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি। সন্ধ্যার পর তাঁর কাছে চলেছি। পাহাড়ের অলিগলি ঘুরে উঠতে

উঠতে একটা বাঁকে হঠাৎ বাড়ি পেয়ে যাই। দিব্যি আছেন। বয়সে ভারিকি, কিন্তু কর্তা-গিন্নি উভয়েই স্ফূর্তিবাজ। কনকনে হিমের মধ্যে ছুটে এসে উপরে নিয়ে তুললেন। লাইব্রেরিতে বসেছি, টেবিল-ভরা ভূরি আয়োজন।

মেডের হাত ধরে বাচ্চা এসে ঢুকল। তাকে নিয়ে লোফালুফি। কালো মানুষ দেখে ডরাবে কি—আমাদেরই একজন হয়ে মাঝখানে জাঁকিয়ে বসেছে। মেড ডাকাডাকি করে—মা-বাপ বলছেন, লক্ষ্মী ছেলে, শুয়ে পড়ো গে এবার। সে নড়বে না। দেশে থাকতে বর্ণবিদ্বেষ বলে একটা কথা শুনেছিলাম—এত ঘোরাঘুরি করেও ঐ বস্তুটা চোখে দেখলাম না। কোনো জায়গা কোনো সম্প্রদায় কোনো বয়সের মধ্যে নয়। বরঞ্চ উলটো। কালো বলেই খাতির যেন বেশি। ভাব করবার জন্য লোকে উসখুস করে। কালোর সেরা কালো আফ্রিকার ভায়াদের যা খাতির—হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরতাম: অঙ্গের উপর আর কয়েকটা পোঁচ দিতে তোমার এমন কি বেশি মেহনত হত ঈশ্বর ?

গিন্নি ইতিমধ্যে গোটা তিনেক দপদপে আলো নিয়ে এসেছেন টানতে টানতে। সিনেমার স্টুডিওয় যেমন সব দেখেন। আলো জ্বেলেই হল না—ওদিকে সরে বসুন, এদিকে মুখ ফেরান, উঁহু আর একটু···। মোভি-ক্যামেরা উদ্যত, ছবি তুলে নেবেন সকলের। ঐ বাচ্চা সুদ্ধ। বলছেন, হাসুন দেখি। আহা, মুখ বুঁজে কেন ? খান। কথাবার্তা বলুন।

অতএব হাস্য-ভোজন এবং কথাবার্তা একমুখে সমস্ত করতে হচ্ছে। জিমারিংকে জিজ্ঞাসা করি, লড়াইয়ের সময়টা আপনি কোথায় ? বোমায় ছারখার হয়ে গেল, আপনি ছিলেন তখন শহরে ?

বোমা ফেলল, লড়াই তখন শেষ হয়েছে একরকম। সবাই জানে, হিটলার হেরে গেছে। রুশ-সৈন্য ঢুকে পড়েছে জর্মনির পুব অঞ্চলে। নাৎসিরা পালাচ্ছে। বোমা আগে পড়ে নি ; সেই প্রথম। আর সেই

শেষ। ড্রেসডেন মিলিটারি-ঘাঁটি নয়, শিল্প-সঙ্গীত-সংস্কৃতির জায়গা—অকারণ বোমা ফেলতে যাবে কেন? শুধুমাত্র সেই একদিন—

মোভির খরখর আওয়াজ বন্ধ। জোরালো আলোগুলো নিভেছে, দেয়ালের ম্লান আলোটা শুধু। বাচ্চাকে নিয়ে মেড চলে গেল। গম্ভীর কণ্ঠস্বর—এক-একটা বুলেটের মতো শব্দ বেরিয়ে আসছে জিমারিঙের কণ্ঠ থেকে। শ্রোতা আমরা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছি।

অনেক দিন নয়, শুধু সেই একদিন। পঁয়তাল্লিশ সনের তেরোই ফেব্রুয়ারি। সন্ধ্যা থেকে রাত একটা-দেড়টা। তার মধ্যে সমস্ত শেষ।

গিন্নি ভিতরে চলে গেলেন ক্যামেরা রাখতে। আর আসেন না। থেমে থেমে জিমারিং কথা বলছেন।

তেরোই ফেব্রুয়ারি। কোনোদিন ভুলবার নয়। সন্ধ্যার পর ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান—আকাশ ছেয়ে গেল। পুব অঞ্চলের উদ্বাস্তুরা এসে পড়েছে। গোয়েবলসের প্রচার শুনে শুনে রুশদের ভেবেছে বাঘ-সিংহেরই রকম ফের। ঘরবাড়ি ফেলে পাগল হয়ে পালিয়েছে। দশ হাজার এসে পড়েছে এই শহরে। বোমার বৃষ্টি। অবিরত চলেছে। বাছবিচার নেই। সেদিন সন্ধ্যার আগে কেউ ভাবে নি, এত বড় সর্বনাশ হবে রাত্রিটুকুর মধ্যে। বনেদি পাড়াগুলোর চিহ্নমাত্র রইল না। দাউদাউ করে জ্বলছে। বারো বছর পরে আজও দেখো ধ্বংসের পাহাড়। অর্ধরাত্রের মধ্যে সরকারি হিসাব মতে লোক মরেছিল পঁয়ত্রিশ হাজার। বেসরকারি মতে তার ডবল। দশ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে দশটি প্রাণীও বাঁচে নি···।

বারো

জিমারিঙের বাড়ি থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম। আর সকলে রইলেন, ওঁদের এখন চলবে। সকাল সকাল মানে বারোটা। ওয়াল্ড-পার্ক হোটেলে আছি—অনেকটা দূর। গিয়ে লিখব। না লিখে রাখলে কথাগুলো হয়তো মনে থাকবে, কিন্তু জিমারিঙের জল-জলে ঐ চোখের ভাষা পাব কোথায়? ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নেমেছে। পথ জনহীন—শহর জায়গা কে বলবে? গাড়ির ড্রাইভার, আর পিছনের বিশাল সীটের প্রান্তদেশে আমি। দু-জন এই আমরা। জায়গা জানি নে, মানুষজন চেনা নেই—কী অকুণ্ঠ নির্ভরতায় চলেছি তবু! লড়াইয়ের সময় এই জর্মনদের আতঙ্কে ব্যাকুল ছিলাম। এই তো কটা বছর আগের কথা। আজকে কাছাকাছি দেখছি, সেই তারা কত ভালো, কেমন কোমল স্বভাবের!

চূর্ণবিচূর্ণ অট্টালিকা—দুটো-দশটা কিংবা এক-শ-দু-শ নয়, লাইন-বন্দি চলেছে। দেড়খানা দেয়ালের উপর লোহার কড়ি ঝুলছে কোথাও; কোনোখানে শুধুমাত্র ইটের পাহাড়। জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে দেখতে দেখতে যাচ্ছি। গাড়ি ছুটেছে—ঝুপঝুপ বৃষ্টিতে আওয়াজটা আর্তনাদের মতো। রাস্তার আলো এই একটা, উই একটা—প্রেতপুরীর চৌকিদারগুলো জলে ভিজে ভিজে পাহারা দিচ্ছে। গা ছমছম করে—এই তো, বারো বছর মাত্র। তাদেরই আত্মীয়বন্ধু কতজন বেঁচে রয়েছেন, এই শহরেই আছেন ম্যাক্স জিমা-রিঙের মতো। এক রাত্রে ঘণ্টা ছয়-সাতের মধ্যে সত্তর হাজারের প্রাণ গেল। এই কম সময়ের ভিতরে তো সত্তর হাজার পিঁপড়েও মারা যায় না। তা হলে বুঝুন, মানুষ কত সব কায়দা বের করেছে ভুবনের ভার কমাতে। আরও করবে। লড়াইয়ের সৈন্য নয় সেই সত্তর হাজার—নিরীহ গৃহস্থ মানুষ। গুণী-জ্ঞানী শিল্পী কতজন—

তাঁদের মধ্যে বঙ্গবাসী একটি। আমি তাঁকে জানতাম ছাত্রজীবনে। অম্বিকা মজুমদার। বড় গায়ক—"মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিল পায়" উদাত্ত গলার গান এখনও যেন কানে শুনি। দক্ষিণ-কলকাতায় থাকতেন। আপনারাও চিনতেন অনেকে, এখন হয়তো মনে পড়ছে না। সঙ্গীতে ডক্টরেট পান। ড্রেসডেনে ছিলেন, লড়াইয়ের দরুন আটকা পড়েছিলেন। গায়কের কণ্ঠ চিরকালের জন্য নীরব হল ঐ সত্তর হাজারের সঙ্গে।

গাড়ি বাঁক নিল। এ-জায়গায় আরও এসেছি। ডাইনে নারী-গির্জার অবশেষ—এই গির্জা মেরিমাতার নামে উৎসৃষ্ট। কত নাম-ডাক ছিল, চোখ তুলে তাকাতে এখন ভয় করে। পুরানো কীর্তিগুলো ঠিক আগের মতন করে আবার গড়বে, কেবল এই গির্জাটি নয়। এতে হাত ছোঁয়াবে না কখনও। যেমন আছে তেমনি দশায় রেখে দেবে। অভিমান? এত নামের পুণ্যস্থান—লড়াইয়ে তার কী দুর্গতি, দেখো সকলে। লড়াই জিনিসটা কী সাংঘাতিক, তার আন্দাজ নাও। ভাঙা গির্জা চিরকালের মানুষ দেখবে।

নারী-গির্জার প্রায় উলটো দিকে প্রাচীন এক প্রাসাদ। অর্ধেক ভেঙে আছে—বড় বড় থামগুলোয় কাঠ বেঁধে ঘিরে রেখেছে, মানুষ-জন বিপজ্জনক জায়গায় ঢুকে না পড়ে। গাড়ি সেইখানটা এসেছে—হঠাৎ দেখি, প্রাচীন অলিন্দে ভাঙা খিলানের নিচে একজোড়া তরুণ-তরুণী। ছড়ছড় করে অঝোর ধারায় জল ঝরছে, দুর্যোগে আশ্রয় নিয়েছে। নিশিরাত্রি, ভয়াল মৃত্যুপুরী, আকাশের বিদ্যুৎ-চমক আর অবিরল বৃষ্টি—তারা সংবিৎ হারিয়ে আছে। দুটি মাথা এক জায়গায়। আমার গাড়ি সগর্জনে পাশ দিয়ে বেরুল, মুখ তুলে তাকাল না এক নজর।

পিলনিজ বাদ দিয়ে ড্রেসডেন দেখা কখনো মঞ্জুর হবে না আপনাদের কাছে। শহরের কাছাকাছি বাগানবাড়ি—স্যাক্সনির রাজাদের কীর্তি। ড্রেসডেন-গ্যালারির ছবি দেখলেন, পিলনিজে গিয়ে বাদবাকি দেখুন। বোমার ভয়ে ছবি সরিয়ে ফেলেছিল, এখনও সব আনা হয় নি।

সকালবেলা অতএব স্টিমার ধরতে এলব-এর ঘাটে এসেছি। বিষম কুয়াশা, কনকনে জোলো হাওয়া বইছে। টিকিট কেটে কখন আসে কখন আসে করছি। আসছে হামবার্গের দিক থেকে, যাবে চেক সীমান্ত অবধি। একটা ঘাট বাদ দিয়ে পরের ঘাটে আমরা নেমে যাব।

হেনকালে জিমারিং এসে পড়লেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন—স্থানীয় ব্যক্তি, ভালো করে দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন। অনেকগুলো পুল গাঙের এপার-ওপার জুড়ে দিয়েছে। আঙুল তুলে জিমারিং বলেন, সমস্ত পুল নিশ্চিহ্ন করেছিল, ভেঙেচুরে ঐ একটা মাত্র ছিল। বোধ-করি তাদেরই পারাপারের প্রয়োজনে। শহরের মানুষের অনেক দিন ঐ এক পুল ছাড়া গতি ছিল না। কিংবা নৌকো। আর যত পুল দেখ, সমস্ত নতুন করে বানানো।

নদী বাঁক নিয়েছে এইখানে, অনেকটা ফাঁকা জায়গা। চর এটা। জিমারিং দেখাচ্ছেন। তেরোই ফেব্রুয়ারির রাতদুপুরে দাউদাউ করে শহর জ্বলছে। সে তাপে কেউ টিঁকতে পারে না। বোমার মারে যারা মরে নি, তারা সব ছুটে এল ফাঁকায়। ওখানে ঐ চরের উপর আশ্রয় নিল। শুনবে তারপর? শকুনের মতো প্লেনগুলো ভুঁইয়ের দিকে ছোঁ মারে, মানুষ দেখে দেখে মেশিন-গান করে উপরে উঠে যায়। এলব-এর চরে মড়ার গাদা, রক্ত গড়িয়ে গাঙের জল রাঙা হয়ে গেল। ঐ জায়গায়—যেখানটায় ডেইজি ফুল ফুটে তারার মতন আলো করে আছে।

ছোট বয়সে কপোতাক্ষীতে স্টিমারে যেতে যেমন দেখেছি, তেমনি। গাছপালা চেনা নয়, ঘরবাড়ির চেহারাও আলাদা—তবু সেই ঘন সবুজ চতুর্দিকে, সবুজ পাতালতায় রঙবেরঙের ফুল। ঝিলি-মিলি নদীস্রোত, কপোতের চোখের মতো স্বচ্ছ জল। অনেক সমুদ্র পার হয়ে এসে আমার ছোট্ট বেলার নদী ফিরে পেলাম।

পিলনিজের ঘাট বলে দিতে হয় না। রাজবাড়ি দেখেই মালুম। অবাক কাণ্ড—চীনা ধরনের বাড়ি, পিকিনে অবিকল যে বস্তু দেখে এসেছি। রাজরাজড়ার খেয়াল, পয়সার কিছু কমতি নেই—হুকুম হল, স্যাক্সনি-ভূমিতে চীনা-বাড়ি বানাতে হবে। চীন থেকে স্থপতি এল। একেবারে গাঙের উপরে—জলের ধাক্কা লাগে বাইরের উঠানের প্রান্তসীমায়। বোমা পড়ে নি, বাড়ি নিখুঁত রয়ে গিয়েছে। রাজা এসে থাকতেন অবরে-সবরে। ইংলণ্ডের রানী যেমন উইণ্ডসরে গিয়ে থাকেন।

জায়গা বেছেছে খাসা। নদীপারে ছোট ছোট পাহাড় আর বন। এদের বন দেখে বিশ্বাস নেই—বাঘ-হরিণ নয়, খুব সম্ভব নরবসতি ঐ বনেও। এ-পারেও বিস্তীর্ণ বাগান। বড় বড় ওকগাছ—বিশাল প্রাচীন বনস্পতিরা। কাঠের টবের মধ্যে চীনা গাছপালা—বয়সে দু-তিন-শর নিচে কেউ নন। চেস্টনাট গাছ অজস্র—সাদা সাদা ফুলে পাতা দেখবার জো নেই। আঁকাবাঁকা ঝিল—হাঁস ভাসছে ঝাঁক বেঁধে, ডাঙায় উঠে গাছের তলে পাখনার জল ঝাড়ছে। ঝরনার জল আসছে কলকল করে দূরের বনান্তরাল থেকে, নালা বেয়ে ছায়ায় ছায়ায় বড় গাঙে গিয়ে পড়ছে। বেগুনি লাইলাক ফুল। লিলি ফুল। ক্যামেলিয়া ফুল—লোহার ফ্রেমের উপর ছাউনি করে ঢেকে-ঢুকে রাখে, শীতের অন্তে ছাউনি খুলে দেয়। ফুলগাছ ও লতাপাতায় রীতিমতো দেয়াল বানিয়েছে। দেয়াল-ঘেরা কুঞ্জবন চলল তো চললই। রাজার ঘরের বউমেয়েরা মনের সুখে ঘুরে বেড়াত। নতুন কালের ছেলেমেয়েরা এখনও এসে আড়ালে-আবডালে মধুগুঞ্জন করে।

রাজহংসের মতো ধবধবে সাদা বার্জ—এল্‌ব-এর উপর জলবিহারে বেরুতেন রাজা। আধানারী-আধামকর শিঙা বাজাচ্ছে বার্জের গলুইয়ে। পিছন দিকে রাজার কামরা, কামরার উপর মুকুটচিহ্ন। বার্জ এখন ডাঙার উপরে পাকাপাকি রকম তুলে রেখেছে। কত লোক খাটছে বাগানবাড়ির কাজে। কাচের গরম ঘরে রকমারি গাছ-পালা বানাচ্ছে। দূরের লোক কাছের লোক দলে দলে বাগানে এসে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়ায়। বর্ণনা দিয়ে কী বোঝাব, চোখে না দেখলে হবে না। পথ কুল্যে ছ-হাজার মাইলও নয়, আসুন না দেখে।

ঘুরে ঘুরে শেষটা আর বেরুবার পথ পাই নে। ফেরা হবে মোটরে, নদীপথে নয়। ডাঙার দিকে যে দরজা, সেইটে খুঁজছি। একটা পথ ধরে অনেক দূর গিয়ে—দেয়াল। অন্য পথেও তাই। বাচ্চা ছেলে কয়েকটা এক-পায়ে নেচে নেচে খেলছে। বোবা লোক তো আমরা—কথায় বোঝাতে পারি নে, হাতমুখের ভঙ্গি করি। চালাক ছেলেপুলে—এতেই বুঝে ফেলে। সঙ্গে করে নিয়ে দরজা দেখিয়ে দিল।

তেমাথা পথে এসে দাঁড়ালাম। জর্মনির গ্রাম। এই জায়গাতেই আমাদের মোটর দুখানা আসবে, এসে এখনও পৌঁছয় নি। গাছতলায় ছোট্ট এক ঘরে দোকান। এইচ. ও. (পুরো কথা—Handels Organisation) সাইনবোর্ডে রয়েছে ; অস্বার্থ সরকারি দোকান। কাজ নেই তো দোকানে ঢুকে দরদাম দেখা যাক। মার্কের ভারে পকেট ঝুলে পড়েছে—হালকা করা যাক খানিকটা।

সাবান কিনছি, ছবি কিনছি, কিছু খাম—বাঃ রে, চকোলেট রয়েছে, তবে আর কেনবার ভাবনাটা কী ? চকোলেটেরও জায়গা ড্রেসডেন। দোকানের মেয়ে দুটোকে দু-টুকরো দিয়ে দুই-দুনো-চার পাটি দাঁতে হাসি বার করা গেল। পথের উপর বিদেশি দেখে পাড়ার পলিতকেশ কয়েকজন আগুয়ান হয়েছেন, তাঁদের দিলাম। মাছের ভ্যান এসে রাস্তার পাশে দাঁড়ায় ; মানুষজন হুড়মুড়িয়ে এসে

গাড়ির ঘুলঘুলির সামনে লাইন দিল। যার যে-পরিমাণ দরকার, ওজন-কলে মেপে রঙিন কাগজে প্যাক করে দিয়ে পয়সা নিচ্ছে। খানিকটা চেয়ে চেয়ে দেখে কিউয়ের কাছে এগিয়ে চকোলেট ছাড়লাম কয়েকটা। এতক্ষণের শৃঙ্খলায় ফাটল ধরে গেল—চকোলেট চুষছে, মাছওয়ালা প্রশ্ন করে জবাব পায় না। বিরক্ত পিছনের মানুষ কিউ ভেঙে আগে গিয়ে উঠছে। গ্রাম হলেও ইলেকট্রিসিটি সর্বত্র—মই নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে মিস্ত্রি ছুটছে, কোনখানে লাইন বিগড়েছে নিশ্চয়। চকোলেট এক টুকরা দিলাম এগিয়ে। মই ফেলে মিস্ত্রি মশায় কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালেন—আলাপনের বাঞ্ছা, কিন্তু নিরুপায় উভয় পক্ষই। কোন বাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল কয়েকটি বাচ্চা—ট্রাইসাইকেলে চেপেছে একটি, অন্যগুলো সাইকেল ঠেলছে আর হুল্লোড় করছে। চকোলেটের প্রয়োগ হল। তখন বিষম বিপদ—সাইকেল চড়াবে। না চড়িয়ে শুনবেই না। আরে বাপু, বসি কোনখানে? আর এই দেহভারে রড কখানা দুমড়ে তালগোল পাকিয়ে যাবে, সেটা ভাবো একবার। চকোলেটের দেখছি অমোঘ শক্তি। আমার তো মনে হয়, ডালেস আর ক্রুশ্চেভকে দু-প্যাকেট ড্রেসডেন-চকোলেট যদি পাঠানো হয়, চকোলেট মুখে পুরে সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একমত হয়ে যাবেন। অবশেষে গাড়ি দেখা দিল আমাদের। ড্রাইভারদেরও দিলাম। এক-শ-বিশ তো সাধারণ স্পীড এঁদের—হাসির বহরে মনে হচ্ছে এবারে মোটর প্লেনের মতো ওড়াবেন, চাকা ভুঁয়ে ঠেকবে না।

ঠিক তাই। আধঘণ্টার মধ্যে শহরে এসে পড়লাম। ভিন্ন এক পাড়া। বড় বড় ফ্ল্যাট-বাড়ি উঠে গেছে। ঐতিহাসিক বাড়িগুলো ধীরেসুস্থে হতে পারবে—নিরাশ্রয়দের এই সব জায়গা সকলের আগে। হাই ইস্কুল, টেকনিক্যাল ও মেডিক্যাল ইস্কুল। থিয়েটার-সিনেমা। বোমার আগুনের ভস্ম উড়িয়ে দিয়ে চারিদিকে সবুজ জীবনের পত্তন।

বেলা হয়েছে। হোক গে। জিমারিং টিকিট কেটে আনলেন। পাহাড়ে ওঠার রেলগাড়ি অবিরত ওঠানামা করছে, একটিবার উপর না দেখে হোটেলে ফেরা যায় কেমন করে? ড্রেসডেনের সবচেয়ে উঁচু রেস্তোরাঁয় বসে অন্তত এক পাত্র কফি খেতে হবে।

রেলগাড়ি শুঁয়োপোকার মতো পিলপিল করে চূড়ায় উঠল। হংকঙে ট্রাম চড়ে এমনি উপরে উঠেছিলাম। গোটা অঞ্চল নজরে আসে। নদীখাল, জলা জায়গা, সবুজ সমভূমি, অরণ্যময় পাহাড়—এই একটা, উই আর-একটা। রেস্তোরাঁয় বড় ভিড়, এত জনের জায়গা হল না, সময়ও নেই জায়গার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবার। ঐ উপরেও একজিবিশন, সেখানে খানিকটা ঘোরাঘুরি হল। এক দঙ্গল ইস্কুলের ছেলেমেয়ে বেড়াতে এসেছে, ভাব জমাবার চেষ্টা হল তাদের সঙ্গে। দেখেশুনে নেমে এলাম।

ঠিক দুপুর। ছুটুন, আর নয়। নারীগির্জার পাশে সেই পথ। কল আর মানুষে মিলে রাবিশ সরাচ্ছে। বিস্তর লোক ভিড় করেছে একটা জায়গায়। কী দেখছে। গাড়িও থামাল একটুকু। মানুষের কঙ্কাল। চাপা পড়ে ছিল ভাঙা বাড়ির তলে—মানুষ, তার ঘর-গৃহস্থালি সাধবাসনা। বেরিয়ে এসেছে। নতুন আর কী, এমন এখানে আখছার বেরোয়। পোড়া দুয়ার-জানলা, টুকরো ইট, তোবড়ানো লোহা আর ঐ এক যুগ আগেকার পুরানো কঙ্কাল খানাখন্দে ফেলে দিয়ে জীবন্তদের ঘরবাড়ি হচ্ছে সুখশান্তিতে বসতির জন্য। সামনাসামনি কাঠের ঘরের ঐ ওদিকটায় তাদেরই দুটি মগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—দুর্যোগ নিশীথে কাল তাদের দেখেছিলাম।

হোটেলের লবিতে একটি মেয়ে বসে আছে। অনেকক্ষণ ধরে আছে। আমাদের জন্য। খবরের কাগজের সংবাদদাতা—আমাদের মতামত চায়। বিদেশে এসে দর বেড়েছে, মতামতের দাম হয়েছে। ড্রেসডেনের কী ভালো লাগল বলুন? সে-জবাব তো এক কথায়—

ছবির গ্যালারি। তাবৎ তুনিয়া যার নাম জানে। আর কী ভালো লাগল? সর্বনাশে মুশড়ে পড় নি তোমরা, নতুন করে গড়ে তুলছ আবার সব।

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে মৃত্নকণ্ঠে বলে, তবু কিন্তু অনেক সমস্যা, অনেক বিপদ। তৃতীয়-লড়াইয়ের ছায়া দেখছি এরই মধ্যে।

চোদ্দ

তিন দিনের দিন ছুটল আবার মোটর। বিদায় ড্রেসডেন! ছুটেছি মাইসন-মুখো। বড় বড় পাইনগাছ পথের দু-ধারে। তলার ঝুপসি জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে কাঁচা পথ এদিক-সেদিক চলে গেছে। মাঝে মাঝে গ্রাম। রাঙা টালি-ছাওয়া ঘরবাড়ি, গির্জার লম্বা চূড়া উঠেছে আকাশ ফুঁড়ে। শ্যামল ফসলের খেত দিকপ্রান্ত অবধি। খামার-বাড়িতে এই উঁচু ঘর একটা, ভিতরে খড় বোঝাই।

বালির অঞ্চল, একটুকু মাটি খুঁড়লে বালি। বালি খুঁড়ে গাদা দিয়ে রেখেছে জায়গায় জায়গায়। এই ধরনের বালি নাকি খুব কম মেলে। লেন্স বানাতে লাগে, জর্মনির লেন্সের কদর সেইজন্য।···

মাইসনের পোর্সিলেন ফ্যাক্টরি দেখা হল। অনেক পুরোনো, জগৎজোড়া নাম। পোর্সিলেনের আবিষ্কার আঠারো শতকের গোড়ায়, ঠিক তার পরের বছর এই ফ্যাক্টরির পত্তন। ভিজিট-বুকে টলস্টয় ও বিস্তর গুণীজ্ঞানীর নামসই। দুনিয়ার ভালো খদ্দের মাত্রেই মাইসনের মাল চাইত। গ্যেটে-শিলারের বাসনপত্রে দেখে এলাম মাইসনের ট্রেডমার্ক। প্রথম লড়াইয়ের আগে মাইসনের মালের খুব চল ছিল ভারতে। মেঙ্গেল নামে এক জর্মন ফ্যাক্টরির তরফে কলকাতায় থাকতেন। বুড়ো মানুষটির সঙ্গে আলাপ হল। অনেক কাল ছিলেন, খাসা ইংরেজি বলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন : আহা, ভারি সুন্দর জায়গা! শরীর অপটু হয়েছে—এ জীবনে আর যাওয়া হবে না তোমাদের কলকাতায়।

ডিরেক্টর একরকম পোর্সিলেন দেখালেন, শতেক বার আছড়েও ভাঙা যায় না। কী কাণ্ড করেছেন মশায়, এ যে নিজের পায়ে কুড়াল মারা! বাজারে এই মাল চালু হলে ফ্যাক্টরি উঠে যাবে। জিনিস না ভাঙলে বেশি খদ্দের হবে কিসে?

কিন্তু থাক ফ্যাক্টরি। বড্ড তাড়া আমাদের এখন। থিয়েটারে শকুন্তলা পালা। সাড়ে-সাতটায় আরম্ভ, আর এখন আমরা শ-চারেক মাইল দূরে। ফ্যাক্টরি দেখে বেরুতে দেরি হয়ে গেল—তার উপরে বেরিয়ে দেখি, সর্বনাশ, মোটরে স্টার্ট নিচ্ছে না। পদে পদে বাধা।

যাব কার্ল-মার্কস-স্তাদে। শহরের নামকরণ নতুন, আগের নাম চেমনিজ (Chemniz)। কার্ল মার্কস জর্মন দেশের—শহরের সঙ্গে নাম জুড়ে দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ দেমাক দেখানো। ভারি-শিল্পের জন্য নামডাক জায়গাটার, থিয়েটারও বেশ বনেদি। রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এই চেমনিজে। ছনিয়ার যে তল্লাটে যাচ্ছি—শুনতে পাই, তিনি এসে গেছেন আগেভাগে। আর কোনো ভাবনা থাকে না। 'টেগোরে'র দেশের মানুষ গো আমি—তাঁর ভাষাতেই লিখি। দু-কথায় আপন হয়ে পড়ি।

ইদানীং এই এক মাস ধরে থিয়েটারে শকুন্তলা হচ্ছে। হাউস-ফুল রোজই। ভারতের লেখকরা এসেছে শুনে থিয়েটারের কর্তারা পালাটা দেখাতে চান। বইটই পড়ে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে যা-কিছু জানা। ভুল-ত্রুটি নিশ্চয় আছে। ভারতের মানুষদের দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে নেবেন। পালাটা লোকে খুব নিয়েছে, একটা বছর নির্ঘাত চলবে। যতদূর সম্ভব, অতএব নিখুঁত করে নিতে চান। তারপরে বার্লিন শহরেও দেখিয়ে আসবার মনন আছে। এবং সুবিধা হলে জর্মনির বাইরেও।

আমাদেরও দেখবার লোভ। জর্মনির সংস্কৃত-চর্চা বিস্তর দিনের। সংস্কৃত কাব্য-নাটক-দর্শন নিয়ে জর্মন পণ্ডিতদের গবেষণা আমাদেরই কতজনের চোখ খুলে দিল। সেই তাঁরা কালিদাসের সেরা নাটক স্টেজে করছেন—জর্মন সাহেব-মেমরা ঋষি সাজছে, আশ্রমকন্যা সাজছে—কী বস্তু মোটমাট দাঁড় করালেন, দেখতে লোভ হয় না কার বলুন?

কিন্তু হরেক বাধা। গোড়ার প্রোগ্রামে ছিল, শকুন্তলা দেখানো হবে। কিন্তু বার্লিন থেকে বেরুবার মুখে বাতিল হয়ে গেল। উজান

পথ—বহুত ভালো ভালো জায়গা নাকি বাদ পড়ে যাবে এই একটা জিনিস দেখতে গেলে।

থিয়েটারের ওঁরা এদিকে বন্দোবস্ত সারা করে বসে আছেন। আকাদেমি-অব-আর্টসের নিমন্ত্রণে এসেছি, তাঁরা মুরুব্বি। ফোন করেছেন তাঁদের বারংবার, বার্লিনে লোক পাঠিয়েছেন। ধরাধরির ফলে প্রোগ্রাম পুনশ্চ পালটাল। আরও জানা গেল, আকাদেমির কর্তারা শিল্প-সাহিত্যে দিকপাল বটে, কিন্তু ভূগোলে আনাড়ি। কার্ল-মার্কস-স্তাদ প্রায় পথেই পড়ে—মাত্র শ-খানেক মাইলের এদিক-ওদিক।

যাত্রাপথে এখন এই আবার নতুন বাধা। দুটো গাড়ির একটা বিগড়েছে। ড্রাইভার বেকুব। নিজের বিদ্যেয় যথাসাধ্য করে অতঃপর মাথা চুলকায় : খানাপিনা সারতে লাগুন, গাড়িটা একবার কারখানায় ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। রয়ে-বসে কিছু লম্বা করে খাবেন, তার মধ্যে এসে পড়ব।

বড় হোটেল এ-পাড়ায় দেখছি নে। ফ্যাক্টরিতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছি। হাঁটবার তাকত নেই—সামনের মাথায় যা পাওয়া গেল, অন্নপূর্ণার নাম স্মরে ঢুকে পড়ি সেখানে। শুধুমাত্র গো-শূকর নয়, আলাদা দু-এক পদও থাকে যেন মা-জননী।

যতদূর পারি, গড়িমসি করে খাওয়া গেল। তবু শেষ হয়ে যায় এক সময়। গাড়ির পাত্তা নেই। খালি টেবিল কোলে নিয়ে কাঁহাতক থাকি ? ছোট হোটেল—জায়গা সংক্ষিপ্ত, খদ্দের এসে দাঁড়িয়ে থাকছে। লীবার্গ তদারকিতে আছে—আধখাওয়া করেই বেরিয়েছে। ঘামতে ঘামতে ছুটে এসে বলে, উঠুন।

—গাড়ি ঠিক হয়ে গেল ?

—না হবার কী আছে ? গাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। বসবার জায়গার ব্যবস্থা করে এলাম। যতক্ষণ খুশি বসবেন—সারাদিন সারারাত্রি বসলেও কেউ কিছু বলবে না।

পোয়াটাক গিয়ে এক বাড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠছি তো উঠছিই। দোতলার সিঁড়ির মুখে তরুণী। মধুর হেসে জর্মনিতে সম্ভাষণ করে উপরমুখো হাত তুলিয়ে দিলেন। তেতলার সিঁড়িতে পুনশ্চ একটি। তিনিও হাসলেন এবং হাত দোলালেন। উঠতে উঠতে নাভিশ্বাস উঠেছে, স্বর্গলোকে নিয়ে তুলছে নাকি অহর্নিশি ও অনন্ত কাল থাকবার যেখানে পাকা ব্যবস্থা?

চার্চ এবং তৎসহ ইস্কুল। চারতলায় কমিটি-রুম—সেই ঘর দেখিয়ে দিল। সিংহাসনবৎ চেয়ারখানি প্রেসিডেন্টের। দু-দিকে লম্বা টেবিল—টেবিলের ধারে সারিবদ্ধ চেয়ার, মিটিঙের সময় মেম্বার মশায়দের বসবার জন্য। ঘরে পৌঁছে দিয়েই লীবার্গ গাড়ির খবর নিতে ছুটল। সাড়ে-সাতটায় না পৌঁছলে প্রোগ্রাম মাটি। আমাদের অপেক্ষায় থিয়েটার বন্ধ থাকবে না। একটা দিন চেপে বসে আগামীকাল দেখে যাবেন সে উপায় নেই। ভিন্ন জায়গায় আলাদা প্রোগ্রাম। সেখানকার মানুষ তোড়জোড় করে আছে। আজকে না হলে শকুন্তলা বাদ পড়ে গেল এ-যাত্রায়।

দু-জন আমাদের টেবিল দুটোয় সঙ্গে সঙ্গে চিত হলেন। এবং অচিরে নাসাধ্বনি। আমার উপায় কী—এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে খান চারেক চেয়ার জুড়ে কায়ক্লেশে তার উপর পড়লাম। বিদেশে ঘুরে ঘুরে সদভ্যাস হয়েছে, সময়ের অপব্যয় হতে দিই নে। অবসর পেলেই খাওয়া ও ঘুম—এই দুটো বাজে ঝামেলা যতদূর পারি চুকিয়ে রাখি। তা নিতান্ত খারাপ হল না। শুধুমাত্র ঘুম নয়, দেড়খানা দুখানা স্বপ্নও তার মাঝে। দুমদাম করে সিঁড়ি ভেঙে আসছে—পদদাপে বুঝেছি লীবার্গ।

—উঠুন, উঠে পড়ুন।

ঘড়ি দেখে মুখ শুকাল: অ্যাঁ, দু-ঘণ্টা কেটে গেছে।

ড্রাইভার বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়। বলে, উঠে পড়ুন দিকি। তারপরে দেখবেন।

ড্রাইভারের পাশের সীটে যথারীতি আমি। জর্মনিতে এই নিয়ম করে নিয়েছিলাম। সামনে বসে নজর ছড়িয়ে দেখা যায়, পিছনের গহ্বরে জুত হয় না। কিন্তু আজকে আর নজর মেলে ভরসা রাখতে পারি না, ক্ষণে ক্ষণে চোখ বুজি। নক্ষত্রবেগে ছুটছি। রোজ-ই ছুটি, কিন্তু আজকের মতো কোনো দিন নয়। বাঁধা রাস্তার উপরে কতক্ষণ আর! গাড়ি-মানুষ তালগোল পাকিয়ে পড়ে যাব রাস্তার পাশে—লোকে ভিড় করে এসে দেখবে, পিণ্ডাকার লোহালক্কড় দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

সীমাহারা মাঠ, উঁচু-নিচু ঢেউ-খেলানো। মাঝে মাঝে লম্বা-চূড়া গির্জা। গির্জা দেখলেই গ্রাম বুঝবেন সেখানে, গির্জাকে ঘিরে মানুষের বসবাস। গোরুর পাল চরে বেড়াচ্ছে—সাদার উপরে কালোর ছোপ-ছোপ। সব গোরুর প্রায় ঐ চেহারা, গোটা অঞ্চল ঘুরে দেখলাম। চাষের কাজ করছে চাষীরা। আজ্ঞে হ্যাঁ—সাহেব চাষী, মেম চাষী। ঘাস বাছছে, বীজ বুনছে। সর্ষেফুল—হলদে হলদে ফুলে মাঠ ভরে আছে। খেতের মাঝে সারি সারি কাঠ পুঁতে দিয়েছে, আঙুরগাছ লতিয়ে উঠছে। আমাদের পানের বরজে যেমন কাঠি পুঁতে দেয়।

স্ফূর্তিবাজ ড্রাইভার। ঐ জোরে গাড়ি ছেড়ে তার সঙ্গে রেডিও খুলে দেয়। দিয়ে চাবি ঘোরায়। কথাবার্তা-বক্তৃতাদি শুনবে না—গান। পছন্দসই গান যতক্ষণ না পাচ্ছে, চাবি ঘোরাতে লাগল। বার্লিন স্টেশনে পেল না তো ভুবনের আর যে স্টেশনে পাওয়া যায়। মনের মতো গান হল তো স্টিয়ারিং-চাকায় তাল দিতে শুরু করেছে। স্পীডোমিটারের কাঁটা ওদিকে হু-হু করে উঠে যাচ্ছে। নটা দিন এমনি গাড়ি ছুটিয়েছি ছোকরার সঙ্গে। তবু বহাল-তবিয়তে বেঁচে বিস্তর জর্মন গীত শুনে ফিরে এলাম। আমাদের অনেকগুলো নাম-করা সিনেমা সুরের সঙ্গে হুবহু মিল। কী কাণ্ড দেখুন, সুর চুরি করেছে। শুনলাম নাকি জর্মন লোকসংগীত। আমাদের সিনেমার সুর তবে দেখছি এক-শ দু-শ বছর আগে থাকতে ওরা মেরে দিয়ে বসে আছে।

ফ্যাক্টরি দেখা যায় অনেক। কার্ল-মার্কস-স্তাদের কাছাকাছি এলাম তবে? ইস্পাতের ফ্যাক্টরি—চোঙা দিয়ে লাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে টাটানগরের মতো। প্রাচীন ধাঁচের খিলান-করা মস্ত মস্ত পুল—পুলের উপরে রাস্তা, নিচেও রাস্তা। ঘ্যস করে গাড়ি থামল রাস্তার প্রান্তে গিয়ে। ড্রাইভার হি-হি করে হাসে: কী মশাইরা, পৌঁছানো যাবে না যে! অঢেল সময়, কফি খেয়ে নিন স্ফূর্তি করে, কিংবা আর-কিছু খান। কষ্ট হয়েছে।

কষ্ট আমাদের না হোক, ইঞ্জিনের খুব হয়েছে। জুড়িয়ে নেওয়ার দরকার। অবোলা মেশিন, তাই এত খাটানো গেল। মানুষ হলে এই সোস্যালিস্ট দেশে বুঝতে পারতেন। থামিয়ে দিয়েছে, হাঁসফাঁস করছে তবু বিষম।

কফিখানার গায়ে পোস্টার আঁটা। বড় বড় হরফে শকুন্তলার নাম এবং স্বর্গ-মর্ত্যের উপমা দিয়ে গ্যেটে নাটকের তারিফ করেছিলেন, তার কয়েক ছত্র। পোস্টার দিয়ে মানুষ ডাকাডাকি করছে—এসে গেছি অতএব।

১৭৮৯ অব্দ—প্রায় তো পৌনে দু-শ বছর। সার উইলিয়াম জোন্স শকুন্তলা নাটকের ইংরেজি তরজমা ছেপে ফেললেন। ফরাসি-বিপ্লবের আমল—সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আলোয় মানুষ নতুন চোখে সব দেখছে। দু-বছর পরে জর্জ ফরস্টার জর্মনে নাটকের তরজমা করে গ্যেটেকে এক কপি পাঠালেন। গ্যেটে লাফিয়ে উঠলেন—ভুবনের তাবৎ সাহিত্যের সর্বোত্তম মানিক যেন হাতের মুঠিতে পেয়ে গেছেন। চার লাইনে কবিতা লিখে ফেললেন—সে অপরূপ লেখার অনুবাদ হয় না: কুঁড়ি আর পরিণত ফল, প্রথম আবেগ আর পরিণত আবেশ, পরিতৃপ্তি আর পরিপূর্ণতা, স্বর্গ আর মর্ত্য—একটি কথায় যদি বলতে হয়, সে হচ্ছে এই শকুন্তলা। এবং তাতেই আমার সব বলা হয়ে গেল।

কবিতাটা এক মাসিকে ছেপে দিলেন। গ্যেটে হেন মহাগুণী এমন বললেন—চতুর্দিকে হৈ-হৈ পড়ে গেল : কে বটে হে কবি কালিদাস, কী বস্তু এই নাটক শকুন্তলা ? কাগজে কাগজে আলোচনা শকুন্তলা নিয়ে। একাধিক পণ্ডিত প্যারিসে গিয়ে সংস্কৃতের পাঠ নিচ্ছেন মূল সাহিত্যের রসাস্বাদের জন্য। ভারত সম্বন্ধে বিস্তর লোক কুতূহলী—ইণ্ডোলজির ক্লাস খুলল য়্যুনিভার্সিটিতে। গ্যেটে নিজে রীতিমত প্রভাবিত হয়েছিলেন, ফাউস্টের মধ্যে তার পরিচয় আছে। শকুন্তলার শুরুতে সূত্রধারের আবির্ভাব—নটীকে আহ্বান করে তিনি নাটক সম্বন্ধে বলছেন ; অভিনয়ের আয়োজন হয়েছে, কিন্তু নিজ শক্তিতে ভরসা করতে পারছেন না। ফাউস্টেও এই ব্যাপার—সূত্রধার এসে কবি ও বিদূষককে ডাকলেন ; নিজের উপর আস্থা নেই, তাঁদের উভয়ের সাহায্য চাইছেন।

জোন্সের ইংরেজি থেকে প্রথম—তারপরে মূল-সংস্কৃত থেকেও জর্মন ভাষায় শকুন্তলার তরজমা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যের জয়-জয়কার ওদেশে। সকলের-সেরা হলেন কালিদাস, সে অবশ্য বুঝতেই পারছেন। কালিদাসের কাব্য-নাটকের বিস্তর তরজমা ও ভাষ্য। শকুন্তলার তরজমা ও ভাষ্য অন্ততপক্ষে বিশখানা। বিক্রমোর্বশী নাটকও থিয়েটারে হয়ে গেছে ১৮১৭ অব্দে। নাম দিয়েছিল 'সম্রাট ও নর্তকী'।

লড়াই জর্মনিকে তছনছ করে গেছে—তার মধ্যেও কিন্তু ভারত-চর্চা অব্যাহত চলছে। স্বচক্ষে দেখে এলাম। বার্লিনে জাঁকিয়ে আছেন ডক্টর রুবেন—য়্যুনিভার্সিটিতে তাঁর নিজ বিভাগে প্রায় এক টোল সাজিয়ে বসেছেন। গিয়ে মনে হল, সেই হলটার ভিতরে আমার অত্যন্ত আপন জায়গা। যতেক ছাত্রছাত্রী চেহারায় সাহেব-মেম, মনে মনে ভারতের মানুষ। আলাপ-পরিচয়ের জন্য পাগল। প্রাচীন ভারত পুঁথিপত্রে জানে ; হাল আমলের ভাষাগুলো—বিশেষ করে হিন্দি আর বাংলা জানবার জন্য আকুলিবিকুলি

করছে। হিন্দির জন্য আছেন ডক্টর আনসারি; দুর্ভাগা বাংলার কেউ নেই। আর দেখলাম লাইপসিগে অশীতিপর ঋষি-তপস্বী অধ্যাপক ওয়েলার। বর্ষীয়সী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অধ্যাপক মশায় পায়ে হেঁটে হোটেলে এলেন ভারতের মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে। মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম তাঁর কাছে। আচ্ছা, সংস্কৃতে অধিকার থাকলেই কি চেহারায় আচরণে চিত্তের ঔদার্যে আমাদের সেকালের ভোগ-বিরাগী পণ্ডিত হতে হবে? অধ্যাপক ওয়েলারেরও হিন্দিভাষী সহকারী আছেন—শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী। বাংলা নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

পণ্ডিত মানুষদের ছেড়ে সাহিত্যিকের কথা বলি। আমাদের কী বিপদ শুনুন। বার্লিনে আমাদের সান্ধ্য আড্ডা জমেছে স্টেফান হেরম্-লাইনের বাড়ি। উভয় জর্মনির অনেক লেখক জুটেছেন। যেমন হয়ে থাকে—কবিতা-পাঠ, উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা এবং যথোচিত খানাপিনা। আসর পাতলা হয়ে গেলে কবি মশায় লাইব্রেরি দেখাতে উঠলেন। বিশেষ একটা ঘর নয়—উপর তলায় নিচের তলায় সর্বত্র বই। ঘরে বারাণ্ডায় সিঁড়িতে। এক মানুষের জীবনে অত বই পড়া যায় না। প্রকাণ্ড এক শেলফের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন তিনি আমাদের নিয়ে। বইয়ে ঠাসা, চামড়ার উত্তম বাঁধানো। একখানা দুখানা বের করে এনে সামনে ধরছেন। বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করে—চলিত অচলিত নানান সংস্কৃত বই, জর্মন ভাষায় টীকা-টিপ্পনী। এই সমস্ত পড়ে থাকেন কবি। ভারতের মানুষ বলে আমাদের সম্ভবত সংস্কৃতে দিগ্‌গজ বিবেচনা করেছেন। হয়তো বা বলেই বসলেন কোন দুরূহ শ্লোকের ব্যাখ্যা করে দিতে। সুবোধ পাঠক মশায়দের সদুপদেশ দিয়ে রাখি, জর্মনির গুণীজ্ঞানী সমাজে যাবেন তো সংস্কৃতটা রপ্ত করে নিন আগেভাগে। অথবা পানভোজনের পরে লাইব্রেরি দেখানোর সময় হলেই মাথাধরা বা অমনি-কিছু রচনা করে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হবেন। নতুবা মান বাঁচানো দায়।

কার্ল-মার্ক্স-স্তাদে হোটেলের সামনের রাস্তায় থিয়েটারের এক ব্যক্তি বিচলিতভাবে পদচারণা করছেন। মোটর থামতে না থামতেই গ্রেপ্তার করলেন। হাতঘড়ি দেখে বলেন, জিনিসপত্র ঘরে ঘরে ফেলেই তালা দিয়ে নেমে আসুন। কফি পথে সেরে এসেছেন ভালোই—অঙ্কের শেষে পর্দা পড়লে আর একদফা ভালোমতো হবে।

ডিরেক্টর কেসলার বুড়া হয়ে পড়েছেন। শুধুমাত্র নামে ডিরেক্টর, আসছে বছর অবসর নিচ্ছেন। সহকারী ফ্রেয়ার (Paul Herber Freyer) তখন পুরো ডিরেক্টর হবেন। এখনও তিনি সব করেন, শকুন্তলার পুরোপুরি ব্যবস্থা তাঁরই। কর্মিষ্ঠ যুবাপুরুষ—থিয়েটারের ফটকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পথ দেখিয়ে আমাদের ভিতরে এনে বসালেন। হল ভরতি, কালো মানুষ কটির দিকে ঔৎসুক্যভরে সকলে তাকাচ্ছে। পুরো এক হাজার সীট—তার মধ্যে পয়লা সারিতে গোনাগুনতি এই কখানা রেখে দিয়েছে আমাদের জন্য। ফ্রেয়ার ওরই মধ্যে মনে করিয়ে দিচ্ছেন : খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন কিন্তু। বিস্তর খেটেছি। কুড়িটা তরজমা মিলিয়ে মিলিয়ে নাটক বানানো—মূল থেকে যাতে বেশি ফারাক না হয়। তবু ভয় ঘোচে না—শিব গড়তে গিয়ে বানর না গড়ে থাকি।

লিজেল ইংরেজি করে দিল ফ্রেয়ারের কথাগুলো। আমার পাশের সীটে বসেছে। ফ্রেয়ার নিজেও এই লাইনে।

দেরি করে ফেলেছে আমাদের খাতিরে পাঁচটা মিনিট। ধবধবে সাদা পর্দা, উইংসের চিত্রণে সাদামাটা কতকগুলো রেখা। চোখ প্রসন্ন হল, সাদা রঙের প্রাচুর্যে পুণ্য পবিত্র পরিবেশ আনতে চেয়েছে। আলো নিভে গেল। বিশাল হল উৎকর্ণ হয়ে আছে, সুচ পড়লেও শোনা যাবে বোধ হয়। লিজেলের কানে কানে বলি,

রোজ তুমি আমাদের বোঝাও, আজকে চুপচাপ থাকো। আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব পালা।

পর্দা ঠেলে তরুণ ঋষি বেরিয়ে এলেন। ইনি কণ্ব-শিষ্য শার্ঙ্গরব সেজেছেন, ক্ষণপরে টের পাওয়া গেল। উদাত্ত কণ্ঠে শিবস্তোত্র পাঠ করলেন। বিশাল হল থমথম করছে। মৃদু বাজনা। কনসার্ট ওদেরই, কিন্তু হুড়ুমদাড়াম ঢক্কা-নিনাদ না হয়ে সানাইয়ের মতন মোলায়েম আমেজ পাচ্ছি।

সূত্রধার ও নটীর প্রবেশ। মূল-নাটক পড়া আছে, হুবহু মিলে যাচ্ছে। জর্মন না জানলেও বক্তব্য মোটামুটি বুঝতে আটকায় না। ঐ নটীই পরে দেখলাম শকুন্তলা। সুন্দরী মেয়ে, নামটাও সুন্দর—রোজমেরি (Rosemarie Schnabl)।

পর্দা সরে গেল। তিন দিক ঘেরা কাপড়ের সিন। কণ্বের তপোবন তো জানি, কিন্তু সিনে দেখছি নিখুঁত ভারতীয় রীতিতে আঁকা হাতির পিঠে রাজা, নৃত্যপরা অপ্সরী, হরিণ ইত্যাদি। বন বলতে যা বোঝেন, তার কিছু নেই। আমাদের থিয়েটারে পুরোপুরি বন এঁকে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাবার প্রয়াস করে। এদের উদ্দেশ্য তা নয়—শুধুমাত্র একটা ভারত-পরিবেশ রচনা করেছে; দর্শকদের যেন ডেকে বলছে, একটা ভারতীয় কাহিনী আসছে, মনে মনে তৈরি হও তার জন্যে। সে না হয় হল। কিন্তু কী করে বুঝি যে জায়গাটা হল তপোবন, রাজবাড়ি নয়? দুটো গাছ বসিয়ে দিয়েছে স্টেজের মাঝখানে—একটা গাছ আলবালে ঘেরা। সত্যিকারের জীবন্ত গাছ নয়, আঁকা গাছ—গাছের ইঙ্গিত। ব্যস, হয়ে গেল, আর কিছু মাথা ঘামানোর নেই। ঐ গাছের অনেক গুণ ধরে নেবেন। অর্থাৎ দুটো মাত্র নয়, অগণ্য গাছ। আবার এই সিনের কাজের শেষে রাজসভায় তো আসবেন? হাঙ্গামা নেই—স্টেজের ঐ জায়গাটুকু পর্দায় ঢেকে গাছ সরিয়ে ঐখানে রাজাসন বসিয়ে দিল, পিছনে কারুমণ্ডিত দেয়ালের একটুকু। হয়ে গেল রাজসভা। দৃশ্য বদল হল—কিন্তু

পশ্চাৎপটে হাতি-হরিণ-অপ্সরার চিত্র যেমন-কে-তেমন রয়ে গেছে। অঙ্ক শেষ হয়ে পুরো স্টেজে পর্দা পড়বে, পশ্চাৎপট সেই তখন শুধু বদলাবে।

চুপ, চুপ! রাজা দুষ্মন্ত আসেন ঐ রথে চড়ে। এটা দৃষ্টিকটু। বলে এসেছি, এখন গিয়ে নিশ্চয় আর সে-বস্তু দেখবেন না। রথটা যেন রিকশা—স্টেজের উপরে একজন রিকশা টেনে আনল। দুষ্মন্ত ধনুর্বাণ তুলে তার উপরে চেপে আছেন। ঘুরন-মঞ্চ, কলকাতার থিয়েটারে যেমন ধারা দরকার মাফিক মঞ্চ ঘোরানো চলে। কলকাতায় মঞ্চ ঘোরাই দৃশ্য পালটাতে। ঘর আছে, মঞ্চ ঘুরিয়ে দেখাই গাছতলা। দেখাই পথ। এখানে দৃশ্যই হল গোটাকতক সঙ্কেত মাত্র ; দৃশ্য পালটানো অতিশয় সোজা, সে তো আগে শুনলেন। ঘুরন-মঞ্চ এরা দৃশ্যের পরিধি বাড়ানোর কাজে লাগায়। দুষ্মন্তের রথ এগোচ্ছে, স্টেজও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে নেপথ্য থেকে রথ এগোবার জায়গা অবারিত করে দিচ্ছে। ঘোরার ফলে আলবালে-ঘেরা গাছ ক্রমশ উলটোদিকে উইংসের কাছাকাছি এসে যাচ্ছে। পর্দা টেনে ঢেকে দিন ঐটুকু। শকুন্তলা এবং অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সেই আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। স্টেজ আরও খানিকটা পাক দিতে চোখের সামনে এসে পড়ল তারা। তিন সখীর হাতে তিনটি পাত্র, গাছে জল দিচ্ছে। সত্যিকারের জল-ঢালাঢালি নেই, শুধু ভঙ্গিমা। দুষ্মন্ত রথ থেকে নেমে দু-চোখ ভরে মুগ্ধ হয়ে দেখছেন, আর বিস্তর স্বগতোক্তি ছাড়ছেন। কোন জায়গায় এসেছি বিবেচনা করুন একবার। পাড়াগাঁয়ের যাত্রার আসর নয়। তামাম ইয়োরোপের মধ্যে ফ্রান্স আর জর্মনি—এই দুটো হল খানদানি জায়গা ; হিটলার তার উপরে আর্য-আর্য করে কিছুকাল মাথা ঘুলিয়ে দিয়ে গেলেন। হাজার দর্শকের মধ্যে কুল্যে আমরা এই পাঁচটি কৃষ্ণাঙ্গ। হেন স্থানে, দেখুন দেখুন, আড়াই-গজি স্বগতোক্তিগুলা শ্রোতারা কান বাড়িয়ে মজে গিয়ে কেমন গোগ্রাসে শুনছে।

শকুন্তলা ও সখীদের অতি স্বল্পবেশ—বক্ষোবাস ও কটিবল্কল। হাড়-কাঁপানো শীতের দেশে রাত্রিবেলা প্রায় খালি গায়ে অভিনয় করছে। ঋষিদেরও ঐ গতিক। সে তুলনায় রাজা দুষ্মন্তের কিছু বেশি কাপড়চোপড়। কিন্তু অহরহ পশমি কোট-পাতলুন ও ওভার-কোটে সমাবৃত হয়ে থাকেন, তার কাছে কিছুই নয়। বাবরি চুল দুষ্মন্তের, একটুকু সুচাল দাড়ি। শকুন্তলার কপালে বড় লাল ফোঁটা, অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কালো ফোঁটা। কিন্তু পায়ে জুতা সকলের। সর্বত্যাগী ঋষিরাও জুতা ছাড়তে পারেন নি। মহামুনি কণ্ব-দুর্বাসাও। স্যাণ্ডেল—চামড়ার ফিতেয় পায়ের গোছার সঙ্গে বাঁধা। দোষ নেবেন না। পুরাণ বলতে প্রাচীন গ্রীক-রোমকদের কথা বোঝে ওরা। কালিদাসের বর্ণনায় যা নেই, সে সব নিজেদের পুরাণ থেকে নিয়েছে। বিধবার মতো খালি হাত মেয়েদের—চুড়ি নেই। না শকুন্তলার, না সখীদের। পতিগৃহে যাবার সময় শকুন্তলা বল্কল ছেড়ে কাপড় পরল—উত্তম সিল্কের কাপড়, কিন্তু পাড়বিহীন। আমরা মানা করে এসেছি। সহযাত্রিণী উমা রাও একটা লাল-পাড় শাড়ি ও গোটাকয়েক কাচের চুড়ি দিয়ে এলেন রোজমেরিকে। এবারে গিয়ে দেখবেন, শকুন্তলার খালি পা, চুড়ি-পরা হাত, পাড়ওয়ালা শাড়ি পরনে। এবং ঋষিরাও, আশা করি, খালি পায়ে তপোবনে বিচরণ করবেন।

কিন্তু বাইরের টুকিটাকি ছেড়ে দিন। প্রাণঢালা কী অভিনয় যে করল! হেলাফেলার কেউ নয়—ধীবর-দৌবারিক অবধি। সকলের সেরা শকুন্তলা—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কত দিন হয়ে গেল—চোখ বুঁজলে কিশোরী মেয়েটা নানা মূর্তিতে এখনো মনে ভেসে বেড়ায়। নিরীহ নিষ্পাপ আশ্রম-বালা, বনেজঙ্গলে লালিত, জনালয় দেখে নি—মহৈশ্বর্য রাজাকে দেখে বিহ্বল বিমুগ্ধ হয়ে গেছে। রাজসভা থেকে অবমানিত হয়ে বেরুচ্ছে, তখন আবার কী মূর্তি সেই মেয়ের! শেষ অঙ্কে স্বর্গধামে ছেলে নিয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়াল, দুঃখ-দহনে মাতৃত্ব-সুষমায় তখন তার এক ভিন্ন চেহারা।

শকুন্তলা পালার এত জয়-জয়কার, অনেকখানি তার রোজমেরির অভিনয়ের গুণে। অথচ মেয়েটা পড়ে লাইপজিগ শহরে, কলেজ অব ড্রামাটিক আর্ট-এর ছাত্রী। ডিগ্রি পাবার আগেই ধরে এনে পালার নায়িকা করেছে। আঠারো বছর বয়স মোটে। সুপ্রাচীন কঠিন এই নাট্যচরিত্র নতুন কালের রসিক বিদগ্ধ সমাজে কী আশ্চর্য নিপুণতায় হাজির করেছে, চোখে না দেখলে প্রত্যয় পাবেন না।

দুষ্মন্ত প্রেমে পড়েছে। আংটি পরিয়ে দিল শকুন্তলার আঙুলে। পরিয়ে—ছি-ছি, কী কাণ্ড করে দেখুন,···তোমাদের ম্লেচ্ছ কাণ্ডবাণ্ড আমাদের দেশে চলে না বাপু! আংটি পরিয়ে দুষ্মন্ত চুম্বন করতে যাচ্ছিল, ঋষির কণ্ঠস্বরে চট করে সরে দাঁড়াল। ঋষি খুব বাঁচিয়ে দিলেন সময়মতো এসে পড়ে। নমস্কারটা কিন্তু আচ্ছা শিখেছে! খাঁটি ভারতীয় কায়দায়। ঋষি করছেন, রাজা করছেন, শকুন্তলা-অনসূয়া-প্রিয়ংবদা করছে—যার যেমনভাবে উচিত, হাত জোড় করে মাথা মাটিতে ঠুকে টপাটপ নমস্কার সেরে যাচ্ছে।

পরের দৃশ্যে বিদূষককে দেখছি। গাছের গায়ে পা তুলে দিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। দুষ্মন্তের বিলাপ শুনে বিস্তর কষ্টে হাসি ঠেকাচ্ছে—খি-খি আওয়াজ তুলে সামনে থেকে ছুটে পালায়। কী সব বলছে—আমরা বুঝি নে, প্রেক্ষাগৃহ বারংবার হাসিতে ফেটে পড়ে। ছুটোছুটি ব্যাপারটাও ইঙ্গিতে দেখাল। হাঁটছে—জোরে, আরও জোরে—রীতিমতো দৌড়ানো। পা ফেলানো দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে, দেহভঙ্গিতেও দ্রুত চলনের লক্ষণ। ব্যস, এইটুকু। রয়েছে কিন্তু এক জায়গাতেই।

রাজকক্ষ নিতান্তই সাদামাঠা। দুষ্মন্ত ও বিদূষক ছাড়া অন্য কেউ নেই। কঞ্চুকী বা দৌবারিক দেখা দিচ্ছে কদাচিৎ। চলে যাবার সময় হাত দিয়ে অর্ধেকখানি পর্দা টেনে দিয়ে গেল একবার। জর্মন-থিয়েটারে অনেক পালা দেখেছি,—শকুন্তলারই শুধু এই রকম ব্যবস্থা। মঞ্চ ঘুরে গিয়ে সেই পর্দার পিছন দিক সামনে এল। বিরহাতুরা

শকুন্তলা—পদ্মপত্রে বাতাস করছে দুই সখী। গায়ের সাদা রং ময়লা করবার জন্য কী যেন মেখেছে মেয়েগুলো। বেদনায় ভরা অতি-মোলায়েম কনসার্ট—হলের নিচে-উপরে সর্বত্র গুঞ্জরণ করে ফিরছে। সেই কোমল সুরের উপর যেন মুগুর হেনে ঋষি দুর্বাসা সহসা আবির্ভাব ঘোষণা করলেন। অভিশাপ দিলেন শকুন্তলাকে। রবি বর্মার বিখ্যাত ছবিতে যেমন দেখেছেন, অবিকল তাই।

দুষ্মন্তের রাজসভা। রাজাসনের দু-পাশে ভারতের পুরানো স্থাপত্যের দুই নারীমূর্তি। সাঁচির প্যাটার্নে রাজবাড়ির ফটক স্টেজের এক দিকে। অন্যদিকে মন্দির। পিছনে অন্তঃপুরের ইঙ্গিত। রাজবধূ হংসপদিকার গান ভেসে এসে পরিবেশ অশ্রুকরুণ করে তুলছে।

অঙ্কশেষে চা খেতে বসেছি ফ্রেয়ারের সঙ্গে। প্রোগ্রাম দিয়েছে, এতক্ষণে উলটেপালটে দেখার ফুরসত পেলাম। ভারতের বিভিন্ন দৃশ্যের চারখানা ফোটো। গ্যেটে, হার্ডার ও ফরস্টার—তিন গুণীর অভিমত, শকুন্তলা নিয়ে প্রথম যাঁরা নাড়াচাড়া করলেন। কালিদাস কি করে জর্মনিতে হাজির হলেন, তার মোটামুটি ইতিহাস লিখেছেন ডক্টর রুবেন। আর একজন কালিদাসের সাহিত্য-পরিচয় দিয়েছেন। তারপরে বিস্তৃত নাট্যকাহিনী—বিশেষ বিশেষ ব্যাপারের ছবি। আঁকা ছবি—ছবি দেখে সন্দেহ হতে পারে কোনো ভারতীয় শিল্পীপ্রধানের চিত্রকর্ম। ভারতীয় থিয়েটার সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-চার কথা রয়েছে প্রোগ্রামের সর্বশেষে।

ঘণ্টা বাজে। হল অন্ধকার। তাড়াতাড়ি যে যার সীটে গিয়ে বসেছি। মহামুনি কণ্ব দেখা দিলেন এতক্ষণ পরে। ও হরি, সূত্রধার হয়ে ইনিই তো একবার এসে গেছেন। এবারে পাকা দাড়ি এঁটে এসেছেন, তাই গোড়ায় ঠাহর হয় নি। শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ি যাবে। জল-চৌকির উপর আর-একটা বসিয়ে তদুপরি আর-একটা—উঁচু আসন বানিয়ে দিল শকুন্তলার। জুতো-পরা পায়ে আলতা কি করে

দেয়—তুলি দিয়ে লম্বালম্বি রেখা আঁকল পায়ের গোছার উপর। বাকল ছেড়ে পুরো মাপের কাপড় পরবে—স্টেজের উপরে বোধ করি আধ মিনিটের মধ্যে দেহ বেড় দিয়ে কাপড় পরিয়ে দিল। পরের জায়গাটায় কবিকল্পনার সঙ্গে মেয়েটার প্রায় পুরোপুরি মিল। গাছে জল দিতে সখীদের বলে যাচ্ছে। হরিণ-শিশু আঁচল ধরে টানছে—সত্যিকার কোনো জীব নয়, শকুন্তলা ভঙ্গিটা দেখাল শুধু। আর্যা গৌতমী ও ঋষি দু-জনের সঙ্গে সঙ্কোচভরে শকুন্তলা রাজসভায় এসে দাঁড়াল। দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যানে সেই কন্যা ফণিনীর মতো মুহূর্তে যেন ফণা তুলে ওঠে।

মর্ম-ছেঁড়া দৃশ্যের পরেই হালকা হাসি। গুমট কেটে গিয়ে মানুষ নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। রাজবাড়ির গেটের সামনে জেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে। বুড়ো মানুষ মাছের পেটে আংটি পেয়েছে, কিন্তু কে শোনে তার কথা। ঘা-গুঁতো দিচ্ছে—পুলিস যেমনধারা চোরকে করে। নগরপাল আংটি নিয়ে রাজার কাছে গেল। ফিরল হাসতে হাসতে, ভারি টাকার থলি হাতে। টাকা দেখে জেলে আঁকুপাঁকু করছে। নগরপাল ইতিমধ্যে থলির কয়েকটা টাকা ফেলল নিজের কোমরের খাঁজে। আর যত প্রহরী সবাই জেলেকে ঘিরে ধরেছে, টাকার ভাগ চায়।

দুষ্মন্তের কক্ষ। স্তম্ভে হাতি-আঁকা। আংটি দেখে রাজার মনে পড়ে গেছে, হা-হুতাশ করছেন। প্রচুর স্বগতোক্তি। একটা মেয়ে প্রায় অজন্তার ভঙ্গিতে এক দিকে দাঁড়িয়ে আছে—স্বল্পবাস। আর একটি নাচছে ভারতীয় ঢঙে। রাজা প্রবোধ মানেন না, নর্তকীদের বিদায় করে দিলেন। হেনকালে মাতলি এল স্বর্গধামে দৈত্যের অত্যাচারের খবর নিয়ে।

পুষ্পক রথ ছুটেছে আকাশ দিয়ে। মজার পরিকল্পনা। ক্ষীণ আলো। রথ খানিকটা উঁচুতে তুলে দিয়েছে মঞ্চ থেকে। চাকা আওয়াজ তুলে বিপুলবেগে ঘুরছে। রথ অবশ্য নড়ছে না। উপর

থেকে থোকা থোকা আঁকা-মেঘ ঝুলিয়ে দিয়েছে এদিকে-সেদিকে। রথের নিচেও কিছু মেঘ।

স্টেজের খানিকটা পর্দায় ঢেকে দিল। জোরালো আলো এবার। স্বর্গলোকে ওঁরা পৌঁছে গেছেন। স্টেজ ঘুরে গিয়ে দেখা যায় শকুন্তলা ও শিশু-পুত্র ভরত। মিলন। সামনে থেকে একটুকু পর্দা খসে পড়ল। ইন্দ্র ও শচী। দেবরাজ আশীর্বাদ করলেন।

আড়াই ঘণ্টা লাগল। ফ্রেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আছেন, খাতির-যত্ন করছেন। বললেন, ভিতরে চলুন যাই। আমাদেরও সেই ইচ্ছা। মেক-আপ তুলতে অভিনেতারা ঘরে ঢুকে গেছে। রোজমেরি এবং আর দু-পাঁচটি আছে মাত্র স্টেজে।

দুষ্মন্ত একলা নয়, আমরা সবাই তোমার প্রেমে পড়ে গেছি শকুন্তলা—

বয়সে ছেলেমানুষ তো—অঙ্গে এখনো থিয়েটারের সাজ-পোশাক, অভিনয়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। আশ্রম-বালিকার মতোই বিহ্বল চোখে তাকায়। লিজেল মানে করে দিল তো খিলখিল করে হেসে ওঠে। কত খুশি যে হয়েছে! শেকহ্যাণ্ড করল, দু-হাত জুড়ে নমস্কার করল, আর কী করবে ভেবে পায় না।

হোটেলে ফিরেছি। থিয়েটারের ওঁরাও সব আসছেন ধোয়া-মোছা সেরে। তার আগে খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিই তাড়াতাড়ি। গেরো খারাপ—ফাঁকা টেবিল দেখে নিয়ে বসতে যাচ্ছি, এমন সময় একদল এসে পড়লেন। কফি-ঘরে গিয়ে দু-এক ঢোক কফিই চলুক তাহলে—বসতে না বসতে বড় দল এসে গেল। মানুষ কি একটা-দুটো—গোটা থিয়েটার ভেঙে এসেছে, লবিতে গিয়ে গমগমে সভা জমানো ছাড়া গতি নেই। সাড়ে-দশটা ঘড়িতে। এখন নিবেদন জানাচ্ছেন, পালাটা কিসে আরও ভালো করা যায়, তদ্বিষয়ে কিছু উপদেশ ছাড়ুন। কালিদাসের দেশস্থ বলে আমাদের বিশেষ তালেবর

ঠাওরেছে। এমন মওকা আমরাই বা ছাড়ি কেন? সে রাত্রের কথাবার্তা শুনলে আপনারা চমকে যেতেন: অভিনয়ের পাকা জহুরি আমরা সবাই, ঐ কর্মই যেন করে আসছি এতাবৎ। অবধান করে ওরা শুনছে। অতঃপর দ্বিতীয় নিবেদন: তোমরা তো হামেশাই শকুন্তলা করে থাক। সেটা কী প্রকার—সবিশেষ বর্ণনা করো, শিখে রাখি। সকলে মুখ তাকাতাকি করে উত্তরের ভার অধমের ঘাড়ে চাপালেন: ইনি কলকাতার লোক। পেশাদারি থিয়েটার যা-কিছু কলকাতায় আছে। বাংলা থিয়েটারের বয়সও বিস্তর। এঁর বই থিয়েটারে হয়ে থাকে, ইনি বলুন।

অতএব আমি মুখে মুখে গল্প বানাতে লাগলাম। অভ্যাস আছে, সে তো জানেনেই। কালিদাসের দেশস্থ হয়ে কোন লজ্জায় বলি, শকুন্তলা আমাদের দেশে কল্কে পান না। বলছি, তোমরা মূলের সঙ্গে মিল রেখে এবং পুরানো পদ্ধতি আগাগোড়া মেনে নিয়েও আশ্চর্য রকম নাটক জমিয়েছো। আমাদের পেশাদারি থিয়েটার নাটকের মধ্যে কিঞ্চিৎ মেলোড্রামার আমদানি না করে দর্শকের সামনে এগোবার ভরসা পায় না। ইত্যাদি, ইত্যাদি। তবে যাই বলো বাপু, তোমাদের সংস্কৃত গানগুলো যথোচিত হয় নি।

তৎক্ষণাৎ তৃতীয় নিবেদন: দুটো-একটা শ্লোক নির্ভুল গেয়ে শুনিয়ে যাও।

রাও মশায় কবি। হিন্দি কবিতা শুধুমাত্র কলমে লেখার বস্তু নয়, গলা ছেড়ে গাইতে হয়। তিনি থাকতে ডর কিসের? ঐ হিন্দির ধাঁচে কালিদাসের একখানা শ্লোক গেয়ে তিনি হোটেলসুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন।

—হাল আমলের ভারতীয় নাটক কিছু করতে চাই। হ্যাঁ মশায়, কালকুত্তায় এত থিয়েটার—দিও না খান কয়েক ভালো নাটক পাঠিয়ে। ইংরেজিতে পাঠিও, তরজমা করে নেব।

পঞ্জাবের এক লেখক ইংরেজি নাটক পাঠিয়ে দিব্যি বাহবা

নিচ্ছেন। এবং অর্থও। বাঙালি নাট্যকারের না পারবার হেতু নেই। সে যা-ই হোক—ঘাড় নেড়ে বারকয়েক 'নিশ্চয়' 'নিশ্চয়' বলে কালকুত্তার পশার তো অক্ষুণ্ণ রেখে যাই আপাতত।

দুষ্মন্ত সাজেন, ভদ্রলোকের নাম হল টিমারম্যান (Hans-Theo Timmermann)। এখন ষোলো-আনা সাহেব—যে চেহারা যে পোশাকের জীবগুলিকে আমরা এই পৌনে দু-শ বছর শত হস্ত দূরে সমীহ করে এসেছি। শকুন্তলা-অনসূয়া-প্রিয়ংবদা সকলেই ঠোঁটে-রং বব-করা চুল রীতিমতো মেমসাহেব। দুষ্মন্তকে বলি, গণতন্ত্রী দেশে তোমায় দেখলাম দুর্ধর্ষ সম্রাট একটি। অনেক শতাব্দীর অভ্যাস কিনা—ছাড়তে চাইলে কী হবে, রক্তের মধ্যে কিছু থেকে যায়। থিয়েটারে তাই অমনধারা নিখুঁত সম্রাট হলে।

হাসাহাসি চলল। ডিরেক্টর কেসলার রবীন্দ্রনাথের কথা তুললেন : 'টেগোরে' এসেছিলেন, তখন যুবা আমি। তাঁর আশেপাশে ঘুরতাম।

আর কোথা যাবে! সকলে ধরে বসল, বলুন তাঁর কথা।

—আশ্চর্য কণ্ঠ, অমন মিষ্টস্বর আর কখনো শুনি নি। সৌম্য চেহারা—দুধের রঙের দাড়ি। অনেক করে বলা হল, কিন্তু 'টেগোরে' বক্তৃতা করলেন না। 'ডাকঘর' অভিনয় করলেন। কটা দিন মাত্র ছিলেন, সে স্মৃতি আজও মনে জ্বলজ্বল করে।

গল্প চলেছে তো চলেইছে। দূরবাসী আপনজনেরা এক জায়গায় মিলেছি। একটা বাজলে তখন হুঁশ হল।

খানাঘরে বড় আলো সবগুলো নিভিয়ে দিয়েছে। ফাঁকা চেয়ার-টেবিল। আধ-অন্ধকারে জন-দুই লোক খুটখাট করে বাসনপত্র গোছাচ্ছে।

আমাদের কী হবে গো?

বৃদ্ধ বয় দু-পাটি দন্ত বিস্তার করে ঘাড় নাড়ল।

—গরম চাচ্ছি নে বাপু, বাসি-ঠাণ্ডা যত্তপি কিছু থাকে—

—খুঁজে-পেতে মিলতেও পারে কিছু। কিন্তু খুঁজবে কে? তারা সব শুয়ে পড়েছে।

নিশিরাত্রে থিয়েটারওয়ালাদের মোটরে তুলে দিয়ে খালি পেটে কয়েকটা ঢেকুর তুলে আমরাও অগত্যা শুয়ে পড়লাম।

আবার পথে নেমেছি। জর্মনির অটোভান—সরল বাংলায় মানে হওয়া উচিত, খ্যাপা হয়ে মোটর ছুটানোর রাস্তা। রাস্তা যত চওড়া ও চৌরস এবং যত রকমের বন্দোবস্ত করা চলে—হিটলার কিছু বাকি রাখে নি। পরের দেশের টুঁটি ছিঁড়তে হাজারে হাজারে নেকড়ের মতো গিয়ে পড়বে, রাস্তাটা উৎকৃষ্ট না হলে চলবে কেন? তিন-শ চার-শ মাইল এ রাস্তায় নিতান্তই নস্যি। এই যেমন কার্ল-মার্কস-স্তাদে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ছুটছি—দুপুরের খানা রাঁধাবাড়া রয়েছে ভাইমারের (Weimer) হোটেলে।

কলেজের পাঠ্য-বই ছিল, কার্লাইলের লেখা 'শিলারের জীবন-চরিত'। সেই তখন পাতায় পাতায় 'ভাইমার' মুখস্থ করে এসেছি। গ্যেটে-শিলারের গ্রাম। গ্যেটে ও শিলার শেষ ক-বছর এইখানে কাটিয়ে গেছেন। কিন্তু গ্রামই বলবেন, না শহর? এ পোড়া রাজ্যে মিছরি-বাতাসা একই ছাঁচে ঢালা—ফারাক বোঝা দায়। ইলেকট্রিক আলো, পাকা-রাস্তা, কলের জল, গির্জা, ইস্কুল-কলেজ, হাসপাতাল—শহর বলতে যত-কিছু বোঝেন, সমস্ত জর্মনির গ্রামে গ্রামে। আমি তাই ভেবেচিন্তে এক নিশানা ঠিক করেছি—ট্রামগাড়ি চললে বলব শহর, অন্যথায় গ্রাম। ভাইমারে ট্রাম নেই।

যেখানে উঠেছি, নাম হল হোটেল এলিফ্যাণ্ট। ষোলো আনা ইংরেজি নাম; দরজার পাশে হাতি-আঁকা। ইংরেজের নামে তো মুখ বাঁকায়—দ্বীপের দেশের বেনেগুষ্টি, ওরা আবার মানুষ হল কবে? এ হেন জর্মনভূমে ইংরেজি নামের হোটেল কী করে হল, বুঝতে পারি নে। থাকছি চব্বিশ ঘণ্টা—কাল দুপুরে খানাপিনা সেরে আবার রওনা। ছোট্ট জায়গা, গ্যেটে-শিলার ছাড়া জাঁক করবার কিছু নেই। তাঁদের ঘরবাড়ি ও মিউজিয়ম। গ্যেটের ঐ এক নামেই অবশ্য

ত্বনিয়ার মানুষ খেয়ে আসে; দশ রকমের এটা-সেটা দেখিয়ে মন ভোলাতে হয় না। পুরো একটা দিন যথেষ্ট তার পক্ষে। কাল ত্বপুরে এখান থেকে যাচ্ছি কাছে-পিঠের জায়গা বুকেনওয়াল্ডে (Buchenwald)। ওয়াল্ড মানে বনজঙ্গল। বিষম জঙ্গল ছিল একদা, আশেপাশে এখনও জঙ্গল-পাহাড়। বুকেনওয়াল্ডের জঙ্গল কেটেছে, কিন্তু জানোয়ার ছিল এই সেদিন অবধি। বাঘ-সিংহ যার কাছে লজ্জা পেয়ে যায়। সে হল হিংস্রতম মানুষ-জানোয়ার। নাৎসিদের কনসেনট্রেশন-ক্যাম্পের কথা শুনেছেন, সকলের বড় ক্যাম্প বুকেনওয়াল্ডে। কাল যাচ্ছি সেখানে।

থাক গে, কালকের কথা কাল। হয়তো বা ভাইমারের শিষ্ট বিশেষণ জুড়বেন—কবিতীর্থ। যথার্থ বটে। গ্যেটেরা গত হয়েছেন, এ যুগেও এক ভারি দরের কবি থাকেন—লুই ফারানবার্গ। বাগানের মধ্যে বাড়ি—রাঙা রাঙা ফুল ফুটেছে চারিদিকে। ঘরে ঢুকতে মন চায় না, বিহ্বল হয়ে লাল আর সবুজের বাহার দেখি। কবি বললেন, গোটা ভাইমারই এই। উদ্যানপল্লী। আঁকাবাঁকা ঝিরঝিরে নদী—ইলম তার নাম। ফ্যাক্টরির ময়লা জল ফেলে ফেলে এমন নদী, আহা রে, নোংরা করে দিচ্ছে।

কবির স্ত্রী তুখড় মহিলা। ইংরেজির ঝড় বইয়ে যান, কথা বলতে পেলে আর কিছু চান না। ওটা বোধ হয় নারীমাত্রেরই দস্তুর। এবং মানুষ খাওয়ানো। কবিও বলেন ইংরেজি—ভাঙা-ভাঙা একটা-ত্বটো বাক্য ছেড়ে থমকে যান, পরখ করে দেখেন কী রকমটা দাঁড়াল, সতর্ক ভাবে আবার শুরু করেন। কম শোনেন বলে কানে যন্ত্র লাগানো। ভারতীয় সাহিত্যের খবর শুধালেন আমাদের কাছে।

দেখুন দিকি, যেন ত্ব-এক কথার ব্যাপার—সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে জবাবটুকু সেরে পরের টানটা দেব। চোদ্দ রকম ভাষাই তো সরকারি ফরাসের উপর জাঁকিয়ে আসন নিয়ে আছে। আনাচে-

কানাচে কত আরো উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে, গোনাগুনতি নেই। ভারত দেশটা তোমাদের এই এক টুকরো জর্মনি ভেবেছ বুঝি ?···

খবরদার, অমনি-কিছু মুখে এনেছেন তো গোল্লায় গেলেন আপনি একেবারে। চারজন লেখক আমরা দল হয়ে এসেছি। দলের মধ্যে ঐ মানুষটিকে দেখে নিন। দেখে শিখুন। নানান মোকামে ওঁর চলা-ফেরা, ঘাঁতঘোঁত ষোলোআনা জেনেবুঝে বসে আছেন। সাহিত্যের প্রশ্নটা শেষ হতেও দিলেন না, গড়্গড় করে আপ্তবাক্য ছেড়ে যাচ্ছেন। দম নিতে একটি লহমা থামলেও হয়তো বা ওরা নাক সিঁটকাবে: লোকটার পাণ্ডিত্যে নিশ্চয় খুঁত আছে—নয়তো থামছে কেন এই সিকি মিনিট ? ঐ কার্য অতএব কদাপি নয়। আরে মশায়, কেউ টুকে রাখছে না আপনার কথা। টুকে নিলেও ছেপে দিচ্ছে না। ছাপলেও পুনশ্চ যে আপনার স্বভাষায় তরজমা করে আপনার দেশে পাঠিয়ে যাচাই করবে, এমন আশঙ্কা নেই। সঙ্কোচ কিসের তবে ? বিদেশে গিয়ে সবজান্তা হতে হয়। কোন দিক দিয়ে কার কোন প্রশ্ন আসবে, ঠিকঠিকানা নেই। বেদের ব্যাখ্যা থেকে বেতো-রুগীর চিকিৎসা—সমস্ত জিহ্বাগ্রে থাকবে।

মনে মনে বুঝলেও কানে তবু সুড়সুড়ি দিচ্ছে। হেসে না ফেলি। কবিপত্নী এদিকে অনলস ভাবে প্লেটের উপর খাবার ঢালছেন। ঐ যে বললাম, খাওয়ানো মেয়েদের বিষম এক বিলাস। মানা শুনবেন না, শোনাতে গেলে তবে তো হাতাহাতি করতে হয়। তখন এক পন্থা—কথায় বসিয়ে অন্যমনস্ক করে দেওয়া। আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে অগত্যা সেই মোক্ষম পথ ধরলাম: ওঁরা ওদিকে মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ ইত্যাদি মেলাচ্ছেন। ঐহিক কথায় আসুন দিকি ফ্রাউ। সাহিত্য করে হয়-টয় কী রকম ? আমার বঙ্গদেশ আপনাদের জর্মনির মতোই দু-টুকরো হয়ে গেছে। বেশির ভাগ ভিন্ন রাষ্ট্র। তবু বলব, পাঠকদের দয়ার সীমা নেই। অশন-বসন তাঁরাই যোগান। ভালোমন্দ যা-ই লিখি, তাঁরা খুশি মনে নেন।

ব্যস, ওষুধ ধরে গেছে। খাবার ঠেলে দিয়ে ফ্রাউ চেপে বসলেন। একগাদা কথা বলার মওকা মিলেছে, আবার কী।—কেষ্ট-বিষ্টু লেখকেরা এদেশে পনেরো পার্সেন্ট রয়্যালটি পান; রামা-শ্যামারা দশ। নতুন লেখকের শুধুমাত্র বই লিখে চলে না, আরও কিছু করতে হয়। সে পথ ঐ লেখক হওয়ার দরুন আপনা-আপনি খুলে যায়। ধরুন, খবরের কাগজের সাব-এডিটারি। কিংবা সরকারের সংস্কৃতি-বিভাগ আছে, তার কোনো কাজ।

আমার দেশের সঙ্গে প্রায় মিলে যাচ্ছে, কী বলেন?

নবেলের কাটতি খুব। পঞ্চাশ হাজার—চাই কি, এক লাখ ছেপে ফেলবে একেবারে। লক্ষ্মীঠাকরুন তো কেনা বাঁদী ক-জন নবেল-লিখিয়ের কাছে। যেমন, আনা সেগরস; স্টেফান হাইম। দু-হাতে পয়সা কুড়িয়ে ওঁরা কূল পান না, দেদার ফেলে-ছড়িয়েও শেষ হয় না। অথচ কবিতার বাজার হা-হা করছে। বর্ডারটুকু পার হয়েই চেকোস্লোভাকিয়া—এক ফোঁটা দেশ—কবিতার বই ছাপে সেখানে কমপক্ষে দশ হাজার করে। আর এই পোড়া জর্মনির গতিক দেখুন। এ-বাড়ির এই কবি মশায়—দেশজোড়া নাম, দেশের বাইরেও নাম গিয়েছে—শুধু কবিতার উপর থাকলে আধপেটা খেতে হত আমাদের। এখানকার সংস্কৃতি-বিভাগের বড় কর্তা—সেই চাকরির পয়সায় ঘরবাড়ি, লাইব্রেরি, আসবাবপত্র, যত-কিছু দেখতে পাচ্ছেন।

শেষটা আচ্ছা রকম জমে গেল। সাহিত্য চুকেবুকে সরাসরি পরনিন্দা। জাত তুলে বলছেন ইংরেজদের। ডাহা জংলি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে দুটো পয়সা করেছিল, সে-ও তো ফুঁকে যাবার দাখিল। 'কলোনি চাই' রব তুলে দিয়ে মানুষ খেপিয়ে এ যুগেও ইলেকশন জেতে। তামাম ইয়োরোপের মধ্যে কুলীন বলতে আমরা দুটি—আমরা জর্মন, আর পাশের ফরাসি দাদারা। আমাদের আছে বিজ্ঞান, ওদের শিল্প-সাহিত্য। গড়ে বছর কুড়িক অন্তর আমরা লড়াইয়ে

মাথা ভাঙাভাঙি করে উড়িয়েপুড়িয়ে সমস্ত রসাতলে দিই; আবার গড়ি বিলকুল নতুন করে, সেই সঙ্গে মতলব খাটাই কী করে ফের ওদের মাথা ভাঙব। ওরাও ভাবে তাই। তা সত্ত্বেও বনেদি আমরা। ইংরেজদের কী ছিল—বলো তো? জর্মন আর ফরাসি জাতের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়েই মানুষ।

সন্ধ্যার মুখে দলের ওঁরা আবার বেরুলেন। গাড়ির গরজ নেই, পায়ে হেঁটে চক্কোর দিয়ে বেড়াবেন। দেখাশুনোর যাবতীয় প্রোগ্রাম কাল দিনমানে, এখনকার এটা ফাউ। আমি হোটেলের ঘরে—সর্বক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় থাকলে লিখি কোন সময়? এতসব ভালো ভালো জায়গায় ঘুরছি, শয়তানিটা তবু ষোলো আনা বজায় আছে। লিখে রাখছি—দেশে ফিরে এক-এক কিস্তি ছেড়ে নাস্তানাবুদ করব আপনাদের।

পাশের কামরায় লিজেলের জায়গা—একটা দেয়ালের ব্যবধান। সে-ও যায় নি। রয়ে গেছে—আমাকে সে খাওয়াবে। খাওয়াবে মানে কি হাতে তুলে নিয়ে মুখবিবরে পুরে দেবে? প্রায় তাই। খানা-টেবিলে মেনু দিয়ে যায়—বিলকুল জর্মন ভাষায়। আপনারা এক মূর্খস্য মূর্খকে পাঠিয়েছেন, রকমারি খাদ্যতালিকার ভিতরে খুঁটে বেছে নেবার বিদ্যেটুকু যার নেই। পরিপাটি একটা নাম দেখে মুখে তুলতে গেলাম—ষাঁড়ের লেজের ডালনা। অথবা গোবৎসের মুড়োর তরকারি। উপাদেয় বস্তু সন্দেহ নেই, কিন্তু ডাল-ভাতের দুর্বল পাকস্থলী সামাল দিতে পারবে কি না সন্দেহ হয়। অন্নপ্রাশনের দিন যে-অন্ন মুখে দিয়েছিলাম, সেই ক-টি সুদ্ধ যদি বেরিয়ে চলে আসে? এই কারণে লিজেলের প্রয়োজন।

হোটেলের সামনে মার্কেটপ্লেস—বাংলায় কী বলবেন, বাজার-খোলা? সে বস্তু নয় কিন্তু। আস্ত বাজার চুলোয় যাক, একটা আলপিন কিনবারও দোকান পাবেন না চৌহদ্দির ভিতর। দালান-

কোঠায় ঘেরা মাঠ একটুকু। ইয়োরোপের দেশে দেশে বিস্তর মার্কেট-প্লেস দেখলাম এই ধরনের। মরসুমি ফুল ফুটে আছে ঐ একদিকে,—সেই হিসাবে বরঞ্চ এটাকে পার্ক বলতে পারেন। অনেক মার্কেটপ্লেস দেখেছি, একেবারে ন্যাড়া। লিখে যাচ্ছি কাচের জানলায় বসে। কিন্তু লিজেলের গতিক কী—আটটা বেজে যায়, এখনো ডাকল না ?

বাইরে সাড়া দিতে যাই। জনমানব নেই হোটেলের এই তিন-তলায়। খানাঘরের ক্রিয়াদি হচ্ছে, অথবা খানাপিনা অন্তে লাউঞ্জে গুলতানি চলছে। আধেক-আঁধার নির্জনতায় লিজেলের দরজায় টোকা দিতে সঙ্কোচ হয়—কী করি, কী করি ? টেলিফোনেই সাড়া নেওয়া ভালো।

এ-ঘর ও-ঘর, মাঝে পাতলা দেয়াল। উঁচু গলায় ডাকলে এমনিই হয়তো সাড়া দেবে। তবু ফোনের মুখে কথা : ডিনার সেরে এসেছ নাকি লিজেল ? একা-একা ?

—ইস রে! দেরি হয়ে গেল বড্ড তোমার। বাইরে চলে এসো এক্ষুনি। লিফটের কাছে দাঁড়াও। দু-মিনিটের ভিতর আমি যাচ্ছি।

মেয়েদের দু-মিনিট কী বস্তু, সর্বজনে জানেন। অতএব কাগজ-কলম গুছিয়ে রেখে সেই আন্দাজে তৈরি হচ্ছি। কিন্তু দশ মিনিট না হতে আমারই দরজায় ধাক্কা।

—কী আশ্চর্য, এখনো ঘরে তুমি ?

—কী আশ্চর্য, এরই মধ্যে তোমার দু-মিনিট ?

সলজ্জে লিজেল বলে, দেরি হয়ে গেল। চিঠি লিখছিলাম।

—কী এমন চিঠি গো—খাওয়ারও হুঁশ থাকে না ?

মুখ আলগা, জানেন তো, ওদেশের মেয়ের। এমন ঠোকরের পর আর তারা রেহাই করবে না। বলে, প্রেমপত্র। কিন্তু তোমায় নয়, তোমাদের কাউকেই নয়। অত লোভ কোরো না।

হেসে উঠে সেই সুরেই জবাব দিতে হয় : হাতের কাছে রয়েছি আমি। পত্রের কী দরকার ? বাড়তি লোভ কেন করতে যাব ?

কথাবার্তায় এই। কিন্তু সন্ধ্যার সময় মেয়েটা নিজের ঘরে ঢুকে আর-এক মানুষ হয়ে যায়। চিঠি লেখে বার্লিনে স্বামীর কাছে। রোজ লেখে। সবাই আমরা জানি, ঠাট্টাতামাশা করি। বার্লিনে ফোন করে। বাচ্চা ছেলে রেখে এসেছে স্বামীর কাছে। বেলা ডুবে ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়, তখন সে মেয়ে আর কারো নয়—অনেক দূরের এক বাচ্চাছেলের মা।

খানাপিনার হুল্লোড়, তার মধ্যে একটা টেবিল একেবারে ফাঁকা, ছোট্ট একটু ভারতীয় পতাকা টেবিলের উপরে। আমাদের জন্য আলাদা করে রেখেছে।

এক ব্যক্তি খানাঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক উঁকিঝুঁকি দিয়ে সটান এই টেবিলে চলে এলেন। লিজেলের সঙ্গে বাতচিত হল। লিজেল পরিচয় দেয়, সংস্কৃতি-দপ্তরের লোক—এখানকার স্থানীয় কমিটিতে আছেন। বার্লিন থেকে খবর দিয়ে পাঠিয়েছে, তাদের হয়ে ইনি খোঁজখবর নিতে এসেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, কিছু দরকার-টরকার আছে? কী করতে পারি আমি বলো।

সমান মেজাজে আমিও জবাব দিই, তোমার কী দরকার বলো? আমি কী করতে পারি?

উচ্ছ্বসিত হাসি উঠল। বললাম, সাহায্য করতে এসেছ, উঁ, ভিনদেশি লোক অসহায় হয়ে পড়ে আছি—এই বিবেচনায়? সে মশায় পয়লা দিন বার্লিনে নেমে ঘণ্টা কয়েক মাত্র ছিলাম। এখন তো তোমাদের চেয়েও জোরের জায়গা। বসে পড়ো ইদিকে, ডিনার খেয়ে যাও। নিদেনপক্ষে কফি এক বাটি। কিছু করতে চাচ্ছিলে—এ ছাড়া অন্যকিছু করবার দেখছি নে।

অবাক লাগে সময় সময়। কোনো পুরুষে যাদের জানতাম না, এত সহজ হলাম কেমন করে তাদের সঙ্গে? হাসিঠাট্টা গল্পগুজব—আজীবন যেন একসঙ্গে রয়েছি। আজ আমি যদি শক্ত অসুখে পড়ি

—ভাবতে আনন্দ লাগে—এরা আমার বিছানার ধারে বিষণ্ণ উদ্বেগে বসে বসে রাত্রি জাগবে। যদি মরে যাই, মৃতদেহ ঘিরে চোখ মুছবে। মানুষ এমন ভালো, ভুবনের অজানা অঞ্চলে এত ভালোবাসা বিছানো আছে, সামনাসামনি না গেলে কোনোদিন এ বস্তু ধারণায় আসে না।

সতেরো

ঘুম ভেঙে আবার সেই জানলায়। মিষ্টি স্বপ্নে রাত কেটেছে। ঘড়িতে আটটা। ভোর হয়েছে পাঁচটারও আগে, মানুষজন এখনো পুরোপুরি জাগল না। ফুল ফুটেছে—হলদে বেগুনি ঘননীল—সেই ফুলের গাদার মধ্যে বেঞ্চির উপর কয়েকটা লোক বসে। বাস এসে থামল হোটেলের এই দিকটায়—জন দুই-তিন বাস থেকে নেমে হোটেলের ফোটো তুলছে। বড় লোমশ কুকুর নিয়ে একটা ছেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গির্জা অদূরে—লাল টালিতে-ছাওয়া উঁচু মাথা, ঠিক আমাদের বাংলা-ঘরের মতো। আরও পিছনে প্রাচীন টাওয়ারের মস্তবড় চূড়া দেখা যায়। জানলার সামনাসামনি মার্কেটপ্লেসের ওদিকটায় এক মূর্তি। ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে পড়লাম, কাছে গিয়ে মূর্তি তখন ভালো করে দেখি। ত্রিশূল হাতে নেপচুন। অবিকল আমাদের শিবের ত্রিশূল। দাড়ি না থাকলে মূর্তিটাকেও শিব মনে করা যেত। নেপচুন সমুদ্র-দেবতা—দু-পায়ের ফাঁকে শিশু একটা, আরও কিছু নিচে মকর-মুণ্ড—জল ঝরছে সেখান থেকে। সেই জল নিয়ে একদল বাচ্চা ছেলে খেলা করছে, এ-ওর গায়ে জল ছিটাচ্ছে। কয়েকটি বড্ড ছোট, জল অবধি হাত পৌঁছয় না, ডিঙি মেরে প্রাণপাত চেষ্টা করছে জল নেবার। একটিকে তার মধ্যে কোলে তুলে ধরলাম। হাসি-ভরা চোখে আমার পানে তাকিয়ে ইশারা করছে, মকরের মাথার কাছে বসিয়ে দাও—কাঁহাতক এই ভাবে তুলে ধরে রাখবে? ঐটুকু বাচ্চা ধরে ফেলেছে, ওর মুখের কথা বুঝবার মতন বিদ্যেবুদ্ধি নেই। হায় ভগবান, মূর্খতা দুনিয়ার কোথাও চাপা থাকবে না? এটিকে বসিয়ে দিতে গোটা চারেক অমনি একসঙ্গে গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উপরমুখো হাত তোলে। আরও বাচ্চারা দেখি অদূরে ভিড়ের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। অর্থাৎ এই খেলা চলুক এখন

সারা বেলা ধরে, গ্যেটে-শিলারের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। বেঞ্চির লোকগুলো হেসে খুন বিদেশি আর বাচ্চাদের কাণ্ডকারখানা দেখে।

চং চং করে গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠল। বাজছে তো বাজছেই—থামে না। ওঃ, আজকে পরবের দিন। কাজের চাড় দেখছি নে ভাই, চতুর্দিকে গয়ংগচ্ছ ভাব। লীবার্গের কাছে শুনলাম ফাদার্স-ডে আজ—ভিরিশে মে। প্রভু যীশু ক্রুশ থেকে উঠে এইদিন স্বর্গে গমন করেছিলেন।

গ্যেটের বাড়ি ও মিউজিয়ম। বোমা পড়েছিল, মেরামত করে আবার আগের মতো হয়েছে। কী হাল হয়েছিল তার ফোটোগ্রাফ সিঁড়ির মুখে টাঙিয়ে রেখেছে। এ-বাড়িতে গ্যেটে ছ-বছর কাটান। মারাও যান এখানে। শিল্পবস্তু-সংগ্রহের বাতিক ছিল—ছোটখাট এক মিউজিয়ম নিজের বাড়িতেই বানিয়ে গিয়েছেন। ইটালি থেকে স্পেন থেকে অনেক ছবি আনানো। ষোলো শতকের নানা জিনিস। গ্রীক-পুরাণ ও বাইবেলের ছবি। ইংলণ্ডের ব্ল্যাক-প্রিন্সকে নিয়ে হরেক ছবি—নাম-করা শিল্পীদের আঁকা। পম্পের ধ্বংস থেকে পাওয়া পুরানো ছবির কপি। গ্যেটের সময়কার রকমারি ছবি। চিনামাটির বাসনের উপর পরিচিত্রণ। ব্যঙ্গ-ছবি কতকগুলো—দেখে মজা লাগে। একটা হল জর্মন সাহিত্যিকদের নিয়ে—এ-ওর মাথায় মুকুট পরিয়ে দিচ্ছে। আমাদের বাংলায় একটা কথা উঠেছিল প. পি. চু. স. অর্থাৎ পরস্পর-পিঠ-চুলকানো-সমিতি—সেই ব্যাপার আর কি। শুধুমাত্র লেখক নন গ্যেটে, বড় রাজনীতিকও। মন্ত্রীগিরি করেছেন দশ বছর। সর্ব ব্যাপারে কৌতূহল—অবাক হয়ে যেতে হয়। আশি হাজার রকমারি পাথর সংগ্রহ করেছেন বোহিমিয়া অঞ্চল ঘুরে ঘুরে; পাথর নিয়ে চর্চা করতেন। বাদ্য-যন্ত্রের সংগ্রহ—রকমারি সুরের চার্ট করা রয়েছে। কঙ্কাল ও ফসিলের সংগ্রহ। গ্রহনক্ষত্র দেখার যন্ত্রপাতি

ও চার্ট। বিদ্যুৎ-শক্তি নিয়ে গবেষণার যন্ত্র। নানা রকমের মাটি—মাটি নিয়েও তিনি গবেষণা করতেন।

খাবার ঘর, শোবার ঘর, পড়ার ঘর। অতিথি এলে যে ঘরে থাকতে দিতেন। এক ঘরের দেয়ালে এক রকমের রং। রং নিয়েও বিস্তর চিন্তা করেছিলেন—কোন রঙে কাজে মন বসে, কোন রঙে গুলতানি করতে ইচ্ছে করে। পাঁচ হাজার বই লাইব্রেরিতে। ছিমছাম চারিদিক, প্রতিটি জিনিস সাজিয়েগুছিয়ে রাখা। বেড়ানোর সময় কাপড়ের চেয়ার হাতে করে নিতেন, ঘাসের উপর পেতে বসতেন। চেয়ারটা ভাঁজ করে রেখে দিয়েছে। মন্ত্রী হয়ে চোঙার মতন টুপি ও লম্বা কোট পরতেন, তা-ও রয়েছে। লিখবার ঘরে গেলাম। এখানে সাধারণে ঢুকতে পায় না, আমাদের আলাদা খাতির। পাখনার কলম, ঢাউস দোয়াত। পুরানো বই খানকয়েক। ঘড়ি। কাচের তৈরি নেপোলিয়নের ছোট মূর্তি। আর একটি গ্লোব। গ্যেটের লেখার টেবিলে এই দেখছি—শিলারের টেবিলেও দেখলাম গ্লোব। আর শুনেছি, আমাদের জওহরলালের ঠিক এই রকম। দৃষ্টির সামনে বিশ্বভুবন। লেখা তাই কখনো সঙ্কীর্ণ হয় না। স্বল্প জীবন-সীমায় ভুবনের সকল-কিছু জেনে নিতে চান এই দিকপালেরা। শুধু এক ফাউস্ট লিখবার জন্যই কত পড়াশুনা, কত রকমারি বস্তুর সংগ্রহ। থিয়েটারে ফাউস্ট হবে, ভাবনাচিন্তা করে তার সিনারির অভিনব নকশা তৈরি করেছেন। প্রতিদিনের ডায়েরি লিখতেন। একটা তারিখ দেখতে পাচ্ছি—১৮ জুলাই, ১৮৩৩। ফাউস্ট রচনা শেষ হল ঐ দিনে—লেখা রয়েছে। লিখবার ঘরের গায়েই সঙ্কীর্ণ একটু খাট। স্ত্রী-বিয়োগের পর এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই খাটের উপর মৃত্যু হয়।

গ্যেটের বাড়ির অদূরে সেকেলে পানশালা। পুরু দেয়ালের ছোট ছোট নিচু ঘর—দুয়ার-জানলা অতি সংক্ষিপ্ত, দিনমানেও আলো

জ্বেলে রাখতে হয়। গ্যেটে-শিলার এবং এই অঞ্চলের তা-বড় তা-বড় ব্যক্তিরা ফুরসত পেলেই এখানে এসে জমতেন। অতএব দ্রষ্টব্য স্থান। দরকার ছিল না, তবু কফি নিলাম এক বাটি। পুরানো দেয়ালে ঠেস দিয়ে কফিতে চুমুক দিতে দিতে সেকালের মতন কিঞ্চিৎ মউজ করবার বাঞ্ছা। কিন্তু নিরীহ কফিতে সে জিনিস হয় না, সেই পুরুষ-সিংহের দল শুধুমাত্র কফি খেতে ঢুকতেন না এখানে।

তারপর গ্রাম দেখেশুনে বেড়াচ্ছি। ভীমকায় ক্যাসল—অনেক দূর থেকে যার চূড়া দেখতে পাই। অনেক শতাব্দীর ঝড়-জলে বরফে কটকটে কালো হয়ে আছে। চূড়ার মাঝামাঝি প্রকাণ্ড ঘড়ি। ক্ল্যাসিকাল সাহিত্য নিয়ে গবেষণার এক প্রতিষ্ঠান ভিতর দিককার অনেকগুলো ঘর নিয়ে। ঠিক জায়গা বেছেছে বটে—বাড়ির কারুকর্মও ক্ল্যাসিক্যাল ধাঁচের। গম্ভীর আভিজাত্যময় চেহারা। পাথর-বসানো এবড়ো-খেবড়ো প্রকাণ্ড উঠান; একদিকে কাঠের পাটাতন বানিয়ে স্টেজ করেছে। স্টেজের সামনে সারি সারি বেঞ্চি। মুক্ত আকাশের নিচে ক্ল্যাসিকাল নাট্যাভিনয়ের আসর বসে এই জায়গায়।

হাঁটতে হাঁটতে ইলমের কিনারে এসেছি। ঘরোয়া পোষ-মানা নদী—দু-পারের গাছপালা ঝুঁকে এসে পড়েছে—এক চিলতে জলের আঁচল বিছিয়ে নদী যেন গুটিসুটি হয়ে ছায়াতলে ঘুমিয়ে আছে। কূলের উপর জলের গা ছুঁয়ে রাস্তা। ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বসে গেছে ঐ রাস্তার পাশে। আমাদের গাঁ অঞ্চলে ঠিক যেমন ধারা দেখি। এমনি সব নদী ছোট্ট বয়স থেকে কত দেখছি। পুলের উপর ছেলেরা একপায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে। হঠাৎ আমার মনে হল, পাকিস্তানের ভিতর আমার কৈশোরের গাঁয়ে চলে এসেছি। হাজার হাজার মাইল দূরের মধ্য-ইয়োরোপে ঘুরছি, নদীর পুলের উপর এমনি জায়গায় দাঁড়িয়ে সে-কথা একেবারে ভুলে যেতে হয়।

পুল পার হয়ে চওড়া খোলা রাস্তা। অঞ্চলটা পাহাড়ময়—দু-

পাশের ঘরবাড়ি ও রাস্তা ক্রমশ উঁচুর দিকে উঠছে। চড়চড়ে রোদ। ইয়োরোপ শীতের দেশ বলে ধোঁকা দিয়েছিল, পশমের একগাদা সাজপোশাক বয়ে এনেছি, সেই বোঝা অঙ্গে চাপিয়ে উঠতে হচ্ছে। ঘামের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, আর পারি নে।

পথের এক মানুষকে লীবার্গ জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ মশায়, আর্কাইভ কত দূর?

—কী সর্বনাশ! এ পথেই তো নয়। অনেক দূরে এগিয়ে এসেছ। বাঁয়ের গলিতে ঢুকে ঘুরে ঘুরে আবার নদীমুখো চলে যাও। সেইখানে পাবে।

ফিরে চললাম। জর্মনির গ্রামযাত্রা চোখের উপর। ঘোড়ায়-টানা গাড়ির জোয়াল খুলে কাঁচা গমের আঁটি নামিয়ে গাদা করছে—এ গম ভালো হল না—কেটে এনেছে পশুখাদ্য হবে বলে। বাড়ির গিন্নি, দেখছি, সবজিখেতে বিদে টেনে মাটির ঘাস-কাঁকর বেছে ফেলছেন। বিকালবেলা পরবের সং বেরুবে, এক পাল ছোকরা সেই আয়োজনে মত্ত। হাঁটতে হাঁটতে নদীর কাছে ফিরে এসে আর্কাইভ পেলাম—গ্যেটে-শিলার আর্কাইভ। আমরা যেখানটা পুল পার হয়েছি, সেখান থেকে দূরে নয়। এতটা পথ মিছামিছি হাঁটা। গ্যেটের কাগজপত্র ১৮৮৫ অব্দে আনা হল এখানে। দু-শ বাক্স ঠাসা বোঝাই। শিলারের কাগজপত্র অনেক কম। তা ছাড়া নীৎসে এবং আরও জন ষাটেকের কাগজপত্র আছে। আর্কাইভের কাজ হল দুষ্প্রাপ্য কাগজপত্র সংগ্রহ করে আনা, এমন ভাবে রাখা একটি টুকরো যাতে নষ্ট না হয়, আর এইসব দুর্লভ বস্তু লোকে যাতে দেখতে পায় তারও ব্যবস্থা করা। প্রকাণ্ড বাড়ি, বড় বড় থাম। ছেলেমেয়েরা বসে গবেষণা করছে, তার জন্য নিরিবিলি ব্যবস্থা। পিছনের বাগানটুকু নদী-জলে শেষ হয়ে গেছে। দোতলায় ঐদিকের বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়াই। গাছপালার ফাঁকে গির্জার চূড়া। আজকে ছুটির দিনেও ফ্যাক্টরির ধোঁয়া উড়ছে, কলকল শব্দে ফ্যাক্টরির জল

এসে পড়ছে নদীতে। মুরগি ডাকছে। পাখির কিচিমিচি গাছে গাছে। উঁচুনিচু দিগ্‌ব্যাপ্ত সবুজ মাঠ। বোমায় এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা চুরমার করে দিয়েছে, তার বিপুলব্যাপ্ত কঙ্কাল মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছে। নাৎসিরা এক বিরাট হল বানাচ্ছিল, সংস্কৃতি-ভবন— ভবন শেষ হবার আগে নিজেরা নিশ্চিহ্ন। লীবার্গ কখন পাশে এসেছে, আঙুল দিয়ে আরও দূরে দেখায়: পাহাড়ের নিচে সবুজ অরণ্যের ওধারে ঐ যে বুকেনওয়াল্ড—নাৎসিদের কনসেনট্রেশন-ক্যাম্প। যার নামে ছুনিয়ার মানুষ শিউরে ওঠে এখনো। জর্মনিতে এবং জর্মনির বাইরে ক্যাম্প আরও বিস্তর বানিয়েছিল। কিন্তু গ্যেটের এই পুণ্যভূমির পাশে বুকেনওয়াল্ড সকলের সেরা।

ঘরের ভিতরে এক ছোকরা স্কলার মহোৎসাহে গ্যেটের পাণ্ডুলিপি দেখাচ্ছে। অন্যকে দিয়ে কাপি করানো। পুরানো চিঠিপত্র— হাতের মাথায় যা পাওয়া গেছে, তার উপরে চিঠি লিখেছেন। থিয়েটারের প্রোগ্রামের উপরেও লিখেছেন, দেখতে পাচ্ছি। ফাউস্টের প্রথম সংস্করণ। রোজ যা আয় হত, আর যত মার্ক খরচ করতেন, সমস্ত লিখে রাখতেন। পঞ্চাশ বছরের এমনি জমাখরচ রয়েছে। গ্যেটের হাতের লেখার প্রতি পৃষ্ঠা এখন দু-হাজার মার্ক অবধি বিক্রি হতে পারে। জালিয়াতেরা অনেক সময় পাণ্ডুলিপি জাল করে টাকার লোভে। শিলারের জাল লেখা দেখাল আমাদের—আসলের পাশে রেখে মেলাই। আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। ছোকরা একটা-দুটো জায়গায় দেখিয়ে দিল, তখনই ফারাক বুঝতে পারি।

বিস্তর বেলা হয়ে গেছে। লাঞ্চ সেরেই ভাইমার ছাড়ব। ঠাসা প্রোগ্রাম। বুকেনওয়াল্ড তো আছেই। ন্যুমবার্গের গির্জা—যার ভাস্কর্য ছবি ও কারুকার্য দেখতে দেশদেশান্তরের লোক আসে। পাঁচটার পরে গির্জায় ঢুকতে দেয় না, অথচ অনেক দূর এখান থেকে। জেনা শহরে ক্যামেরাওয়ালা কার্ল জাইসের বিরাট কারখানা, সেখানে যাবার বাঞ্ছা আছে। তার পরে লাইপজিগ। ঐ শহরে থাকব

কয়েকটা দিন। লাইপজিগ আপনারা খুব জানেন—মেলা এবং বইয়ের ছাপাছুপির জন্য ভুবন-জোড়া নামডাক। কিন্তু শিলারের বাড়িটা দেখা হল না যে এখনো ?

ছুটেছি আবার নদী পার হয়ে। হোটেলের কাছেই। ছোট বাড়ি, সময় বেশি লাগবে না। শেষ তিন বছর শিলার এই বাড়িতে কাটান। এখানেই মারা যান। খুব তাস খেলতেন। ব্রিজ-খেলার টেবিল ও জোড়া জোড়া তাস। গ্যেটেকে লেখা চিঠি ও গ্যেটের জবাব। থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল—১৮০৮ অব্দে তাঁর নাটক উইলিয়াম টেলের অভিনয় হল, হ্যাণ্ডবিল থেকে জানা যাচ্ছে। গ্যেটের মতোই ডায়েরি রাখতেন। মৃত্যুর পরের ফোটো। লিখবার টেবিলে ঘড়ি ও গ্লোব। কাচের আলমারি-ভরা রকমারি মদ্যপাত্র ও চায়ের বাসন।

রাস্তায় পড়ে এগোবার পথ পাই নে। পরবের সং বেরিয়েছে —দু-তিন-শ বছর আগেকার আজব সাজপোশাকে ছোঁড়াগুলো। গোঁফ পরেছে কেউ কেউ, হাতে তলোয়ার। বাজনাবাদ্যি—কানে তালা ধরে যায়। মানুষ যে যেখানে ছিল, ঝেঁটিয়ে এসেছে। সারা গ্রাম চক্কোর দিয়ে সঙের দল তারপর ভিনগাঁয়ে দেখাতে যাবে। ভিনগাঁয়ের দলও আসবে এদের গাঁয়ে।

আঠারো

ভাইমারে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে বিকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম। বুকেনওয়াল্ড প্রথমে।

নাম শুনেছেন লড়াইয়ের সময়, এখন হয়তো মনে পড়ছে না। পাহাড়ের সানুদেশে জঙ্গল-ভরা অঞ্চল—তার মধ্যে অনেকটা জায়গা সাফসাফাই করে পাঁচিলে ঘিরে পাঁচিলের মাথায় পুনশ্চ কাঁটা-তারের বেড়া তুলে ভিতরে ঘরবাড়ি বানিয়ে নাৎসিরা কনসেনট্রেশন-ক্যাম্প বানিয়েছিল। ক্যাম্প তিন-শ ছিল মোটমাট। পোল্যাণ্ডে ছিল, চেকোস্লোভাকিয়ায় ছিল। তার মধ্যে সকলের সেরা বুকেনওয়াল্ড।

গাড়ি ছুটেছে, হঠাৎ দেখি রাস্তা বন্ধ। মাটি খুঁড়ে পাহাড় জমিয়েছে রাস্তার উপর। পুল হবে, নিচে দিয়ে রেলের রাস্তা বসাবে নাকি। বড় রাস্তা ছেড়ে অতএব মেঠো পথ ধরা গেল। গাড়ির কালো রঙ ধুলোয় ধুলোয় ধূসর হয়েছে। ঘ্যাস করে ব্রেক কষে আগের গাড়ি থামিয়ে দিল হঠাৎ। ড্রাইভার নেমে পড়ল।

—কী গো ?

—পথ নেই ওদিকে। জল। গাড়ি পিছিয়ে নাও, ভুল পথে আসা হয়েছে।

—কী মুশকিল! লীবার্গ, কী বলো? পথ নেই বলছে, তবে এদিকে এলাম কেন ?

লীবার্গের বাড়িও এ-তল্লাটে নয়। আগে দু-একবার এসে গেছে। কিন্তু না এলেই বা কী? জায়গা ও মানুষজন নখদর্পণে আনতে তার পক্ষে পাঁচ মিনিটের অধিক লাগে না। এমন কর্মিতকর্মা লোক দেখি নি। নতুন জায়গায় এসে পলকের মধ্যে এমন হয়ে যাবে যেন সে চিরকালের বাসিন্দা। এ লোকের সঙ্গে ঘুরে আরাম আছে।

কিন্তু লীবার্গ যেন কানে শোনে না। মুখ ফেরানো অন্য দিকে। আশ্চর্য লাগে, এ রকম হবার কথা নয়।

—হল কী তোমার? গাড়ি তবে পিছিয়ে নিয়ে যাবে?

—হুঁ। বাঁয়ে ঘুরবার কথা, তা নয় সোজাসুজি এসে পড়েছে। আমি অতটা খেয়াল করতে পারি নি।

—আজকে তোমার কী হয়েছে বলো দিকি লীবার্গ?

তখন মুখ ফেরাল। কণ্ঠস্বর কাঁপছে। বলে, আমার মা বাপ আর দুই বোনকে আটকে রেখেছিল ঐ বুকেনওয়াল্ডে। ছোট্টবয়সে মা মারা যান, তিনি সৎমা—কিন্তু আপন মায়ের বেশি। তারপরে কী হল কেউ জানে না।

—কোনো খবর পাও নি?

—কনসেনট্রেশন-ক্যাম্পের খবর পাওয়া যায় না, আন্দাজে বুঝে নিতে হয়।

বলতে বলতে তার দু-চোখ জলে ভরে গেল। কথাবার্তায় আগেই আঁচ করেছিলাম, লীবার্গ জাতে ইহুদি। এর পরে আর সন্দেহ থাকে না। ইহুদি বলেই পরিবারসুদ্ধ ক্যাম্পে তুলেছে, ভিন্ন-কিছু হলে দু-একটি ছুটছাট যেত।

—তুমি নেমে যাও লীবার্গ। এদিকে কোথাও থাকো। ফেরার সময় তুলে নেব। বুকেনওয়াল্ডে গিয়ে তোমার কাজ নেই।

লীবার্গ জেদ ধরল: যাবোই। সে সময়ে যেতে পারি নি। দূর থেকে ভয়ে ভয়ে কাঁটা-তারের দিকে তাকাতাম। তাকিয়ে দেখেই সরে গেছি। আজকে শুনি, ভেঙেচুরে ক্যাম্পের ভিতর চৌরস করে দিয়েছে। এ জিনিস আমি দেখব না, তাই কখনও হয়?

মনটা খারাপ হয়ে গেল। লীবার্গ আছে বসে চুপচাপ। জনবিরল পথ। দু-পাশে জঙ্গল এঁটে আসছে। তারপরে হঠাৎ এক ফাঁকা মাঠ পেয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাম্পের ফটক ঐ যে।

ক্যাম্পের কিছু না থাক, ফটকটি নিখুঁত রেখেছে। মোটর এসে আছে আরও চার-পাঁচটা। ইদানীং এই এক দেখবার বস্তু হয়েছে। বিস্তর মানুষ আসে। টিকিট করে ভিতরে ঢোকে, দু-চার পয়সা ভালো উপায় হয়। একজিবিশন রাখবার খরচাটা প্রায় উঠে আসে।

আজকেও সব এসেছে। ফুটফুটে এক তরুণী এবং দু-তিনটে সহচর—কলেজের পড়ুয়া মনে হয়। ঢোকে নি তারা এখনও, শুরুতে ফোটো তোলাতুলি হচ্ছে। হেসেই খুন, তা ছবি তোলে কেমন করে? কিসের হাসি তোমাদের গো? জর্মন জানি নে, বাংলা করে বুঝিয়ে দাও। বোঝাবার কী—এই ভাষা তো দুনিয়াজোড়া। চঞ্চলা শিখা আর বিমুগ্ধ পতঙ্গদল। আলোটালো মেপে নিয়েছে, ক্লিক করলেই হয়ে যায়। কিন্তু মেয়েটা গোলমাল করে ফেলে। হাত নাড়ে কিংবা মাথা ঝাঁকিয়ে চুলের গোছা মুখের উপর এনে ফেলে, অথবা হেসে ওঠে খিলখিল করে। কিছুতে হয় না। তখন রাগ হল বুঝি মেয়ের—ক্যামেরা কেড়ে নেয়। সে তুলবে ছবি ঐ ছোঁড়াগুলোর। তারাই বা হতে দেবে কেন? পুরুষ হয়েছে বলে কি মানমর্যাদা থাকতে নেই? এই ঝগড়াঝাঁটি। তারপরে আমরা ঢুকছি দেখে ক্যামেরা গুটিয়ে তারাও পিছন পিছন ভিতরে চলল।

ফটক এবং অফিসঘরগুলো ঠিকই আছে। পাশাপাশি গোটা-কয়েক ঘরের পার্টিশন উড়িয়ে দিয়ে সেখানে একজিবিশন করেছে। আসছি—ফিরে আসব আবার এখানে, এদিকে-ওদিকে একটা চক্কোর দিয়ে আসি আগে। পুরোপুরি ঘোরা দুটি ঘণ্টার ধাক্কা—কতটা জায়গা নিয়ে ক্যাম্প তবে বুঝুন। ফটকের দু-দিক দিয়ে টানা পাঁচিল, পাঁচিলের খানিকটা অন্তর পিলার উঠে গেছে—পাহারাদার দিনরাত্রি সর্বক্ষণ পাহারা দিত ওই উঁচুতে দাঁড়িয়ে। পাঁচিলের ভিতর দিকে ভূমির উপরেও কাঁটা-তার, তার সঙ্গে বিদ্যুতের তার জড়ানো। পালাবে কি—তারের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হলেই শব হয়ে সঙ্গে সঙ্গে

ভূতলে পতন। চতুর্দিক ঘিরে এমনি ব্যবস্থা ছিল। এখন সামনের এই খানিকটা ছাড়া পাঁচিলের কোনো নিশানা নেই।

আর এই তেপান্তরের মাঠ। ক্যাম্পের প্রায় কিছুই নেই, কিন্তু ঢুকে পড়েই নকশা দেখতে পাচ্ছেন। মাঠের উপর কোনখানে কী ছিল মোটামুটি আন্দাজ পাবেন কল্পনায় ঘরবাড়ি বসিয়ে। নিজে না পারলে বুঝিয়ে দেবার লোক আছে—রোগা-লিকলিকে টাক-মাথা আধ-পাগলা এক প্রৌঢ়। সমস্ত তার জানা ; বলতে বলতে একেবারে খেপে যায়। অতএব ধরেছি ঠিক—এই ক্যাম্পে লোকটা ছিল কয়েক বছর ; ভাগ্যক্রমে বেঁচে রয়েছে। মানুষ নামক জন্তু যাতনা ও হত্যার কী নিখুঁত আয়োজন করতে পারে, লোকটার মুখে শুনে মালুম পাবেন। বাঘে বাঘের ঘাড় ভাঙে না, মানুষে কিন্তু ভাঙে।

উঁহু, ভুল বলা হল। নাৎসির নীতিশাস্ত্র আলাদা। যে মানুষ ভিন্ন-দলের এবং কাজের বাধা, তখন সে আর মানুষ রইল না, নিম্ন-জীব, গোরু-ঘোড়া-ভেড়ার জাতের। গোরু-ঘোড়া খাটিয়ে নাও যদ্দিন পারা যায়। কাজে যখন আসছে না, তখন কী হবে? সৈন্যদের রসদের ভাগ কেটে নিয়ে ওদের মুখে যুগিয়ে যাবে যথানিয়ম?

শত্রুপক্ষের সৈন্য-সেনাপতি বিস্তর ধরে এনেছে। খবরদার, মেরে ফেলো না। ওরা কাজকর্ম জানে, কাজে লাগাও। ক্যাম্পের লাগোয়া কারখানা বানিয়ে ফেলল, লড়াইয়ের অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা। বন্দীদের বাছাই করে ছ-হাজার সেই কাজে লাগিয়ে দিল। তোমার দেশে গিয়ে পড়ব তোমারই হাতের তৈরি অস্ত্র নিয়ে। তোমার আত্মীয়জনকে মারব। অস্ত্র বানাতে চাও না, দল পাকাচ্ছ? আচ্ছা!

ত্যাঁদড় আছে কতকগুলো, আছে ইহুদিরা—

মাপ নেওয়া হবে তোমাদের। কত লম্বা, ওজন কত। মাপের জায়গায় এসে দাঁড়াও। হ্যাঁ, ঠিক। ঘাড়টা তোলো একটুখানি···। হুম—মাপজোপ ঠিক আছে, গুলি এসে বিঁধেছে বুকের মাঝখানে,

এক গুলিতে খতম। টুঁ শব্দটি নেই। সেই জায়গা দেখে এলাম—মাপ নেবার জায়গাটা। পিছন দিককার দেয়াল ফুটো—তার পিছনে অলক্ষ্যে বন্দুক নিয়ে বসবার জায়গা। ফুটোর মধ্য দিয়ে গুলি এসে মোক্ষম জায়গায় বিঁধবে। একটি বাজে নষ্ট হবে না। লড়াইয়ের সময় গুলিগোলার অপব্যয় না হয়, সেজন্য সতর্ক ব্যবস্থা। জায়গাটা ফুল দিয়ে ঢেকে দেয় এখন রোজ।

লড়াই ছড়িয়ে পড়ল দেশ-দেশান্তরে, অবস্থা ক্রমশ সঙ্গিন হয়ে উঠল। গোলাগুলির বিষম টান। ওই যে একটা গুলি একজনের জন্য, তা-ও আর চলে না। তখন একেবারে নিখরচায় ব্যবস্থা। দেখবেন আসুন।

নিয়ে চলল সবসুদ্ধ আমাদের পাতালের দিকে। আধ-অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামছি। কসাইখানায় গোরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে ঢোকায়—দেখেছেন? মানুষগুলোকে এই সিঁড়ি দিয়ে ধাক্কাধাক্কি করে নামাত। মাটির নিচে ঘর—দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অনেকটা। একসঙ্গে অনেক মানুষের ব্যাপার—বড় জায়গা তো চাই-ই। এত বোমা পড়েছে, এ ঘরের কিছু হয় নি। মাটির নিচে বলেই হয়তো। কিংবা কীর্তিচিহ্ন ইচ্ছে করেই অক্ষত রেখেছে দেশ-বিদেশ ও একাল-ভাবী-কালের মানুষ এসে দেখবে বলে। সেই ঘরের দেয়ালের গায়ে অনেক উঁচুতে সারি সারি লোহার আংটা। ফাঁসির দড়ি প্রতি আংটায়। পাইকারি ব্যবস্থা—খেপে খেপে গোটা কুড়িক করে ঝোলানো চলে। এক কুড়ি যখন ঝোলানো হচ্ছে, বাকি সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে ওই ঘরের মধ্যেই। চোখের উপরে পদ্ধতিটা দেখছে। পয়লা খেপের কাজ সারা হলে গলার দড়ি খুলে মড়াগুলো গাদা দিয়ে রেখে আর বিশটা টেনে আনল এদিকে। তাদের পালা। বেয়াড়া-বদখত তো রয়েছে, তারা পরিত্রাহি চেঁচায়। সেই চিৎকার কানে গেলে কাজের মানুষ কারও হয়তো মন খারাপ হবে; কিংবা কায়দাটা বাইরে চাউর হয়ে যেতে পারে—ঘরের পাশে তাই মেশিন বসিয়েছে। তুমুল

আওয়াজ ওঠে সেই মেশিনে। মেশিনের আওয়াজের মধ্যে মানুষের আর্তনাদ ডুবে যায়। কাজকর্ম নিঃশব্দ হল, আওয়াজের মেশিন তখন বন্ধ করে দেয়। ভিন্ন এক মেশিনে ওদিকে মড়ার গাদা উপরতলায় উঠিয়ে নিচ্ছে। অতিকায় ইলেকট্রিক চুল্লিগুলো হাঁ করে আছে, তার গহ্বরে চালান করে দিল মড়াগুলো। বয়লারের খোলে খালাসিরা কয়লা ঠেলে দেয় দেখেছেন, সেই ব্যাপার। বাস্, সাফ-সাফাই হয়ে গেল দেখতে দেখতে, মানুষগুলো যে কোনোদিন ক্যাম্পে এসেছিল তার কোনো নিশানা পাবে না কেউ খুঁজে। লীবার্গের মা-বাপ-বোনদের এই গতি কিনা কে জানে? ঐ যেখানটা সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়, তার মুখে ফুলের মালা সাজিয়ে দিয়েছে। চুল্লির মুখেও বিস্তর মালা। যতদূর হিসাব পাওয়া যায়, ছাপ্পান্ন হাজার মেরেছে শুধুমাত্র এই ক্যাম্পে। ক্যাম্প আরও দু-শ নিরানব্বুইটা ছিল। কত ফুল আছে তোমাদের দেশে, ক-টা মালা দিতে পারবে ক-জনের নামে?

কিন্তু এতেও অপব্যয়। লড়াই দিনকে-দিন উগ্র হচ্ছে, খরচের দিশা পাচ্ছে না, মাথায় নতুন নতুন মতলব বেরুচ্ছে ততই। মড়াগুলো বিলকুল পুড়িয়ে নষ্ট করা কেন? গোরু-ঘোড়া মরলে পোড়ায় বুঝি কেউ? মাথার চুল কামিয়ে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে কম্বল বানাতে পাঠাও। ফ্রণ্টে কম্বলের দরকার। একজিবিশনে নমুনা রেখেছে—দেখে এলাম মানুষের চুলের তৈরি কম্বল। আর, বিশ-তিরিশ হাজার নানান পায়ের পুরানো জুতা। সৈন্যদের গায়ে রকমারি উলকি থাকে। মড়ার গায়ে উলকি থাকলে সেই চামড়ার ভারি কদর। উলকি সুদ্ধ চামড়া খুলে নিয়ে হাতব্যাগ বানাত, আলোর ঢাকনা ও জুতোর উপরে বসিয়ে বাহার করত। এই সব ফ্যান্সি জিনিস নিজ চোখে দেখে তবে এই লিখছি। শেষাশেষি চর্বিও নাকি জ্বালানির কাজে লাগাত। শুধু মাত্র মুখে শোনা এটা।

আরও বিস্তর আছে। মারণ-গ্যাস তৈরি হল, ফলাফলটা দেখছে

একটা-ছুটোকে চেম্বারের ভিতর ঠেলে দিয়ে। ল্যাবরেটরিতে নতুন বিষ বানিয়েছে, মানুষের উপর ইনজেকশন করে পরখ করছে। গিনিপিগের কী গরজ, মানুষ যখন মুফতে মিলে যায়? সেই সব কত রকমের সিরিঞ্জ সাজিয়ে রেখেছে একজিবিশনে। নানা রকমের যন্ত্র। বেতমারার সময় যে যন্ত্রে আটকে রাখত। যন্ত্রণা দিয়ে গোপন খবর বের করবার জন্য যন্ত্র কত রকমের! উঃ, মানুষের মাথায় এতও আসে।

একজিবিশন-হলের তিনটে দেয়াল ফোটোগ্রাফ ও আঁকা-ছবিতে ঢেকে আছে। যে সব মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়েছে এই ক্যাম্পটুকুর মধ্যে। মেয়ে পুরুষ সবাই আছে। তা-ও তো পুরো হিসাব পায় নি; ছবিও জোটাতে পারে নি অনেকের। ছাপ্পান্ন হাজারের এরা কজনই বা!

শেষটা বন্দীরা মরিয়া হয়ে উঠল। তখন ভাঙা হাট—১৯৪৫ অব্দ। নাৎসিরা অচিরে নিপাত হবে, তার কোনো সন্দেহ নেই—কয়েকটা মাস না কয়েকটা দিন, এই শুধু প্রশ্ন। বিদ্রোহ হল এই ক্যাম্পে। আয়োজন অনেক দিনের। আশিটা মেশিন-গান সরাল; বেতার-ষ্টেশন অবধি বসাল এই চৌহদ্দির মধ্যে। আট-শ জন বেরিয়ে পড়ল পয়লা কিস্তিতে। বিদ্যুতের তারে আষ্টেপিষ্টে ঘেরা—তারের যোগাযোগ সমস্ত কেটে দিল। ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫। একুশ হাজার মানুষ মুক্তি পেল ওই একটা দিনে। কালকেউটে নাৎসিরা ঢোঁড়ার মতো তখন নির্বিষ হয়ে উঠেছে, সময়টা বেছেছিল ভালো।

গাইড লোকটা চক্রাকারে হাত ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে: আগে ছিল ঘোর জঙ্গল, দূরে দূরে যেমন ওই দেখা যায়। ক্যাম্প করবার সময় কেটে সমস্ত সাফসাফাই করল। শুধু একটা বড় ওকগাছ ছিল এখানটায়। যত মানুষ কামরা থেকে ফাঁকায় নিয়ে এসে ওকগাছ ঘিরে জমায়েত করত। দিনের মধ্যে তিনবার। গোনাগুনতি করত, হিসাবপত্তর হত। আশ্চর্য ব্যাপার শুনুন, কোন কবি ছিল তাদের মধ্যে, ওকের বাকলের উপর কবিতা লিখে রেখেছে: সর্ব মানুষের

মুক্তি হবে, মানুষের মধ্যে নীচতা থাকবে না···। রাক্ষস-পুরীর মধ্যে কবিতা এল কোন ফাঁক দিয়ে বলুন তো? গাছের গুঁড়ি খোদাই করে লিখল এ সব কখন? কিন্তু এসেছিল তো সত্যিই, আমরা লেখা দেখেছি।

বেলা পড়ে আসে। নিঃশব্দে বেরুলাম ক্যাম্প থেকে। সেই তরুণী এবং তার সহচর তিনটি চলেছে আমাদের আগে আগে। একটির গলায় ঝুলানো ক্যামেরা—থমকে দাঁড়াল, মুলতবি ছবিটা তুলে নিতে চায়। অনুনয় করছে। কিন্তু কোনো-কিছু শুনতে পাচ্ছে না যেন মেয়ে। বনের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে পথের উপর পড়েছে। রেলগাড়ি যাচ্ছে কোথায় অদূরে। টুনটুনি-জাতীয় অনেক পাখি কিচমিচ করছে নিচু ডালের উপর। মেয়েটা একটি কথা না বলে একটিবার মুখ না ফিরিয়ে মৃদু পায়ে এগিয়ে চলেছে। ছেলে তিনটি অগত্যা চলল পিছু পিছু।

লেখক আমাদের কাছে ভাইমার পবিত্র এক তীর্থভূমি। সেই জায়গারই অদূরে বুকেনওয়াল্ড। আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি একেবারে। বুকেনওয়াল্ড দেখে এসে ছু-তিন রাত ঘুমোতে পারি নি। বীভৎস দৃশ্যগুলো চোখের উপর ঘুরত।

চলুন লাইপজিগমুখো। মেলার জন্য লাইপজিগের নাম। ছাপাখানার প্রথম আবিষ্কার সেখানে। সেই থেকে দিনকে-দিন ছাপার হরেক কায়দা বের করছে। বইয়ের খুব বড় ঘাঁটি। জর্মনির *'কালো সোনা' অর্থাৎ লিগনাইটের আকর ঐ অঞ্চলে।*

ন্যুমবার্গ প্রায় পথের উপর। ন্যুমবার্গের গির্জায় এক সময়ে সারা ইয়োরোপের ভিড় ছিল। ভজনার জন্য নয়, তার ব্যবস্থা গাঁয়ে গাঁয়ে রয়েছে। লোকে যায় একটিবার চোখের দেখা দেখতে। দেখে দেয়ালে-আঁকা ছবি আর ভিতর-বাইরের মূর্তিগুলো। সন্ধ্যা হয়ে আসে, পাঁচটায় আবার বন্ধ হয়ে যাবে—হাঁপাতে হাঁপাতে তথায় গিয়ে হাজির। এতদূরের মানুষ এসেছি, আমাদের একটু আলাদা করে দেখাচ্ছে বোঝাচ্ছে। গ্রাম জায়গা—কফিখানায় চাষাভুষো মানুষদের সঙ্গে বসে কিছু খেয়ে নিলাম। এক আজব অভিজ্ঞতা।

তার পরে জেনা—জাইস ক্যামেরা ও লেন্সের কারখানা যেখানটায়। এলাহি ব্যাপার। ছুনিয়ায় এর জুড়ি নেই। স্বচ্ছ সুন্দর নদী। পুলের ধারে গাড়ি থামিয়ে এদিক-ওদিক খানিকটা ঘুরে আবার লম্বা দৌড়।

লাইপজিগে এলাম, বেশ রাত্রি হয়ে গেছে। ইয়োরোপের মেলা-ক্ষেত্র। শুধু ইয়োরোপ কেন, গোটা ছুনিয়ার মানুষ মেলায় গিয়ে জোটে বেচাকেনা করতে। আমাদের ভারতও যাচ্ছে ইদানীং। ছুটো রাজপথ কাটাকাটি করেছে, জায়গাটা হল সেই মোহানায়। অনেক শতাব্দীর পুরানো প্রসিদ্ধ পথ ছুটো। এক পথ প্যারি থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট

হয়ে পোল্যাণ্ড হয়ে ইউক্রেন-মুখো চলে গেল। আর একটা গেল উত্তর-জর্মনি থেকে ইতালি। শত শত বৎসর ধরে ইয়োরোপের সকল তল্লাটের ব্যাপারির এই দু-পথে আনাগোনা। তীর্থযাত্রীরাও দলে দলে যায়। রাস্তার মোহানায় এই লাইপজিগে দিব্যি এক ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াল। ব্যাপারিরা মালপত্র নামিয়ে ঘোড়াগুলোকে ঘাসজল খাওয়ায়, নিজেরা খানাপিনা করে। তীর্থযাত্রীরাও কোনো এক চটি বেছে নিয়ে গড়িয়ে পড়ে তার ভিতর। একদিন দু-দিন কাটে এখানে। এ-পথের ব্যাপারি আর ও-পথের ব্যাপারিতে মোলাকাত। এর কিছু মাল ও কিনে নেয়, ওর কতক মাল এ কেনে। তীর্থযাত্রীরাও এটা-সেটা কেনাকাটা করে।

ইতিহাস যে সময়ে লেখা হল, তার আগে—অনেক আগে থেকে এই ব্যাপার। লাইপজিগের মেলার জন্ম এমনি ভাবে। ১০১৫ অব্দে লেখাজোখার মধ্যে প্রথম লাইবজাই (Libzi) ক্যাসলের নাম পাওয়া যাচ্ছে। ক্যাসলের আওতায় মেলা বসে। জিনিসপত্র যত আমদানি হয়, তার খবরদারির দায়িত্ব নিয়েছেন ক্যাসলের মালিক। রকমারি মালপত্র জমে এসে মেলায়, আমোদ-স্ফূর্তির হরেক ব্যবস্থা। জমিদার পিছনে থেকে আমাদের দেশেও বিস্তর মেলা বসেছে। তেমনি একটা ধরে নিন।

জমিদারের সঙ্গে হাত মেলালেন গির্জা। গির্জায় ভারি ভারি মচ্ছব হয়, দূর-দূরস্তরের ভক্তদল আসে। এর মধ্যে সেরা দুটো বেছে নেওয়া গেল—বসন্তে ঈস্টার আর হেমন্তে সেণ্ট-মাইকেলের মচ্ছব। বছরের মধ্যে দু-বার এই লাইপজিগের মেলা। আমাদের দেশে চড়কপুজো চুকেবুকে যায়, গাজনের মেলা তবু কতদিন ধরে চলতে থাকে। সেই বৃত্তান্ত।

লাইপজিগের চৌরাস্তায় বিদেশি ব্যাপারি আর জর্মন ব্যাপারিরা মিলেমিশে কিছু ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলল। বারো শতকের ব্যাপার। শহরের এই গোড়াপত্তন। মেলা থেকেই শহর। ঐ তল্লাটে ছোট

বড় বিত্তর জমিদার—অনেক তাদের ভূমিদাস। ভূমিদাস-প্রথার বিলোপ হচ্ছে তখন। তারা এসে লাইপজিগে জোটে। জনসংখ্যা হুহু করে বেড়ে যায়।

মেলা যাতে ফেঁপে ওঠে, রকমারি আইন সেজন্য। আইন হল, শহরের পাঁচ মাইলের মধ্যে নতুন মেলা কেউ বসাতে পারবে না। আইন হল, মেলার জন্য যে সমস্ত মাল আসবে তার নির্বিঘ্ন আমদানি ও ফেরত পাঠানোর জন্য ষোলোআনা দায়ী রইলেন স্থানীয় জমিদার। এমন কি, লড়াই চলছে দুটো দেশের মধ্যে—সেই শত্রুদেশ থেকেও মেলার জিনিসের স্বচ্ছন্দ চলাচল। এ হল কত শতাব্দীর আগেকার কথা—এখনকার দিনেও এমন ব্যবস্থা আমরা ভাবতে পারি নে। লাইপজিগ দেখতে দেখতে জমজমাট হয়ে ওঠে। পূর্ব-ইয়োরোপের সঙ্গে ব্যাপার-বাণিজ্যে এই শহরের জুড়ি ছিল না। দেশবিদেশের মানুষ এসে মিলছে। মালপত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের নানা নিদর্শন এসে পড়ছে চারিদিক থেকে। মানুষদের মন-জানাজানি হচ্ছে। তখন শুধুমাত্র বাণিজ্যের ঘাঁটি নয়, বিরাট সংস্কৃতি-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। য়্যুনিভার্সিটি হল (১৪০৯), যার নাম ভুবনখ্যাত আজকের দিনে।

মেলা, ঐ যা বললাম, বছরের মধ্যে দু-বার। ঈস্টার উৎসবের মেলা আর অক্টোবরে সেণ্ট মাইকেলের মেলা। জানুয়ারিতে নব-বর্ষের মেলাও বসত কিছুকাল। কিন্তু জুত হল না। ব্যাপারিরা বড় বড় গুদাম বানিয়ে নিয়েছে—মেলার অন্তে যা পড়ে থাকে, সেই সমস্ত মাল গুদামজাত করে রেখে যায়। বওয়াবয়ি করতে হয় না। পরের মেলার সময় আবার এসে চাবি খোলে।

লড়াইয়ের দরুন হালফিল অনেকবার মেলা বন্ধ হয়ে গেছে। লড়াই মিটে গেলে আবার চালু হয়। দুনিয়াজোড়া লাইপজিগের মেলার নাম, দুনিয়ার লোক মেলায় আসে। টাকা-বদলের বিশেষ রকমের সস্তা দর ঠিক করে দেয় মেলার মানুষের জন্য, বিশেষ ধরনের

ভিসার ব্যবস্থা করে। মানুষ তো এ-জাত ও-জাত করে ছুরি শানাচ্ছে —লাইপজিগের মেলাক্ষেত্র যেন ঐ হিংস্র এলাকার বাইরে। সব দেশের মানুষ মিলেমিশে কেনাবেচা ও ফূর্তিফার্তি করে। সমস্ত মানুষ হঠাৎ যেন এক পরিবারের হয়ে যায় মেলার ক-টা দিন। আমাদের ভারতও এসে স্টল খোলে এখানে, ভিড়ের ভিতর ভারতের মানুষও ছুটি-পাঁচটি পেয়ে যাবেন।

আমরা এসেছি—এখন মেলার সময় নয়। ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখছি। জায়গা ভাবছেন ছু-দশ বিঘে—ঘর ভাবছেন দশ-বিশটা? ভারি ভারি ইমারত, গুনতিতে আসবে না। ফাঁকা জায়গা যা দেখছেন, সেখানেও অস্থায়ী ঘর উঠে যাবে মেলার সময়টা। বিশাল অট্টালিকায় বারোমেসে অফিস—লীবার্গ সেখানে নিয়ে গেল। কর্তারা খুব খাতির করলেন, একগাদা কাগজপত্র ও ছবি দিয়ে দিলেন।

হিটলারের লড়াইয়ের নীতি সারা ইয়োরোপের সর্বনাশ ঘটাল। জর্মনিরও। মেলার বড় বড় ঐতিহাসিক বাড়ি নিশ্চিহ্ন সমাধিস্তূপ। বোমায় বোমায় যেন বাটনা বেটে রেখে গিয়েছিল এই লাইপজিগে। আমেরিকার হাতে গিয়েছিল শহরটা। জর্মনির বাঁটোয়ারা হয়ে গেল, তখন সোবিয়েতের ভাগে পড়ে। অতএব পূর্ব-জর্মনির এলাকার মধ্যে এখন।

লাইপজিগে অভিনয় শেখানোর ইস্কুল আছে—সে তো শুনেছেন কার্ল-মার্কস-স্তাদে 'শকুন্তলা' অভিনয়ের কথা যখন হচ্ছিল। লেখা শেখানোর ইস্কুলও আছে তেমনি, লেখকরা কলম চালানোর কায়দা-কানুন শিখে বেরোন যেখান থেকে। মজা লাগে শুনতে। আমরা লেখক—কোনোখানে কিছু না শিখেই কলম ধরেছি। এদেরও গ্যেটে-শিলার থেকে এতাবৎ কেউ কখনো ট্রেনিং নেয় নি। এ বস্তু একেবারে হাল আমলের। চলুন গিয়ে দেখে আসি, শিখে পড়ে যারা এ পথে নামছে তাদের সঙ্গে ফারাকটা বুঝে দেখি।

আগেই খবর হয়ে গেছে, ভারতের ধুন্ধুমার লেখকরা সব যাচ্ছেন। হবু-লেখকরা দেখি সারবন্দি সংবর্ধনার জন্য দাঁড়িয়ে—ছেলে আছে, মেয়ে আছে,—বয়সে সবাই তরুণ। পরিচয় দিয়ে দিচ্ছে। এখন আর তাদের কী পরিচয়, শুধুমাত্র একটি নাম—দিন কাটুক, ঝুনো হোক কলম চালিয়ে চালিয়ে, আজকের এই হেলাফেলার নাম হয়তো সেদিন জগৎ-জানিত হবে।

হলের মধ্যে নিয়ে বসাল। তারপরের ব্যাপার পাঠক-মশায়রা জানেন, আমরাও জেনেবুঝে আছি। কথার খই ফোটানো এক এক কাপ চা সামনে নিয়ে। ওরা বলবে, আমরা বলব। বিস্তর দেশে ঘোরাঘুরি করে এ-জিনিস গা-সওয়া হয়ে গেছে। আগে থেকে কেউ কিছু ভেবে রাখিনে, ভাবনার দরকারও নেই। যেহেতু আমরা ভারতের লেখক, 'টেগোরে'র সম্পর্কে অতএব দু-পাঁচ কথা বলতেই হবে। অতঃপর উঠল ভারতীয় নাটকের কথা। ভারতীয় সাহিত্যের ধারা এবং লেখকের স্বাধীনতা সম্পর্কেও জানতে চায়। ভারত যেন একটুখানি জায়গা, ভাষা যেন তার একটি, ভারতের সাহিত্য যেন ছোট্ট একটু ঝিরঝিরে খাল—দেড় মিনিটে আঁজলা কয়েক জল ছিটিয়ে দিলে তার চেহারা পাওয়া যাবে। তা আমরাও কিছু পিছপাও নই। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা, কতটুকুই বা জানে ওরা ভারতের সম্বন্ধে, এই ক-খানা শ্রীমুখে যা-কিছু উচ্চারিত হচ্ছে সে-ই তো নির্ভুল ঋষিবাক্য। বিশেষত একজন আছেন আমাদের মধ্যে—অনর্গল ইংরেজি বলার গুণে তিনি সর্ববিদ্যায় বিশারদ। ওরা তদ্গত হয়ে শুনছে। তাই দেখে মজা পাওয়া যায় আরও বেশি।

পাশের মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করি: লেখা শিখছ, তা বইটই কী পড়ায় তোমাদের? গ্রামার-জাতীয় কিছু আছে যার সূত্র ধরে ধরে সাহিত্য-কর্ম করো?

নানারকম আলোচনায় প্রক্রিয়া খানিকটা পরিষ্কার হল। দু-বছরের কোর্স। লেখা শেখায় না, ভিতটা গড়ে দেয় এই মাত্র।

লিখে যাচ্ছে কেউ নেশার বশে, লিখছেও ভালো—তাদের ভিতর থেকে চলে আসে এখানে। ইচ্ছে করলেই আসা যায় না, কর্তারা খুব বাছগোছ করে ঢোকান। বড় লাইব্রেরি আছে—যার যেদিকে ঝোঁক, সেই মতো সে পড়াশুনো করে। জাতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, পুরানো ক্লাসিকের কিছু কিছু পড়তেই হয়। বাইরের জগতের খোঁজখবর রাখতে হয়। রচনার মধ্যে ভাষার ত্রুটি না হয়, সেটাও শেখে। বিষয়বস্তু ভাবনা-চিন্তা ও প্রকাশশৈলী একেবারে তোমার নিজের। যে জাত-লেখক, নিজের পথ সে করে নেবে; ইনস্টিট্যুট দেখে, লক্ষ্যহীন ভাবে এপথে-ওপথে মাথা ঠুকে না বেড়ায়।

এক ছোকরা লেখককে পাকড়াও করলাম: বলো হে, তোমার নিজের কথাই শোনা যাক কিছু।

ছোট্ট এক গ্রাম থেকে এসেছে—অনেক দূরের গ্রাম থেকে। বাপ-মা ভূমিহীন চাষী। এই রোগা ডিগডিগে চেহারা দেখছেন, ফ্রণ্টে লড়াই করেছিল পুরো দুটি বছর। লড়াইয়ের শেষে সুভালাভালি ঘরে ফিরে এল। ১৯৪৫-এর পর থেকে সমাজ-ব্যবস্থা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে গেল। নতুন ব্যবস্থার কল্যাণেই হল—নয়তো তার অবস্থার ছেলে আগে ওপথে যেতে পারত না। কেরানিগিরি করল এক মিনিস্ট্রির অধীনে কিছুদিন। লেখার শুরু সেই সময়। কবিতা লেখে, দুটো-চারটে কাগজে ছাপা হয়। লোকে তারিফ করে।

—লিখতেই যদি হয়, তৈরি হয়ে তবে নামা উচিত। দরখাস্ত করে দিলাম ইনস্টিট্যুটে। আমাদের ইউনিয়ন সুপারিশ করল। এমনি সব যোগাযোগে জায়গা পেয়ে গেলাম। দু-বছর হয়ে গেল, এবারে শেষ। শিগগিরই বিদায় নিচ্ছি এখান থেকে।

বিস্তর পেয়েছি এখানে। বড় বড় লোকের সঙ্গে পরিচয় হল। জীবনে নতুন আলো পেলাম। একটা ভাবনা সবাই ভাবছে—প্রবীণেরা যেমন, আমরা নতুনেরাও তেমনি—লিখি কাদের জন্য?

কর্মিক চাষী বুদ্ধিজীবী কোনো দল পাঠকগোষ্ঠী থেকে বাদ থাকবে না। আমার গোড়ার লেখা, বলতে পারেন, পদ্যে-গাঁথা রাজনীতিক স্লোগান। সে জিনিস চলল না, ছুঁলই না কেউ আমার কবিতার বই। এখন পথ পেয়েছি মনে হয়। নিজের উপলব্ধিই লিখে যাই আমি—লিখি রসে রাঙিয়ে, ছন্দের আনন্দধ্বনি তুলে···

ঘুরে ঘুরে লাইব্রেরি দেখি। ভারতের মানুষ এসেছি—অতএব ভারতের যত রকম বই তরজমা হয়েছে, ভালো জায়গায় আলাদা ভাবে রেখে দেখাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই—হালফিলের যাঁরা রয়েছেন, তার মধ্যে বাঙালি বলতে একমাত্র হুমায়ুন কবির। বলতে পারলাম, 'টেগোরে'র পরে ঐ দেখো একটি বাঙালি লেখক।

লাইপজিগের হাল আমলের এক রাজপথেব নাম লেনিন-স্ট্রাসে। সেই পথ ধরে ছুটেছি। নেপোলিয়ান হেরে যান এখানে—১৮১৩ অব্দের সেই বিপুলকায় স্মারক-স্তম্ভ। শহরের বাইরে এসে পড়লাম —দু-ধারে খেতখামার আর গাছপালা। ট্রাম চলেছে গাছের ছায়ায় ছায়ায়। ফ্যাক্টরির চোঙা, অগুনতি দেওদার যেন আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে। মাঠের পর মাঠ—নিশ্বাস পড়ে আমার, যেন সেই সেকালের গাঁয়ের পথ ধরে চলেছি। গ্রাম পড়ছে মাঝে মাঝে—টালি-ছাওয়া ঘরবাড়ি, চাল ফুঁড়ে চিমনি উঠেছে। ছোটখাট গির্জা এদিকে-সেদিকে। মাঠ-ভরা গোরু—এই তাগড়া তাগড়া। ভেড়ার পাল—বাচ্চাগুলো পেছনে পড়ে ছিল, খুট-খুট করে ছুটে এসে দল ধরল। পালের পেছনে বড় কুকুর দু-তিনটে, মানুষের সঙ্গে এরাও ভেড়ার পাহারা দিয়ে ফেরে।

লিগনাইটের খনি ·অঞ্চলে যাচ্ছি। পুরোপুরি কয়লা হবার আগের অবস্থা—পিট-কয়লা বলে এই যেদিন অবধি মুখ বাঁকাতাম যার নামে। গাঁ-অঞ্চলে পুকুর কাটতে গিয়ে বাদামি রঙের কঠিন

মৃত্তিকা অমন অনেক ওঠে। কেউ কখনো ভালো করে পরখ করে দেখেছি যে কী বস্তু?

সোনার লোভে ইয়োরোপের কত অসমসাহসী নাবিক দেশবিদেশে ছুটোছুটি করেছে। বালি খুঁড়েছে নারিকেল-ঘেরা সমুদ্রতটে, পাথর ভেঙেছে। সর্বস্ব হারিয়ে শীর্ণদেহ ভগ্নস্বাস্থ্য ভিখারি হয়ে ফিরে এসেছে দেশের বন্দরে। ফিরতেই পারে নি আরও কত জন। ভাগ্যবান যারা সত্যি সত্যি সোনা পেয়ে গেছে, সেই ক-টি নাম আঙুলে গোনা যায়। এই বিশ-শতকের মানুষও বের হয়েছে সোনার লোভে।

কিন্তু জর্মনির মানুষ স্বপ্নেও কি জানত, সোনা রয়েছে তার নিজের দেশেই? কালো সোনা—সোনালি সোনার চেয়ে অনেক বেশি দামি। ঈষৎ বাদামি রঙ লিগনাইটের, কালো সোনা বলে দেমাক করে জর্মনরা। এক ইটখোলার মালিক ইটের জন্য মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে এই বস্তু পেয়ে যায়। ১৮৪৩। নোংরা বস্তু, হাত-পা কাপড়-চোপড় ময়লা হয়ে গেল। অমন আধ-কয়লা মাটিতে ইট হবে না; জ্বালানি হিসাবেও চলবে না। এই ভিজে-ভিজে গুঁড়ো জিনিসে তাপ পাওয়া যায় না—শক্ত শুকনো কয়লা থাকতে কে কিনতে যাচ্ছে ভুষিমাল? ইটখোলার মালিক তবু একটা লাইসেন্স নিয়ে রাখল ঐ বস্তু তোলবার জন্য। দেখা যাক, যদি কোনোদিন কাজে আসে।

আজ এই অপরাহুবেলা মাইলের পর মাইল সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছি। খনি পাতালের তলে নয়, মাটির অল্প নিচে। চারিদিক খোলামেলা, গর্ত খুঁড়ে নিচে নামতে হয় না। ঢাউস চেহারার অগণ্য যন্ত্রপাতি অঞ্চল জুড়ে দীঘি কাটছে। যন্ত্রের হাতাগুলো খাড়া করে তুললে বোধ করি আকাশে ঠেকে যাবে! দিনরাত্রি চব্বিশঘন্টা খোঁড়াখুঁড়ি। খুঁড়ে খুঁড়ে এগোচ্ছে, উপরের বাজে মাটি পিছনে নিয়ে ঢেলে দিচ্ছে—লিগনাইট-তুলে-নেওয়া দীঘির মতন গর্ত জায়গা ভরাট হয়ে আসছে আবার। এক-মানুষ দু-মানুষ, কোথাও কোথাও চার-পাঁচ মানুষ সমান বাজে মাটি। তার নিচে

আসল বস্তু, বাদামি মাটি—লিগনাইট। ছোট ছোট ওয়াগনে গুড়গুড় আওয়াজ তুলে চালান হয়ে যাচ্ছে অনতিদূরে ফ্যাক্টরির ভিতরে। অবিরাম গাড়ি চলে—বোঝাই গাড়ি যাচ্ছে, ফিরে আসছে গাড়ি খালি হয়ে। আর এই খনি-পাড়ায় দেখুন নতুন নতুন দালানকোঠার ইন্দ্রপুরী। কর্মিকদের কোয়ার্টার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মেয়েদের সূতিকাগার, বাচ্চাদের নার্সারি, কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দরাজ ব্যবস্থা —শরীরের যাবতীয় কলকবজা নাট-বোল্টু যেমন খুশি পরখ করে যথোচিত মেরামত করে নিতে পারেন। সংস্কৃতি-ভবন কর্মিকরা বাড়তি খেটে নিজেদের শ্রমে গড়েছে—পড়াশুনো নাচ-গান সিনেমা-থিয়েটার স্ফূর্তিফার্তির হরেক ব্যবস্থা। এরা সব নিতান্তই গাঁয়ের মানুষ —ঘরসংসার ছেড়ে ফ্যাক্টরির কাজে এসে জুটেছে। জীবনের রসের যোগান এমনিতরো আয়োজনের ভিতর দিয়ে অতি অবশ্য চাই। নয়তো আত্মসর্বস্ব অমানুষ হয়ে উঠবে। সাংস্কৃতিক চর্চার ভিতর দিয়ে এক বিচিত্র মধুর সমাজ গড়ে উঠেছে। দিব্যি একটা পাড়া—কিংবা খুব বড় এক সংসারও বলতে পারেন। পাড়া কিংবা সংসার যাই হোক, আয়তন অতিরিক্ত রকমের বড়। আট হাজার তিন-শ মানুষের। এত মানুষ কাজ করে, ফ্যাক্টরির বহর এই থেকে আন্দাজ করে নিন।

মাত্র শ-দুয়েক বছর পিছিয়ে আসুন। ঘরবাড়ি নেই এ জায়গায়, মাঠ ভেদ করে পথ চলে গেছে একটা। পথের মোড়ে জলের চৌবাচ্চা। কোচোয়ানরা গাড়ি রোখে এই জায়গায়, ঘোড়াকে জল খাওয়ায় চৌবাচ্চায় নিয়ে। প্যাসেঞ্জাররা নেমে পড়ে এদিক-ওদিক পায়চারি করে: কিছু খেয়ে নিতে পারলে ভালো হত। সেই গরজে ক্রমশ এক সরাইখানা জমে উঠল। সাক্সনির রাজা অগস্টাস—'বলবান অগস্টাস' বলত যাঁকে, ড্রেসডেনের আর্ট-গ্যালারি যাঁর কীর্তি—রাজার গাড়িও সন্ধ্যার পরে অবরে-সবরে দেখা যেত। অগস্টাসের অসংখ্য প্রেমিকা—একটি তার এই তল্লাটে। রাজার ঘোড়া এখানে থেমে এই চৌবাচ্চায় জল খেয়ে নিত।

সেই জায়গায় আজ এত বড় কাণ্ড। ১৯৩৮ অব্দে হিটলারের উঠতি মুখে ফ্যাক্টরির পত্তন। ১৯৩৯-৪১ মধ্যে যাবতীয় কলকবজা বসানো শেষ। তার পরে লড়াই। লড়াইয়ের শেষমুখে বোমা পড়তে লাগল। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার! বত্রিশ-শ বোমা পড়েছিল শুধুমাত্র এই এক ফ্যাক্টরিতে। কিছু আর আস্ত রইল না। লড়াই খতম হয়ে যাবার পর সোবিয়েতের দখলে এল। গোড়া থেকে নতুন করে গড়া হল আবার। আগের চেয়ে ঢের ঢের বড় হয়েছে। উৎপাদন ডবল। সাধারণ কর্মিকদের মাইনে সাড়ে-চারশ থেকে সাড়ে-পাঁচ-শ মার্ক। দক্ষ কর্মিকদের আট-শ থেকে হাজার। নতুন ইঞ্জিনিয়ারদের ছ-শ থেকে শুরু; আঠারো-শ অবধি উঠতে পারে।

দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি লিগনাইট তোলে এরা, তার পরে আমেরিকা। গুঁড়ো গুঁড়ো নোংরা কাদার মতন নরম বস্তু বলে একদিন কেউ ছুঁতে চাইত না। ফ্যাক্টরির কলে ফেলে চাপ দিয়ে এখন কঠিন ইট বানানো হচ্ছে। সাধারণ জ্বালানি তো বটেই, কিঞ্চিৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সবচেয়ে যে ভালো কয়লা—মেটালার্জিক্যাল কয়লা—তার কাজ করিয়ে নিচ্ছে। পেট্রোল আদায় করছে বিশেষ কায়দায় এই বস্তু পুড়িয়ে। আলকাতরা পাচ্ছে। গন্ধক বানাচ্ছে, এবং প্যারাফিন ও নানান রকম অ্যাসিড। গাঁয়ে গাঁয়ে বিদ্যুৎশক্তি দেখে এলেন, লিগনাইট পুড়িয়ে ঐ শক্তি বের করে আনে। পার্লনের কাপড়ে বাহার করে বেড়াচ্ছে মেয়েটা—সে কি স্বপ্নেও জানে, নোংরা কাদাটে লিগনাইট থেকেই তার শৌখিন কাপড়? মাথা ধরেছে আপনার, খেয়ে ফেলুন লিগনাইটে তৈরি এক বড়ি ওষুধ। গান শুনুন লিগনাইটের গ্রামোফোন-রেকর্ডে। গায়ে সাবান মাখুন, বাতি জ্বেলে ঘর আলো করুন—ছুঁতে-ঘেন্না-করে এই লিগনাইট রয়েছে সকলের মূলে। জর্মনেরা 'সোনা' বলে, সে আর এমন কি—সোনা কোন ছার এই বস্তুর তুলনায়!

ভক্তদল জুটে গেছে। লেখক বানানোর ইস্কুলে গিয়ে ঐ যে নানাবিধ বাক্যজাল বিস্তার করলাম, সেই জালে আটক পড়েছে হতভাগ্যেরা। সকালবেলা নিচে নেমে এসে দেখি কমবয়সি একপাল ছেলেমেয়ে। সমাদরে ডেকে নিয়ে একসঙ্গে ব্রেকফাস্টে বসা গেল। ঝাঁকড়া-চুল একটা মেয়ে ও গোটা দুই ছেলে আমার এপাশে-ওপাশে। আলাপ করছে আমার সঙ্গে। এ অবস্থা একলা আমারই নয়—সকলের সঙ্গেই জুটেছে এমনি একটা-দুটো করে। লেখে ওরা অল্প-বিস্তর। ইনস্টিট্যুটে কাল আমার হরেক গুণাবলীর মধ্যে আনন্দ বইয়ের সংখ্যাও উল্লেখ করেছিলেন। তাই শুনে তাজ্জব হয়ে আছে। বলে, এত বই লিখেছ—কখন লেখো? আমাদের লেখকরা এর সিকি বইও তো লিখে উঠতে পারেন না। আমায় তখন পায় কে, আরও জাঁক করছি: আমি কোন ছার! এমন সব আছেন, বইয়ের গুনতিতে যাঁদের সিকির কাছেও পৌঁছতে পারলাম না সারা জীবনে।—ওরে বাবা! সত্যি বলছ? চক্ষুজোড়া একেবারে তাদের মাঝ-কপালে উঠে গেছে।

একটা গাড়ি পেয়েছি একলা আমার জন্য। ঐ তিন ভক্ত আর পাছ ছাড়বে না। লীবার্গ ড্রাইভারের পাশে, পিছনে চার জনে বসেছি ঠাসাঠাসি করে। বইয়ের রাজ্য লাইপজিগ। ছাপাখানা বানাল প্রথম এই জায়গায়, যার ফলে অবশ্য ভুবনের আবর্জনাও বিস্তর বেড়ে গেল। কিন্তু সেই বোঝার অনেকখানি লাইপজিপ নিজ স্কন্ধে নিয়ে নিয়েছে। গোটা একটা পাড়া জুড়ে বই। বই আর বই—হরেক ভাষায় হরেক রীতির বই। লাইপজিপে এসে বইয়ের অগণ্য কারখানা আর দোকানগুলোয় চক্কোর না দিয়ে কেউ ফিরতে পারে না।

একগাদা বই গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরছি। কয়েকটা বনেদি অট্টালিকা—কত রকমের কারুকর্ম—বোমার ঘায়ে নড়বড়ে হয়ে কোনো গতিকে খাড়া আছে। সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। নিশ্বাসও পড়েছিল হয়তো।

সঙ্গিনী মেয়েটা হেসে উঠল—কী ব্যাপার—হাসির কী হল এর মধ্যে? ভ্রূকুটি দৃষ্টিতে তাকাই তার দিকে।

মেয়েটা বলে, অমন মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়ালে কেন? ভাঙাটাই দেখলে শুধু, আর যে কত নতুন নতুন গড়ে তুলছে চারিদিকে?

এবং তরুণদের একটি বলল, আমরা ডরাই নে। আবার চক্রান্ত হচ্ছে। লড়াই রুখতে চাই আমরা। তা বলে ভয় পাই নি। আমাদের বহা ঘাড়, কত বারই তো হল! ভাঙাভাঙি হয়-ই যদি আবার, আমরা মাছি-পিঁপড়ের মতো মরি, নতুনেরা এসে আবার সব গোড়া থেকে পত্তন করবে।

এক আশ্চর্য জাত। নিষ্ঠুর আক্রোশে মানুষ মারুক আর ঘরবাড়ি চুরমার করুক, এইসব নিঃশঙ্ক ছেলেমেয়ের মুখের হাসি মোছবার শক্তি আততায়ীর নেই। আমরা ডরাই নাকি?—একথা শুনেছি এদের কবিদের কবিতায়, রাষ্ট্রকর্তাদের মুখে, দেবেরিন নামক চাষীদের গাঁয়ে গেলাম—সেখানেও। কিছুতে এরা মুষড়ে পড়ে না। ভাবলেন, গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ধুলো বানিয়ে দিলাম—পুড়িয়ে জ্বালিয়ে ছাই করে দিলাম—সেই ধুলো ঝেড়ে ছাই উড়িয়ে দুর্ধর্ষ নতুন জীবনেরা মাথা খাড়া করে দাঁড়ায় আবার।

হঠাৎ দেখতে পাই পার্কের পাশে হ্যানিমানের মূর্তি। পাকিস্তানের ভিতর আমার জন্মগ্রামে ভাই সম্পর্কের একজন হোমিওপ্যাথি মতে ডাক্তারি করেন। শুধু হ্যানিমান শুনলে তিনি হাঁ-হাঁ করে উঠতেন—মহাত্মা হ্যানিমান। পরম ভক্তিভাবে হ্যানিমানের নাম করে ওষুধের ফোঁটা ফেলেন। সকালবেলা, শুনেছি, একটা কাগজে দশবার মহাত্মা হ্যানিমানের নাম লিখে কাগজ কপালে ঠেকিয়ে তারপরে

প্রথম রোগির নাড়িতে আঙুল ছোঁয়ান। কী আশ্চর্য, সেই মহাত্মার বাড়িও এই জায়গায়! মূর্তির নিচে গিয়ে দাঁড়াই। লীবার্গ ক্যামেরা মুখিয়ে আছে।—তোলো দিকি একখানা বেশ কায়দা করে। ছবি তুলেছি মহাত্মার থানে দাঁড়িয়ে—ঐ ছবি দেখিয়ে কিছু খাতির জমাতে পারব আমার স্বদেশস্থ দাদার কাছে।

দিনটা আজকের বড় ভালো। দুই পুণ্যবানের দর্শন হল। অধ্যাপক ওয়েলার আর অধ্যাপক কোরেলা। ওয়েলার আমাদের হোটেলে এসেছেন। আশি বছরের উপর বয়স—শালগাছের মতো সমুন্নত দেহ একটু বাঁকে নি। সংস্কৃতের দিকপাল পণ্ডিত, ভারতচর্চা করেন। ভারতে কোনোদিন পা ছোঁয়ান নি, কিন্তু প্রাচীন ভারত নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন, তার অন্ধিসন্ধি কোনো কিছুই অবিদিত নেই। ভারতের কয়েকটি লেখক এসে পড়েছে, তাই একেবারে পায়ে হেঁটে চলে এসেছেন। সঙ্গে বর্ষীয়সী স্ত্রী। কী লজ্জা, কী লজ্জা! আর এসেছেন তাঁর হিন্দিভাষী সহকারী শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী। সর্বত্র যেমন—ভারতের অর্বাচীন ভাষাগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র হিন্দীর জন্য যা-কিছু ব্যবস্থা। হতভাগা বাংলার খবর কে রাখে! কিন্তু এসব হল ভিন্ন কথা। শান্তিভিক্ষু সঙ্গে আছেন, তিনিও তো একটা গাড়িটাড়ি ডেকে নিতে পারতেন। অত বড় মানুষ এবং অত বয়সের মানুষটাকে হাঁটিয়ে আনেন কোন বিবেচনায়?

নত মাথায় দাঁড়াই পণ্ডিতের সামনে। পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করে। এদেশের রেওয়াজ তা নয়—হোটেলের এত মানুষ কী-জানি কী মনে করবে! সাহস হল না।

কোরেলার বাড়ি, আমরাই খবর পাঠিয়েছি, যাব বিকালবেলা। সাহিত্যিক মানুষ, অগাধ পড়াশুনা, এককালে বিপ্লব-ব্যাপারে জড়িত ছিলেন। নাৎসি আমলে অনেক কষ্ট দিয়েছে তাঁকে। দেখা করে নমস্কার জানিয়ে আসব। অনেকটা দূরে শহরের অন্য দিকে থাকেন

তিনি। দুই গাড়িতে ভাগ হয়ে যাচ্ছি। ড্রাইভার বার্লিনের বাসিন্দা —তবে দোভাষিণী লিজেল আছে, পথঘাট সে জেনে বুঝে নিয়েছে। তবু ঘুরে ঘুরে মরছি। ঠিক চারটেয় হাজির হবার কথা—সাড়ে-চারটে বাজে, এখনো হদিস পাই নে। কত পাড়ায় ঘুরলাম। একটা লাভ হল, লাইপজিগের অলিগলি অনেক দেখা হয়ে গেল।

ওঁরাও পথ তাকাচ্ছেন—কর্তা, গিন্নি এবং আর এক মহিলা—বোন সম্পর্কের হবেন তিনি। বুড়োবুড়ি তিন জনেই। আর উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে বারো-চোদ্দ বছরের বাচ্চা তিনটি। কোরেলার তিন মেয়ে।—এসো, কাছে এসো খুকিরা, কী দেখ অমন করে? সঙ্কোচ-ভরা পায়ে তিনজন এসে দাঁড়াল। পাটভাঙা পোশাক পরে সেজেগুজে আছে, মাথায় ফুল-কাটা চৌকো টুপি। তাজিকিস্তানে যে রকম দেখে এসেছি সেবার। সত্যি সত্যি তাই, কোরেলা সোবিয়েত দেশ বেড়াতে গিয়ে তাজিকিস্তান থেকে টুপি কিনে এনেছেন মেয়েদের জন্য। বাড়িতে ভারতের মানুষ আসছে তো, মেয়েরা এমনিধারা সাজ করে বসে আছে। হয়তো বা তাজিকদের সঙ্গে একই গোত্রের ভেবেছে আমাদের। কত কত ভারিক্কি জনেরই ভূগোলের জ্ঞান টনটনে, এরা তবু এক এক ফোঁটা বাচ্চা মেয়ে!

কাছে এল তারা। ইংরেজি বোঝে না, আমরাও বুঝি নে তাদের কথা। শুধুমাত্র মুখের হাসি, হেসে একটুখানি হাত বাড়ালাম। তিন বোনে হঠাৎ ছুটে পালাল।

প্রবীণোচিত আলোচনা চলছে তখন আমাদের মধ্যে: লক্ষ লক্ষ মানুষ এপার-ওপার চলাচল করে। না হলে তাদের দিন চলে না। সেজন্য বখেড়ার অন্ত নেই। নেতা হয়ে যাঁরা সব মাথায় চড়ে আছেন, তাঁদের নিজেদের পারাপার হতে হয় না—জনসাধারণের মুশকিল ধারণায় আসে না তাঁদের। খবরের কাগজের মানুষদেরও যদি যাতায়াত থাকত, লোকের দুঃখ কতকটা তবু চাউর হত কাগজে কাগজে। তার উপরে টাকা-পয়সার কড়াকড়ি দু-খণ্ডের ভিতর।

[illegible]ইনের দর যা-ই হোক, আকাশ-পাতাল ফারাক এপারের আর ওপারের মুদ্রায়। একদল কালোবাজারি আছে, তারা দিব্যি মুনাফা পিটছে। দুই অংশের মিলমিশ হোক, তারা কিছুতে চায় না।

কথাগুলো অবিকল এই। মুখের কথা হুবহু টুকে এনেছি। বলুন তো, কে বলছে কাকে? আমরা বললাম কোরেলাকে? উঁহু, কোরেলার কথা। অথচ ঠিক এই কথাই একটি অক্ষর অদলবদল না করে আমরাও বলতে পারি অধ্যাপককে। জর্মনি আর ভারতবর্ষের এক বেদনা।

তিন বোনে আবার দেখা দিল। কেন পালিয়েছিল এবার বুঝতে পারি। চা ইত্যাদি পরিবেশনের ভার নিয়েছে, সেই সব বয়ে বয়ে আনছে। একটু আগে অত নিরীহ আর অমন ভীতু, এবারে দেখে নিন প্রতাপ তাদের। জবরদস্ত পরিবেশন। বড়রা তবু খাতির-উপরোধ মানেন, 'আর না, আর না' করলে থেমে যান। এরা ক্রমাগত চাপিয়ে যাচ্ছে, কথা বোঝে না, বুঝবার তোয়াক্কাও রাখে না —এদের কেমন করে সামলানো যায়?

চুলোয় যাকগে। কোরেলার কথার জের ধরে আমরা বলছি, সাধারণ মানুষ সত্যিই যদি না চায়, আপনাদের দেশ-বিভাগ স্বার্থপর নেতারা ক-দিন জিইয়ে রাখতে পারবেন?

কোরেলা বলেন, তা ঠিক। কিন্তু সাধারণে যে অবস্থা ঠিকমতো বোঝে না। মোটামুটি খাওয়াপরাটা চললে কেউ বড় ঝামেলায় আসতে চায় না। হিটলারের সময়েও ঠিক এই। হিটলারকে ক্ষমতার আসন দিয়েছিল জনসাধারণই। সমস্ত ইয়োরোপের ঐশ্বর্য লুঠপাট হয়ে আসছে, অশ্রু আর রক্তের স্রোত চতুর্দিকে—জর্মনির মানুষ সেই সময় খেয়েদেয়ে ফেলে ছড়িয়ে খাবার ফুরাতে পারে না। ভাবল, এই অবস্থাই চলবে বুঝি চিরকাল। হিটলার অতএব পীর-পয়গম্বর তাদের কাছে। সাধারণে শুধু অতি-নিকটটা দেখে। জর্মন

বুদ্ধিজীবী প্রায় সবাই মনে প্রাণে সোশ্যালিস্ট। কিন্তু মুশকিল হল, সংখ্যায় আমরা মুষ্টিমেয়।

বললেন, আপনারা এসেছেন এদেশে, চোখের উপর অবস্থা দেখছেন। দুই জর্মনি থেকে ধরুন কুড়িজন লেখক এক মজলিসে বসলেন—ভারতীয় লেখক আপনারা মধ্যস্থ। সমস্যা তা হলে ভালো করে বুঝবেন, শুনতে পাবেন দুদিককার বুদ্ধিজীবীদের কথা। ব্যবস্থা হয় এমনিতরো কিছু ?

কোরেলার প্রথম যৌবনের বিপ্লব-জীবনের গল্পসল্প হল। ১৯১৯ অব্দে এই জর্মনি থেকে পায়ে হেঁটে দুখানা গোপন চিঠি লেনিনের হাতে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন। মস্কোয় তখন বিষম গৃহযুদ্ধ। এম. এন. রায়ের সঙ্গে দেখা হল মস্কোয়—আমাদের মানবেন্দ্রনাথ রায়। কোরেলা রায়ের খুব অনুরাগী সেই থেকে। রায় তার পরে দলছাড়া হলেন, কোরেলা তেমনি শ্রদ্ধাপর রয়েছেন। এবং ঐ সুবাদে এতকাল বাদে আমরাও বুড়া অধ্যাপককে নিতান্ত আপন বলে ভাবছি।

কোরেলার নিজের লেখা একখানা ভারিক্কি জর্মন বই দিলেন আমায়। পরদিন আমি তার প্রতিশোধ নিলাম আমার এক বাংলা বই পাঠিয়ে। আমি পড়ব না তোমার বই, তুমিও পড়বে না আমার। সেই যে শিয়াল আর বকপাখি দাওয়াত দিল পরস্পরকে—শিয়ালকে বোয়েমের ভিতর সুপ খেতে দিয়েছে যার মধ্যে মুখ ঢোকে না ; আর বককে দিয়েছে চিতানো থালায়। তেমনি ব্যাপার।

লাইপজিগের শেষ দিন। খুব পাকচক্কোর দিচ্ছি, ভক্তদল জুটবার আগেই বেরিয়ে পড়েছি। বই-পাড়াটা ঘুরে যাই একবার। কাল এসেছিলাম, বইও কিনেছি দু-চারখানা—তাতে পিপাসা মেটে না। আজও অনেক বই নেড়েচেড়ে দেখি। নিতে সাধ যায়, কিন্তু অর্থাভাব। বই কিনি নি, কিন্তু ফাউ জুটে গেল দুই প্রাণী—একটা ছেলে, একটা মেয়ে। ঐ সব প্রকাশক তরফের। বলে, বেড়াই তোমাদের সঙ্গে; দেখিয়ে শুনিয়ে দেবো, গল্পগুজব হবে। লেখক নিয়ে ওদের ঘরকন্না—লেখক শুনে কী জানি দরদ উথলে উঠল বোধ হয়।

এক মিউজিয়মে (Grassi Museum) গেলাম। পুরানো জায়গা। ভিতরে এত বস্তু, বাইরে থেকে কিছু আন্দাজ পাবেন না। নানান দেশ নিয়ে বই সাজিয়ে রেখেছে একটা জায়গায়—তার মধ্যে ভারত সম্পর্কে একখানা পেয়ে গেলাম। শাশ্বত ভারত (Immortal India)—ছবিতে ছবিতে ঠাসা অ্যালবাম। কাছেপিঠে পোর্সি-লেনের কারখানা—অতএব পোর্সিলেন-সংগ্রহ কিছু ভারিক্কি রকমের হবেই। পোর্সিলেনের বিরাট ঝাড়লণ্ঠন দেখলাম, ১৭৫০ অব্দে বানানো। ১৭৮০ অব্দের কাঠের আসবাবপত্তর। কনে বাপের বাড়ি থেকে বড় ছাপবাক্স নিয়ে আসত, কাঠের উপরে অতি সুন্দর কারুকার্য। সেই কনেরা বুড়ি হয়ে কবে মাটির নিচে গেছে—বিয়ের যৌতুক শ্বশুরবাড়ি থেকে কুড়িয়ে এনে মিউজিয়মে রেখে দিয়েছে। আমার দেশেও ঠিক এমনি বস্তু যৌতুক দিত, আমার ঠাকুরমার যৌতুকের বাক্স দেখেছি শৈশবকালে। এত সমুদ্র আর এত পর্বতের পার হলে কী হবে, মানুষের রীতিনীতি দেখতে পাই প্রায় এক রকমের। আমাদের সেকালের পালপার্বণ আমোদ-উৎসবের গল্প

বলে যান, দেখবেন বারো আনাই মিলে যাচ্ছে ওদের সঙ্গে। তামার টেবিল, তামার উপর রঙবেরঙের মিনা-করা—এক রাজার শখের বস্তু ছিল এটা, ১৮০৮ অব্দে তৈরি। ১৭৬৫ অব্দের সোফা—ঝকমকানি কিছু বাড়াবাড়ি রকমের, তা নইলে ধরে নিতে পারতাম কোনো হালের কারিগর বানিয়েছে।

মধ্যযুগের ইয়োরোপের এক-আধ ফালি হঠাৎ চোখের সুমুখে উদয় হয়। সেকালের খাসা এক চেহারা আন্দাজে আসে। মজা পাই। প্রাগ শহরে যেমন দেখে এসেছি সোনার গলি। এক রাজা দেশবিদেশের আলকেমিস্টদের আহ্বান করে এনেছিলেন সোনা বানাবার জন্য। গলিটার ঘরে ঘরে তারা সোনা বানাত। খুদে খুদে কুঠুরি, সেকেলে যন্ত্রপাতি। গলির শেষে প্রাচীন কারাকক্ষ। অন্ধকার পাতালপুরী, লণ্ঠন ধরে সতর্ক পা ফেলে ফেলে নিচে নামবেন। নদীজল দেয়ালের গা ধরে ছলছল করে বয়ে যাচ্ছে, এক পাশের ঘুলঘুলি দিয়ে জল দেখা যায়। ডিটেকটিভ উপন্যাসে যে ধরনের বর্ণনা পড়ি। কিংবা ধরুন, পোল্যাণ্ডে ওয়ারশ শহর থেকে শতেক মাইল দূরে গির্জার পাশে সেকেলে বাজারখোলা। দূর গ্রামের ব্যাপারিরা ঘোড়ায়-টানা গাড়ি বোঝাই করে মাল এনে ঢালছে। রাত্রি কাটাবে সরাইখানায়, অথবা গাছতলায় গনগনে আগুন জ্বেলে। হালের সভ্যতার উগ্র আলোর দপদপানির আড়ালে পুরানো জীবন-যাত্রা আছে এমনি সারা ইয়োরোপের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে।

লাইপজিগের বুকের উপরেও তেমনি বস্তু—এক অতি-পুরানো সেলার (Auerbachs Keller)। বাংলা নাম কি দিই—পাতালের পানশালা? ঠিক হল না, ঐ বস্তু নেই তো এদেশে। লাইপজিগে এসে এইখানে ঢুকবেন অতি-অবশ্য, এবং নিদেনপক্ষে এক কাপ কফি নিয়ে বসবেন কোনো এক টেবিলে। যত্রতত্র বসে গেলেই হল না, তৎপূর্বে ট্যাঁকের অবস্থা বিবেচনা করে নেবেন। রাস্তার সমতলে

কোনো এক ঘরে বসবেন তো কফি প্রায় বাজার-চলিত দামে মিলবে। যত পাতালে নামবেন, ঘর যত স্যাঁতসেঁতে এবং আসবাব যত মলিন, কফির দাম তত চড়া। নেমে যাচ্ছি আমরা—পাতালমুখো—দোতলা, তেতলা, তার পরে চৌতলা। সেকালের সাদামাঠা ভারি ভারি খাড়া চেয়ার, মোটাসোটা ওজনদার টেবিল। কত শতাব্দী হয়ে গেল, পাথরের মতো এক জায়গায় অনড় হয়ে রয়েছে। বিদ্যুতের বাতি জ্বলছে, অতএব আলোর অসুবিধা নেই এখন এই যুগে। তবু সেই আর্দ্র অন্ধকার রহস্যময় সেলারের খোপে খোপে সবাই পানপাত্র নিয়ে বসে গেছেন—আমোদ-ফূর্তিই নয় শুধু, দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্যের বড় বড় আলোচনা—সেদিনের সেই চিত্র পরিষ্কার দেখতে পাই।

ভুঁয়ের লেভেলে খেলে যে দাম হত, হিসাব করে দেখলাম, তার ডবল পড়ে গেল এই জায়গায়। তবু কিন্তু অনেক মুনাফা। খেলাম কোথায় জানেন—গ্যেটে যে খোপটায় বসে খেতেন, খেতে খেতে যেখানে মনের মধ্যে ফাউস্টের কল্পনা এসে গেল। শুধু গ্যেটে নয়, বিসমার্ক নেপোলিয়ঁ এবং আরও বিস্তর তা-বড় ব্যক্তি বসে গেছেন এই অন্ধকূপের তলে। খোঁপে খোপে তাঁদের নাম লেখা। প্রেমিকারাও এসে জুটতেন। প্রেমপত্র আসত গোপন ঠিকানায়। তেমনি অনেক প্রেমের চিঠি ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে ছবির মতন। শতাব্দী পার হয়ে গেল, সেই সব ইতিহাসের মানুষের গোপন অন্তরের খবর প্রকাশের কী বাধা এই একালের কাছে? দেয়াল-ভরা সেকালের ফ্রেস্কো ছবি। অভিনব পরিবেশ—হঠাৎ যেন সেকালের মানুষ হয়ে যাই।

বড় বড় দিকপালেরা রাত জেগে স্ফূর্তিফার্তি করে সকালবেলা ঢুলুঢুলু নয়নে বেরুচ্ছেন—দেখতে দৃষ্টিকটু লাগে, লোকের কাছে ইজ্জতহানি হয়। তার জন্যেও উত্তম ব্যবস্থা। সেলারের লাগোয়া বড় রাস্তা—সেই রাস্তার নিচে দিয়ে সুড়ঙ্গ। সেলারের সর্বনিম্ন তলা দিয়ে সুড়ঙ্গপথে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে ফুটপাথের ওদিকের এক বড় বাড়িতে

ঢোকা যেত। সেখানে সাফসাফাই হয়ে ধোপধস্ত পোশাক পরে নিরীহ ভালোমানুষ সেই ভিন্ন বাড়ির ফটক দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, কেউ কিছু টের পাবে না। এই ব্যবস্থা চলে এসেছে। সুড়ঙ্গপথ নিখুঁত ছিল এই সেদিন অবধি। লড়াইয়ের সময় সামনের রাস্তার উপর বোমা পড়ে পুকুর হয়ে যায়। নিচের সুড়ঙ্গও চুরমার হয়ে গেল। এখন রাস্তা মেরামত হয়েছে, কিন্তু গোপন সুড়ঙ্গ ভরাট হয়ে গেছে ; চলাচলের উপায় নেই। সুড়ঙ্গের মুখটায় মোটা গরাদের দরজা—দরজায় ভারি তালা ঝুলিয়ে পথ পাকাপাকি বন্ধ করে দিয়েছে।

রওনা এবারে বার্লিনমুখো। দেখবার অনেক বাকি থেকে গেল। কিন্তু তিনটে দিনে—চুপচাপ দাঁড়াই নি এক মুহূর্ত—এর বেশি আর হয় না। তল্পিতল্পা তুলে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি। গাড়ি থামিয়ে পথের উপরের আরও দু-একটা বস্তু দেখে নেব।

যেমন জর্মন-লাইব্রেরি। ওয়েলার পণ্ডিতমশায় বলেছিলেন, জর্মন জাতের সকলের বড় গৌরব হল জর্মন-লাইব্রেরি। বলুন তো, ঐ মানুষের মুখে এ-হেন উক্তির পর এক নজর না দেখে যাওয়া যায়? দুনিয়ার যেখানে যে জর্মন বই ছাপা হয়েছে, তার অন্তত একটি খণ্ড আছে এখানে। মাটির নিচেও ঘর—তা ছাড়া একতলা, দোতলা ও তেতলা। তিন-শ কর্মচারি। বইয়ের সংখ্যা পঁচিশ লাখ। ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করছে ঘরে ঘরে—নিঃশব্দ, একটা আলপিন ফেলে দিলেও বোধকরি আওয়াজ পাবেন। পা টিপে টিপে আমরা সন্তর্পণে এঘর-ওঘর করছি। তিনতলায় মিউজিয়াম—সেটা বন্ধ আছে আজকে, সেখানে যেতে পারলাম না। দোতলাতেও বিস্তর মজার সংগ্রহ। অক্ষরের জন্ম—ধাপে ধাপে কেমন তার চেহারা পালটাচ্ছে, এক থেকে অনেক হচ্ছে। মিশর-লিপির আগে অক্ষরের কী চেহারা ছিল, ঐ লিপিতে পৌঁছল কোন অনুক্রমে। ছাপা বইয়ের বিভিন্ন পর্যায়—মুদ্রণ কেমন করে ধীরে ধীরে নিখুঁত শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়াল। ছাপাখানার মডেল—সেই গোড়ার আমল থেকে। নানান দেশের লিপি-সংগ্রহ।

চীনের চিত্রলিপি, তালপাতায় লেখা ভারতের পুঁথি। কোরিয়া ও জাপানের পুরানো পাণ্ডুলিপি। হাতে লেখা শাহনামা। এবং পুঁথিপত্র শুধু নয়, প্রাচীন পাথুরে মূর্তিও বিস্তর।

তার পরে শহরের শেষ। পত্রঘন গাছপালা, মিষ্টি-মিষ্টি ছায়া। কলকাকলী আসছে—পাখির? বাগানের মধ্যে আজ অপরাহ্ণে কত পাখি জমেছে গো!

গাড়ি ঢুকে পড়ল বাগানে। পরীরাজ্য আপনারা স্বপ্নের মধ্যে কালেভদ্রে হয়তো দেখেছেন। আজকে জাগ্রত চোখ মেলে এই দেখুন। জনপদের মধ্যে আনন্দ থাকে টুকরো-টুকরো ছড়ানো—এখানে-ওখানে, এবাড়ি-ওবাড়ি। সব আনন্দ একটা জায়গায় এসে জমেছে। আনন্দের হাট—রবিবারটা দেখছি হাটবার ওদের।

জায়গাটার নাম আভেনসি (Avensee), যার মানে হল সুন্দর সবুজ লেক। ছোট লেক কেন্দ্র করে মস্তবড় বাগান। শহরের প্রান্তসীমায় মনোরম সবুজ জায়গা। সব সোশ্যালিস্ট দেশেই ছেলে-মেয়েদের পায়োনীয়র-দল—আমোদ-উল্লাসের ভিতর দিয়ে জীবন গড়ে তোলবার রাজসূয় আয়োজন। এ-রাজ্যেও তেমনি দল গড়েছে। পায়োনীয়র ছেলেমেয়েরা জমে এসে এখানে। তাদের আয়োজন, কর্তাব্যক্তি তারাই। আপনি-আমি আসব এখানে দর্শকমাত্র হয়ে। পয়সা ফেলে কফি কিনে খেতে পারি—তারাই দোকানদার। টিকিট কিনে রেলগাড়িতে চড়তে পারি—তাদের গাড়ি, শুধুমাত্র ড্রাইভারটি ছাড়া আর সমস্ত কাজ তারা করছে। বালখিল্য টিকিটবাবু টিকিট দেয়, চেকারবাবু গেট আটকে টিকিট দেখে, স্টেশনবাবু নিশান তুলে গাড়ি ছাড়ার হুকুম দেয়, গার্ডবাবু হুইশিল বাজিয়ে তড়াক করে গাড়ির উপর উঠে যায়। ঠিক যে-রকমটি হতে হয়, খুঁত পাবেন না। যা দেখছি, বড়-রেলগাড়ির কাজে লাগিয়ে দিলেও ঠিক চালিয়ে যাবে। লেকের জলেও ভারি হুল্লোড়। ঝাঁপাচ্ছে, সাঁতার কাটছে।

মোটরলঞ্চ চালাচ্ছেও ছোটরা, নৌকো বাইছে। ছোট-বড় কত সব নৌকো। চিত হয়ে শুয়ে ঐ দেখুন দু-হাতে দাঁড় বাইছে একজন। ভারিক্কি ছেলেমেয়েরাও আসে। সাঁতারের পোশাকের নামে-মাত্র বসনে বিস্তর মেয়ে। এদেশে এসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার—নজর তুলেও কেউ দেখবে না। আমাদের দেশ হলে প্রবীণদের নির্ঘাত পতন ও মূর্ছা।

বড়রাও বিস্তর জমেছেন। গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। গাছের ছায়ায় এখানে-ওখানে গাড়ি রেখেছে। মা-বাপ ও মাস্টারমশায়রা ছোটদের সুপারিশ ধরে এসেছেন তাদের রাজ্যে। দু-এক আঁজলা ছেলেমি ছিটিয়ে বয়সের পক্কতা একটু সবুজ করে নেবেন বলে। এসে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কিংবা এইটুকু এইটুকু ছেলেমেয়ের বীরত্ব দেখেন লেকের কিনারে হাঁ করে দাঁড়িয়ে। কেউ তাঁদের ডাকে না, এ-জায়গায় কোনো খাতির নেই। খাতির কেন হবে বলুন। ক্ষমতা আছে শিশুদের মতন—হাসতে পারেন অমন খিলখিল করে, নাচতে পারেন, ছুটতে পারেন? কিসে বড় হলেন তবে তাঁরা—বয়সে? কিন্তু বয়সের বিচার এই এলাকার ভিতর নয়। এখানে এসেই ছোট্ট এতটুকু হয়ে যেতে হবে।

রেলগাড়ি যাচ্ছে লাইনের উপর দিয়ে। ঝিকঝিক, ঝিকঝিক। কত মানুষ নিয়ে যাচ্ছে। এই একটা চলে গেল, আবার দেখুন আসে ওই। ঝিকঝিক, ঝিকঝিক। লেক-সমেত এত বড় পার্কটা বেড় দিয়ে রেললাইন। খোলা গাড়ি—গাড়ির মানুষরা হেসে চেঁচিয়ে রুমাল উড়িয়ে উল্লাস ছড়াতে ছড়াতে যায়। হেন অবস্থায় শিষ্ট সভ্য হয়ে কতক্ষণ থাকা চলে বলুন? আমরাও চড়ব রেলগাড়িতে। সে বড় কম হাঙ্গামা নয়—যেখানে সেখানে রেলগাড়ি থামে না, সেই মূল-স্টেশন অবধি যেতে হবে। বেশ খানিকটা দূর। অনেকে যাচ্ছে, আমরা পিছু নিয়েছি। বারো-বছুরে টিকিটবাবু টিকিট দিলেন, চেক হল সেই টিকিট। সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি প্লাটফরমে। ঝিকঝিক

ঝিকঝিক—আসছে গো, ঐ আসে রেলগাড়ি। গার্ডবাবু নেমে এসে স্টেশনবাবুর সঙ্গে মোলাকাত করলেন কি-একটু। নিশান উড়ল। আমরা চলেছি—দেখুন, চলেছি এই যে! ঝিকঝিক, ঝিকঝিক। প্রবীণ বিচক্ষণ মানুষটি আর নই। অনেক কাল আগে এক দূর অতি-দূর গাঁয়ে কিশোর বয়সটা ফেলে এসেছিলাম, হাজার হাজার ক্রোশ দূরে জর্মনি দেশে সেই বস্তু আজকে ফিরে পেয়েছি।

আর নয়। বেলা পড়ে আসে, ছুটুক এবারে মোটর। দু-পাশে দিগ্‌ব্যাপ্ত মাঠ। ফসল ফলেছে, নতুন চারাও লাগিয়েছে কোথাও। ঘন সবুজ সারা অঞ্চল। দূরে দূরে গ্রাম দেখা যায়—ফ্যাক্টরির চোঙা কিংবা গির্জার চূড়া। অথবা আকাশভেদী কোনো প্রাচীন ক্যাসল। ইস্কুলের কাল থেকে সাহেবি বইয়ে ছবি দেখছি, এবারে সেই সমস্ত চোখের উপর। রাস্তা কী চমৎকার! চালাচ্ছেও মরিয়া হয়ে। ঘণ্টায় সত্তর-আশি মাইল নিতান্তই নস্যি এদের কাছে। যেখানে দু-রাস্তায় কাটাকাটি, সেখানে পুল বানিয়েছে—একটা রাস্তা অন্যের মাথার উপর দিয়ে আড়াআড়ি চলে গেল। লোকে ষোলো আনা পথের নিয়ম মেনে চলে। এত জোরে চালিয়েও দুর্ঘটনা তাই বড় একটা শোনা যায় না। রবিবার—ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বার দিন আজকে। সাইকেল ও মোটর-সাইকেল চেপেই বা কত লোক এতদূর এসেছে, সাইকেল রাস্তার ধারে ফেলে ঘাসের উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। আমাদের দুটো গাড়ি তীরের মতো ছুটছে দেখে—চেনা নেই জানা নেই—হাত নেড়ে অভিনন্দন জানায়।

গাড়িতে রেডিও, ড্রাইভার রেডিও চালিয়ে দিল। স্ফূর্তিবাজ ছোকরা, রাস্তায় বেরুলেই গানে পেয়ে যায় তাকে। গাড়ির যত বেগ বাড়ে স্ফূর্তি বেড়ে যায় ততই, ওস্তাদের মতন মাথা দুলিয়ে স্টিয়ারিং-চাকার উপর তাল দেয়। এমনি ভারি ভদ্র, হেসে ছাড়া কথা বলে না। আমি বসি সামনের সীটে তার পাশে, চারিদিক দেখে দেখে অবিরত কলম চালাই। সকৌতুকে বারংবার সে আড়চোখে তাকায়। পার্শ্ব-বিহারী বলেই নেকনজর যেন আমার উপরে অধিক।

চারটি মেয়ে বিষম বেগে রুমাল নাড়ছে আমাদের দিকে, আর চেঁচাচ্ছে। বিদেশি বলে টের পেয়েছে বুঝি? ভিন দেশের মানুষের

বড় খাতির, বিশেষ করে ভারতের আমরা এই কালো মানুষ। রাস্তার ঠিক উলটো দিকে ফসলভরা গমের খেতে আর-এক জোড়া—বোতল থেকে গ্লাসে বিয়ার ঢেলে খাচ্ছে বোধ হয়। বিয়ার অতি-সাধারণ পানীয়, সাদা জল এ-সব দেশে প্রায় অচল, তৃষ্ণা পেলে লোকে বিয়ার খায়। মেয়েরা তত বেশি খায় না—মিনারেল ওয়াটার, আপেল-রস খায় অনেকে। চষা খেতের উপর প্রকাণ্ড ষাঁড় দিয়ে বিধে টানিয়ে নিচ্ছে ঐ ষাঁড়ের চেয়ে প্রকাণ্ডতর এক মেয়ে—আজ্ঞে হাঁ, মেমসাহেব চাষী। পিছনে একজন বিধে-টানা লাইনের ভিতর বীজ দিতে দিতে আসছে। ষাঁড়ের চাষ এই প্রথম দেখলাম। মোটর বিগড়ে গেছে কাদের মাঝপথে। ওয়াগনে যন্ত্রপাতি ও মিস্ত্রি এসে মেরামত করছে।

লীবার্গ সহসা বলে ওঠে, রোখো—রোখো। বাঁয়ে ঘুরতে হবে এবারে।

কেন, কী ব্যাপার? বাঁয়ের গাঁয়ে এক সাহিত্যিক থাকে, তার বাড়িটা ঘুরে যাই চলো। বড্ড খুশি হবে। লীবার্গের বন্ধু লোক। অস্ট্রেলিয়ায় পরিচয়, কী-একটা কাজ করত সেখানে। চাকরি-বাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে এসে পুরোপুরি লেখা নিয়ে আছে এখন।

লীবার্গ বলে, চলো। তাকে বলে রেখেছি, ফিরতি পথে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

নিতান্ত গ্রাম জায়গা, তবু কিন্তু খেত-খামারের পাশে পাশে পাকা রাস্তা। পিচ দেওয়া না হলেও ইটে বাঁধানো। মোটর চলাচল করে। গেঁয়ো চাষীদের মোটর-ট্রাক—মোটর মুড়ি-মুড়কির শামিল হয়ে উঠছে দিনকে-দিন। লীবার্গ পথ ঠিক করতে পারে নি। এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরে মরছি। নেমে পড়ে একে তাকে জিজ্ঞাসা করে। আমাদের পক্ষে ভালো—পাড়াগাঁয়ের অন্ধিসন্ধি দেখতে দেখতে যাই। আমাদের দেশের পল্লীও মোটামুটি এমনি। এখানে অতিমাত্রায় ছিমছাম, এবং মানুষজনের পোশাক পরিপাটি—এই যা তফাত চোখে লাগে।

অবশেষে বাড়ির খোঁজ হল। ছোটখাট বাগানের প্রান্তে টালি-ছাওয়া বাংলো প্যাটার্নের ঘর ক-খানা। এমনি সব পাড়াগাঁয়ে বাগান ছাড়া গ্যাড়া-বাড়ি বড় একটা দেখি নে।

লেখকমশায় বাড়ি নেই, বউঠাকরুনের সঙ্গে দেখা হল। কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে বাড়ি ঢুকবার পথের ঘাস ছাঁটছিলেন তিনি। মোটর থামতে চকিত হয়ে তাকালেন। লীবার্গের সঙ্গে পুরানো চেনা— উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন তাকে দেখে। আমরাও নামছি। ইতিমধ্যে তোয়ালে ও খুপরি ফেলে ছুটে এলেন রাস্তা অবধি : এত দূর থেকে এলে, কিন্তু বাড়ির মালিক যে নেই! কাল রাত্রি এবং আজ সমস্ত সকাল বসে বসে একটা গল্প শেষ করলেন। একা গিন্নিকে শুনিয়ে সুখ হল না। লাঞ্চ খেয়ে বার্লিনে ছুটেছেন—গুণীদের পড়ে শুনিয়ে কোনো এক কাগজে গছিয়ে আসবার জন্য।

লীবার্গ চুকচুক করে : ইস, সময় জানিয়ে চিঠি লিখে আসতাম যদি!

বেশ হাসিখুশি বউঠাকরুন। বয়সও বেশি নয়, একটি ছেলের মা। সেই ছেলে থপথপ করে বারাণ্ডায় বেরিয়ে এল। গভীর স্নেহে বাচ্চার দিকে তাকিয়ে শ্রীমতী বলেন, ওই দেখুন, ছোটকর্তা ডাকছেন আপনাদের। বলুন এবারে, ঢুকবেন, না—ফিরে চলে যাবেন। দেখেন কী, দিগ্‌গজ লেখক হবেন উনিও। হাতের কাছে কলম পেলেই কাগজে খোঁচাখুঁচি করেন। উঃ, আমার কী জ্বালা— এক লেখক নিয়ে হিমসিম, আবার একটি উদয় হচ্ছেন!

জ্বালার চোটে হেসে উঠলেন। হাত এড়ানো যায় না : ঘরে উঠে এক কাপ কফি খেয়ে যান অন্তত। লিখবার ঘর, আয়তনে বড্ড ছোট। দেয়াল ইটের নয়, কাঠের নয়—মালুম হচ্ছে বইয়ের। বই ছাড়া একটা ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা নেই। কত রকম কায়দায় বই রাখা যায়, দেখে আসুন গিয়ে। সোজা, কাত, কোনাকুনি, আড়াআড়ি। সারা দেয়ালে কুলায় নি তো ছোট্ট টেবিলের পনেরো আনা জুড়ে

বই। শ্রীমতী হাসতে হাসতে অনুযোগ করছেন: দুটো ভালোমন্দ কথা বলব, তারও কি ফুরসত আছে? কাজকর্ম না থাকে তো বই নিয়ে বসল। চোখ ঢাকল বই সামনে খুলে, আমার যাতে নজরে না আসে। ভেবেছিলাম, ছেলেটা বড় হলে তার সঙ্গে কথার ফোয়ারা ছোটাব। যা গতিক, সে-ও বাপের পথ নিয়ে নেবে।

রাস্তায় পড়েছি আবার। খেতখামার ছাড়িয়ে এসে জঙ্গল। পরিচ্ছন্ন পাইন-বন, গাছের গোড়ার দিকটায় ডালপালা ছাঁটা। কত মানুষ আড্ডা দিচ্ছে; মোটর এনেও ঢুকিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। জঙ্গল এরা ভারি যত্নে রাখে, গাছপালা যাতে বাড়তে পারে। জঙ্গল বড় সম্পদ দেশের। জঙ্গলের ধারে লেক, যেমন ঐ একটা দেখে এলাম লাইপজিগে। এই বাসন্তী অপরাহ্নে, জল পেয়েছে তো গৈরিকবরন মেয়েপুরুষের হুল্লোড়। রাস্তার পাশে পাশে নয়ানজুলি দেখা যাচ্ছে ঠিক আমার নিজের গ্রামের মতো। শালুক ফুটেছে। আর-এক রকমের গুঁড়ি-গুঁড়ি সাদা ফুল—জলের উপরটা ধবধবে সাদা হয়ে গেছে একেবারে। খরস্রোত নদী পার হলাম একটা—নদীর দু-কূল ছুঁয়ে ফসলের খেত। আবার এক লেক, আর অগণ্য মানুষ। এল্‌ব নদী পার হচ্ছি—নদী অনেক চওড়া এখানে। পুল ভেঙে দিয়েছিল—অর্ধেকটা বানিয়ে কাজ চালানোর মতন করেছে, বাকি অর্ধেক বানিয়ে আসছে ওদিক থেকে। নদীর ধারে ফ্যাক্টরি। জলস্রোত পেলেই পাশে ফ্যাক্টরি বানিয়ে বসেছে, এই এক কাণ্ড দেখছি এদের। জর্মনি কত বড় শিল্পোন্নত দেশ, এই গ্রাম-যাত্রায় সেটা আরও ভালো মালুম হল। অদূরে অনেক চোঙা দেখতে পাই, বড় বড় ফ্যাক্টরি। কোনো এক নামি জায়গা—ভাইটেনবার্গ (Wittenberg)—ডান দিকে রাস্তা বেরিয়ে গেল, মোড়ের মাথায় নাম লেখা আছে। সন্ধ্যা হব-হব—আরও কষে দৌড় দিয়েছি আমরা। ঝুপসি-ঝুপসি গাছ দু-পাশে, হলদে ফুলে পাতা দেখবার জো নেই।

হলুদ-গুঁড়ো গাদা গাদা রেখে দিয়েছে যেন, ভুঁই দেখতে দেয় না। কত মেয়ে কত পুরুষ রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে ঐসব হলুদ-তলায় গল্প-গুজব করছে। বার্লিন থেকেই এসেছে হয়তো, ছুটির দিনে ষাট-সত্তর মাইল গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। সূর্য ডোবে পাইন-বনের আড়ালে। এমনি দূরের দেশে পাইন-বনের মধ্যে সন্ধ্যা-হওয়া আর ঘটবে না জীবনে। কী-ই বা ঘটবে, বঞ্চনাই শুধু জীবনের বাকি মেয়াদটুকু—আমার গাঁয়ের বিলে সূর্য-ডোবাও দেখব আর কোনো দিন?

সব মানুষকে যেন এখন গতির নেশায় পেয়েছে। ভর-সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার নেশা। আমাদের আগেপিছে আরও বিস্তর মোটর—সাঁ করে কাটিয়ে যায় একবার, আবার পিছিয়ে পড়ে। তরুণ ড্রাইভার হার মানবার মানুষ নয়—বিদেশি নিরীহ চড়নদার ক-টি নিয়ে গাড়ি ছাতু-ছাতু হয়ে যায়, সে-ও স্বীকার। গগলস-পরা মেয়ে চালকের পিছনে বসে চালকের দু-কাঁধে হাত দুটি মেলে উল্কার বেগে ছুটেছে। এরই মধ্যে সহসা এক স্থিরচিত্র। গাছতলায় ঘাসের উপর সতরঞ্জি পেতে তরুণী বই পড়ে শোনাচ্ছে, দুই গালে হাত রেখে মুগ্ধ হয়ে শুনছে ছেলেটা। পড়া শুনছে অথবা মুগ্ধ হয়ে দেখছে পড়া। পুল ভেঙে দিয়েছে একটা মাথার উপরের, সেটা আর মেরামত করে নি, আড়াআড়ি রাস্তাটা বাতিল। আরও একটা দেখতে পাচ্ছি অমনি। আরও, আরও। বার্লিনের কাছাকাছি এসেছি অতএব, লড়াইয়ের আক্রোশের উগ্রতর চেহারা।

উঃ, গাড়ির বেগ অসম্ভব রকম বাড়িয়েছে, যেন উড়ে চলেছে সকলকে পিছনে ফেলে। রাস্তার বড় একটা বাঁক। ঘন জঙ্গল দু-পাশে। দেখতে দেখতে মাঠ এল। একটা পুলের খানিকটা কেটে দিয়েছে যেন—অমনি ঝুলছে, মেরামত হয় নি। ফুল দোলাচ্ছে আমাদের দিকে কয়েকটা মেয়ে, খিলখিল করে হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। এক মাঠে গোরু ও ঘোড়া চরছে বিস্তর। ঘোড়ার রঙের রকমফের আছে, কিন্তু প্রতিটি গোরু সাদা-কালোয় মেশানো।

অজস্র উইলো-গাছের নিচে দিয়ে যাচ্ছি। গ্রাম—অর্থাৎ আমাদের আধা-শহর জায়গা। লাঠি হাতে হাঁসের পাল তাড়িয়ে চলেছে বুড়ি। আর-এক বুড়ি ছাগলের গলার দড়ি ধরে টানছে। দেবশিশুর মতো ফুটফুটে বাচ্চারা খেলা করছে পথের ধারে।

বার্লিনে ঢুকে পড়লাম আজ আট-দিনের-দিন। রাস্তার ধারে ধারে মরচে-ধরা পুরানো লোহালক্কড়। পাহাড়প্রমাণ। ভাঙা ঘরবাড়ি থেকে উদ্ধার করে এনে গাদা দিচ্ছে। লীবার্গ বাঁ-দিকে হাত দেখায়: ঐ যে খোঁড়াখুঁড়ি করছে, ওখানে বিস্ফোরক জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। টেলিফোনের কথাবার্তা চুরি করে শোনবার জন্য নানান কলকবজা বসিয়েছিল। কী সুখে রয়েছি তবে বোঝো।

দূর অঞ্চলে ঘোরাঘুরির দায় ঘুচল। এখন আর একটা-দুটো কাছা-কাছি জায়গায়। বার্লিনের ঘাঁটি ছাড়তে হবে না, বার্লিন থেকেই যাতায়াত চলবে। কাল পটসডামে যাচ্ছি। তার পরে পোল্যাণ্ড-সীমান্তের এক গাঁয়ে যাব সমবায়ের চাষবাস দেখতে—সোবিয়েতের কোলখোজের কায়দায় যা গড়ে তুলছে। জর্মনি ছাড়বার সময় হয়ে আসে। এর পর কোন দিকে ?

পোল্যাণ্ডের ডাক এসেছে, পোলিশ লেখক-সমিতি দাওয়াত পাঠিয়েছেন। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার কী খবর ? তারা যে নড়ে বসে না। খবরাখবর নেওয়া হচ্ছে, তদ্বির-তল্লাস হচ্ছে সদলে ওদের দূতাবাসে গিয়ে।

ভালোমানুষ পাঠক অবাক হচ্ছেন। 'নেমন্তন্ন করো, নেমন্তন্ন করো'—বলে কাতরানি। ডেকে পাঠায় যদি যেয়ো সেখানে ; না ডাকলে গুড়গুড় করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। নেমন্তন্ন আদায়ের জন্যেও তদ্বির—কী মুশকিল !

যতদিন ঘরের কোণের নিরীহ মানুষটি ছিলাম, আমিও ঠিক ঐ ভাবতাম। দেখে দেখে শিখছি। তদ্বির-সম্রাটদের কাজকর্ম দেখে দেখে দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্তি হয়েছে। লেখক হিসাবে বিশ্বখ্যাত—নিদেন পক্ষে, স্বদেশখ্যাত হবেন তো পৃথক প্রণালী আছে। ন্যাড়া কলম চালিয়ে সে-কাজ হয় না। খ্যাতি ও পুরস্কারের জন্য ভালো করে লেখাই একমাত্র বস্তু নয়। এমন কি প্রধান বস্তুও নয়। ভালো লেখেন তো তার ফলে কিছু সুবিধা হবে তদ্বিরের পক্ষে। কিন্তু মন্দ লিখলেই যে গোল্লায় গেলেন, সেটা কিছু নয়। দোহাই ধর্ম, আমি শুধু এদেশের উপর চোখ ঠারছি নে। নিজের দেশকে গাল দেওয়ার অধিকার নিশ্চয়ই আছে নিজেদের বউকে ঠেঙানোর মতো। কিন্তু সারা দুনিয়া

জুড়েই ঐ এক রীতি। 'সত্যমেব জয়তে' এটা হল এক নম্বর ধাপ্পা। ঐ রকম জেনে-বুঝে সত্যসেবীরা ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্ত থাকবেন, ধুরন্ধরদের পক্ষে প্রতিযোগিতা কম হবে—এই হল আসল উদ্দেশ্য।

যাকগে, এত আগডম-বাগডম বকলাম বিষম মনোদুঃখে। এত করেও চেক লেখক-সমিতির সাড়া মেলে না। পুনশ্চ এক লম্বা টেলিগ্রাম। যার মর্ম হল, কী সুযোগ হেলায় হারাইতেছ তাহা তোমরা জান না। দরজার গোড়ায় দিগ্‌গজ লেখককুল। ভারত হইতে এত পথ চলিয়া আসিয়াছি, এখন অল্পস্বল্প ছাড়িলেই আমাদিগকে দেশের অন্দরে লইয়া তুলিতে পার।··

বার্লিনে ফিরে এসে এবার উঠেছি, হোটেল এডলনে নয়, সরকারি অতিথিশালায়। জায়গা ছিল না বলে আগের বার হোটেলে যেতে হয়েছিল। ঝকঝকে নতুন বাড়ি, ঠিক সামনে লন, লনের এদিকে-সেদিকে ফুল ফুটে আছে। চেনা জায়গা, আগেও এসেছি এই তল্লাটে—সেই যেদিন রেডিও-য় বলতে এলাম। লন হয়েছে গোয়েবলসের ভাঙা বাড়ি ও অফিসের রাবিশ সরিয়ে। মনে পড়ছে এবার? এত রঙবেরঙের বাহারের ফুল—কিন্তু যে মাটির উপর ফুটেছে, তার পরতে পরতে মানুষের রক্ত। আমার ঘরের ঠিক সামনাসামনি রাস্তাটা পার হয়ে হিটলারের চ্যানসেরি। সোজাসুজি সেই অবধি নজর চলে যায়, এডলন হোটেলের মতন ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হয় না। ঘাড় ফেরাবেন তো চেয়ে দেখুন আর-এক দাঁত-বের-করা দৈত্যাকার অট্টালিকা—গোয়েরিঙের জাঁকজমকের অফিস। কোন নিয়তি আমায় এনে ফেলল ভুবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাড়ার মধ্যে—কয়েকটা বাড়ির এদিকে-সেদিকে ঘুরে মরি। চ্যানসেরির পিছনে অনতিদূর থেকেই পশ্চিম-বার্লিন। সেদিক থেকে রাত্রে আলোর বিজ্ঞাপন চমক দেয়। ভারি জৌলস।

চ্যানসেরির জায়গাটায় লীবার্গকে টানতে টানতে নিয়ে চললাম।

মাঠ, জঙ্গল। বড় বড় কংক্রিটের চাঁই পাহাড়ের মতন উঁচু হয়ে আছে। কাঁটা-তার দিয়ে ঘেরা, তারের ভিতরে গুঁড়ি মেরে আমরা দু-জন ঢুকে পড়েছি ভিতরে। পথ-চলতি লোকে কেমন চোখে তাকাচ্ছে—আমাদের পাগল-টাগল ঠাওরাল নাকি? লীবার্গ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি সন্তর্পণে চলেছি ভাঙাচুরোর ভিতরে। সাপে খায়, না বাঘ লাফিয়ে টুঁটি চেপে ধরে, কে জানে? মাটির নিচে হিটলারের ঘর বানিয়েছিল, ছাত ধ্বসে পড়ে খানাখন্দ হয়ে রয়েছে। উইলোগাছ একটা বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক এই জায়গার উপর। সুরঙ্গ দেখতে পাই পাতালের দিকে, কতদূর গিয়েছে জানিনে। হয়তো বা হিটলারের দেহ পড়ে রয়েছে ভাঙাচুরোর মধ্যে কোথাও, অন্ধকারের তলা থেকে হুঙ্কার উঠবে, এগিয়ো না—খবরদার!

আর কী আশ্চর্য, বলছেও আমাকে ঠিক তাই: দাঁড়াও ওখানটা—এগিয়ো না। অন্ধকার সুরঙ্গের কেউ নয়, লীবার্গ দূর থেকে হাঁক দিয়ে বলছে। ক্যামেরা তাক করেছে, আমার ছবি তুলে নেবে এই জায়গায়।

সকাল সাড়ে-নটায় পটসডাম রওনা হলাম। সবাই নয়—আমি, রাও এবং রাও-পত্নী উমা। এবং মুরুব্বি ও দোভাষি হয়ে যাচ্ছে লীবার্গ। অতএব একটা গাড়ি—বড় গাড়িটা নিয়েছি। গান-পাগলা হাসি-মুখ সেই ড্রাইভার। পোশাক-আশাক আমাদের চেয়ে অনেক ভালো—চোখে চশমা, হাতে ঘড়ি তো থাকবেই কাজের গরজে। সিগারেট খায় ঘন ঘন। চকোলেট কিনে তাকেও দেওয়া হয়, স্ফূর্তিতে সে একসঙ্গে সবগুলো মুখে পুরে দেয়। লাইপজিগে সেই যে পায়োনীয়রদের সবুজ-লেক দেখতে গেলাম—রেস্তোরাঁয় বসবার জায়গা পাই নে, লোক কিলবিল করছে, দেখি, ওরা দুই ড্রাইভার বাইরে থেকে চেয়ার তুলে এনে বসিয়ে দিচ্ছে আমাদের জন্যে। এ কাজ ওদের নয়, হুকুম করলে বিগড়ে যেত, ভালোবেসে এবং

ভারতীয় লেখক বলেই কষ্টটা করল। কোন এক জায়গায় যাব, পথ ঠাহর হচ্ছে না, গাড়ির খোপ থেকে ঢাউস ম্যাপ বের করে আঙুল বুলিয়ে কিছুক্ষণ নিরিখ করে দেখে নেয়। তারপরে ম্যাপ ভাঁজ করে তুলে রেখে দিল বেপরোয়া চালিয়ে—আপনি মরুন আর গাড়ি চুরমার হোক। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে যেন পাগল হয়ে যায়, স্পীডো-মিটারের কাঁটা শেষ-মুখে পড়ে লহমার ভিতর। কোন রাস্তা কোন দিকে গেছে, কোন জায়গা কত কিলোমিটার দূরে—মোড়ে মোড়ে সবিস্তারে লেখা। হঠাৎ বা সবলে ব্রেক কষে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিয়ে উত্তম রূপে পড়ে বুঝে নিয়ে আবার ছুটিয়ে দিল। হোটেল-রেস্তোরাঁয় এতাবৎ আমরা যেখানটায় বসি, ছুই ড্রাইভার তার পাশের টেবিলে বসে আলাদা হয়ে। আজকে সে একা মানুষ—পটসডামের হোটেলে এক টেবিলে মিলেমিশে খানায় বসলাম।

পটসডাম চিনতে পারলেন না? সেকালে প্রথম-মহাযুদ্ধের আমলে কাইজার প্রভুরা বার্লিনে থাকতেন না, পটসডামে ঘাঁটি ছিল। আর এই আমলে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের পরে তিন শক্তিতে চুক্তিপত্র হল এই জায়গায় বসে। সোবিয়েত আমেরিকা আর ইংলণ্ড। স্ট্যালিন ট্রুম্যান আর চার্চিল সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে বিবিধ শলা-পরামর্শ অন্তে এই জায়গার এক বাড়িতে বসে সই করলেন।

বার্লিন থেকে পটসডাম দূর বেশি নয়, মাইল পঁচিশের ভিতর। কিন্তু যেতে হবে প্রায় ডবল। পশ্চিম-বার্লিন ফুঁড়ে সোজাসুজি পথ—কিন্তু ভিন্ন এলাকা হওয়ার দরুন সে পথে বিস্তর বায়নাক্কা। তাই পশ্চিম-বার্লিন এড়িয়ে ঘুরে ঘুরে এদের পুব-রাজ্যের ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

বার্লিনের পুরানো পথ। কতবার আসা-যাওয়া হল, গোটা পথ মুখস্থ। তবু যখনই যাই, হাহাকার ওঠে বুকের ভিতরে। মানুষ কী করেছে মানুষের! এখনও দেখছি, অট্টালিকার ইট-রাবিশ গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় লোহার কড়ি বেরুচ্ছে,

কাজকর্ম-করা দরজা-জানলা, ভাঙাচোরা অপরূপ ভাস্কর্য। ক্ষণে ক্ষণে রেলের পুলের নিচে দিয়ে যাচ্ছি, বিদ্যুতের রেল গুমগুম করে ছুটে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে। মাটির নিচে দিয়েও যাচ্ছে। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ দেখবেন রেলিঙে ঘেরা তিন দিক, খোলা দিকটায় সিঁড়ি নেমে গেছে পাতালের দিকে, পাশে মোটা হরফে (U) লেখা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান—মাটির নিচে স্টেশন। স্প্রী নদী বইছে সাপের মতো এঁকেবেঁকে নানান দিকে ডালপালা ছড়িয়ে। নদীর যে কতগুলো পুল, গোনাগুনতি নেই। এমনি গোটা দুই পুল ছাড়িয়ে চলে এলাম শহরের এক নির্জন এলাকায়। এই পুব অঞ্চলটায় ভিড় দেখতে পেলাম না কখনো। বিস্তর গাছপালা, গাছের তলায় ছায়া-ভরা রাজপথ। পাথরের খোওয়া—হঠাৎ খেয়াল হল, সেই পথ পিচের আবরণে মসৃণ তেল-চোয়ানো হয়ে গেছে। সাজানো বাগান ডাইনে, উল্টো দিকে খেলার মাঠ। বাগানের মস্ত বড় সাদা রঙের গেট, গেটের উপর রুশীয় অক্ষরের নাম। ভিতরে অনেক দূর অবধি টানা রাস্তা গেছে। রাস্তার শেষ স্মৃতি-মন্দিরে। সোবিয়েতের অনেক সৈন্য বার্লিনে প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সমাধি। সর্বক্ষণের পাহারা দরজায়। ঢুকতে বাধা নেই, যে কেউ ঘুরে দেখে সম্মান জানিয়ে এসো।

স্মৃতিমন্দির ছাড়িয়ে চলেছি। কতদূর চলে গেলাম। জঙ্গল। এ বর্ণনা আগেও শুনেছেন—শহর ছাড়িয়ে গিয়ে অনতিদূরে দস্তুরমতো জঙ্গল তো বটেই, শহরের ভিতরেও ঘন জঙ্গল এঁটে আছে। জঙ্গলের ভিতর ছোট্ট ছোট্ট ছবির মতন বাড়ি। তারপর এল ফ্যাক্টরি-পাড়া। নদীর কিনারা ধরে ফ্যাক্টরির পর ফ্যাক্টরি। মাইলের পর মাইল। ফ্যাক্টরির একদিকে নদী, আর একদিকে রেল-রাস্তা। সমস্ত চুরমার হয়ে গিয়েছিল, পনেরো আনা আবার নতুন করে চালু করেছে।

ফ্যাক্টরি-পাড়া বাঁয়ে রেখে ছুটছি। ফসলের খেত। ঘন-সবুজ

মাঠ একদিকে, ভিন্নদিকে ঘরবাড়ি। আগল ফেলে রাস্তা বন্ধ করা —তাতে লেখা রয়েছে—'থামো'। পাসপোর্ট-ভিসা কিংবা হুকুমনামা দেখান। বার কুড়িক আমাদের এই আগল পেরুনো হয়ে গেছে। প্রথম দিন বড় রাগ হয়েছিল—কী কড়াকড়ি রে বাবা! কাউকে বিশ্বাস করে না—নিজের দেশের মানুষ চলাচল করবে, তা-ও ফোটোগ্রাফ-সাঁটা হুকুমনামা দেখিয়ে? এখন করুণা হয়। কী বিষের আবহাওয়ায় থাকে যে মানুষগুলো! আমাদেরও আছে, কিন্তু এর সিকির সিকি নয়।

বর্ডার-পুলিশ সেলাম ঠুকে পাসপোর্টের জন্য হাত বাড়ায়। পুলিশ হয়েও বিনয়ী। বয়সে ছেলেমানুষ। ভারিক্কি টুপি পরলে কী হয়, টুপিতে বয়স ঢাকে নি। ভিসা পড়ে নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফোটোগ্রাফের সঙ্গে মানুষ মিলিয়ে দেখে, পুনশ্চ আর-এক দীর্ঘ সেলাম দিয়ে ইশারা করে। আগল খুলে দেয় একজন ওদিকে। চলে যাও এবারে, আর বাধা নেই।

এরোড্রোম অদূরে। সেদিকে গেলাম না, পটসডামের পথে নেমে পড়েছি। ভেড়ার পাল নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। গাড়ি আটকে রইল। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। পালের মাথায় দুটো কুকুর এবং রাখাল। আপাদমস্তক পোশাক আঁটা রাখালের—ঝকমকে পোশাক নয়, পুরানো হয়ে রং ফ্যাকাশে হয়েছে। কখনো মাঠ আসছে, কখনো জঙ্গল, কখনো বা গ্রাম। এত ঘোরাঘুরি করে এলাম জর্মনির মফস্বলে—গ্রাম ও শহরের চেহারা প্রায় এক রকমের। ভালো রাস্তা, সহজলভ্য বিদ্যুৎ-শক্তি, যানবাহনের ভালো ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন সুন্দর সাজগোজ সমস্ত মানুষের। আর এ-সব জায়গা হল বার্লিনের একেবারে কাছে, আরও ভালো তো হবেই।

•

হাভেল নদী। নদী পার হয়ে পটসডামে ঢুকে মনের মধ্যে আর্তনাদ ওঠে। আমাদের গ্রাম-অঞ্চলে মাটি কাটার সময় গর্তের

ভিতর এক-একটা ঢিবি রেখে দেয়। বোঝা যায় কতটা উঁচু ছিল এখানে, মাটির পরিমাণ হিসাবে আসে। এ-ও তেমনি। শহর চূর্ণীভূত, তার ভিতরে খাড়া রয়ে গেছে এটা-ওটা। আততায়ী যেন আঙুল তুলে নিঃশব্দ গর্জনে শাসাচ্ছে : ঐ রকম ছিল আগে, আর এই করেছি—আসবে আর লাগতে? গ্রীক-পদ্ধতির মোটা মোটা থাম—কলকাতার সিনেট-হলের মতন—আধখানা, সিকিখানা হয়ে ভুঁয়ে গড়াচ্ছে। অগুনতি মূর্তির হাত-পা-মুণ্ড মাঠ ভরে ছড়িয়ে আছে—সৈন্যদল যেন তারাও, লড়াইয়ে কচুকাটা করে দিয়ে চলে গেছে। বিরাট স্মৃতিস্তম্ভ বানিয়েছিল কারা রণবিজয়ের ব্যাপারে। মনের উল্লাস, ভেবেছিল, পাথরে চিরজীবী করে রাখবে। দেখে যান এবার এসে। চূড়া ভেঙে পড়েছে। নিচের দিকে সাদা পাথরে বিস্তর লেখাজোখা ছিল—এখন যে অল্পস্বল্প রয়েছে, তার মানে বোঝা দায়। ট্রাম চলেছে, কিন্তু খালি গাড়ি। পথেও মানুষজন সামান্য। এই তেরোটা বছর কী খাটনিটাই খাটছে গোটা জাত ধরে, লড়াইয়ের চেহারা তবু ঢাকা দিতে পারল না।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে পৌঁছেছি অবশেষে সাঁ সুসির (Sans Souci) তোরণে। ফরাসি নাম, মানে করলে দাঁড়াবে অ-শোক, শোচনাবিহীন। ভুবনের কোনো শোক-দুঃখ তোরণ ফুঁড়ে ঐ বিরাট অট্টালিকা ও পার্কের এলাকার ভিতর পৌঁছবে না, এই ছিল অভিপ্রায়।

তেরো শো একর জায়গা। এখন বোধকরি এদিকে-সেদিকে আরও কিছু বেড়েছে। ঢুকে পড়ে দিশাহারা হয়ে যেতে হয়। শতাব্দীর প্রাচীন মহাবৃক্ষেরা। বিশাল বিপুল ওক, লাল বাকলের পাইন, আকাশ-ছোঁওয়া ফার—আর ঝুপসি-ঝুপসি উইলো। কত ঝড় মাথার উপর দিয়ে গেছে, কত রাতের জ্যোৎস্না গায়ের উপর পড়ে চুম্বন করেছে। মাথায় মাথায় এঁটে যেন এক ছাত হয়ে আছে। সূর্য উঁকিঝুঁকি দেয় উপর থেকে, একফালি রোদ কদাচিৎ বা তলায় পড়ে যায় কোন এক ছিদ্রপথে।

কত মূর্তি, ছোটখাট কত দেউল, কত কুঞ্জবন—গণে শেষ হয় না। বড় বড় রাস্তা, তার এদিকে-সেদিকে শতেক গলিঘুঁজি। গোলক-ধাঁধার মতো ঘুরে মরবেন। রবিবারের দিন মোটামুটি হাজার তিনেক মানুষ দেখতে আসে। তা মোটে চোখেই পড়ে না। পার্ক যেন গ্রাস করে বসে থাকে মানুষগুলো। এখানে দু-জন ওখানে পাঁচজন, এইমাত্র। কী বৃহৎ ব্যাপার, বুঝে নিন এবারে।

গাড়ি তোরণের বাইরে রেখেছে। সারবন্দি বনস্পতির নিচে দিয়ে চলেছি। ডালে ডালে ঠেকিয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে মহাকালের প্রহরীরা। কবে দু শো বছর আগে উদ্যান বানাল, সেই থেকে এখনো প্রতিটি দিন মানুষ খাটছে। লড়াইয়ের সময় বড় ভয়ের সেই কয়েকটা মাস ছাড়া একটা বেলা আজও কামাই হয় নি। আকাশ-ছোঁওয়া গাছ, তারও উপরের ডালপালা ছাঁটাই হচ্ছে মই লাগিয়ে। বাগানের মালি আড়াই শো। এ-গাছ ছাঁটাই করছে, ও-গাছে জল দিচ্ছে, ওদিকে ফুলসুদ্ধ চারা নিয়ে বসাচ্ছে। বড় বড় ছাঁটাইয়ের অস্ত্রে শান দিচ্ছে অনেকে মিলে।

শুধুমাত্র পুরানো বস্তুর প্ররক্ষণ নয়, নতুন নতুন কাজও চলেছে। এই দুই শতকের যত নাম-করা শিল্পী, প্রায় সকলের কিছু না কিছু হাত পড়েছে এখানে। পুরানো কীর্তি-কলা ষোল-আনা বাঁচিয়ে রাখা —সে-ও খুব শক্ত কাজ। পুরানো ছবির উপর সাবধানে তুলি বুলাতে হয়। বালু-পাথরের মূর্তি কাঠের ফ্রেমে ঢাকা দিয়ে রাখতে হয় শীতকালে, হিমে নয়তো কালীবর্ণ হয়ে যাবে। গোটা অট্টালিকা কাঠে মুড়ে রাখা চলে না, শীতের অন্তে বসন্ত এসে গেলে তোলপাড় লেগে যায়। ঘষামাজা সাফসাফাই চলে, অগণ্য মানুষ খাটে। আমরা এসে পড়েছি তেমনি একটা দিনে, সেই ময়দানবীয় কাণ্ড চোখের উপর দেখছি।

ডাইনে বাঁক নিয়ে আরও অনেকখানি পথ গিয়ে মূল-প্রাসাদ। হাঁ, গড়েছে বটে একটা জিনিস! দুনিয়ার মানুষ দেখবার জন্য ধেয়ে

আসে, সেটা অকারণ নয়। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের গ্রীষ্মাবাস। উজ্জ্বল হলুদ রঙের বাড়ি সবুজ গাছপালার ভিতর সোনা হেন ঝিকমিক করে। বাড়িটা আসল বস্তু—বাড়ির নামে ক্রমশ গোটা বাগানের অ-শোক নামকরণ।

অনেক উঁচুর উপর অট্টালিকা। চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে। খানিক উঠে গিয়ে সমতল। কোথাও জলাধার। কোনোখানে হট-হাউস—কাচের ঘরে গাছপালা বড় হচ্ছে। কিংবা ফোয়ারা—ফুরফুর করে জল ছিটকে পড়ছে। জল এত উঁচুতে ওঠে যে সেই অবধি তাকাতে গেলে ঘাড় ভেঙে যাওয়া অসম্ভব নয়। আবার চলল সিঁড়ি। আবার সমতল। এমনি ছয় দফা। ছয় দফা সিঁড়ি বেয়ে উঠে চত্বর পেয়ে গেলেন। ইউ-গুল্মের ঝাড়—পিরামিডের আকারে ছাঁটাই করেছে। তার সামনে বারোটা গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি। পাথর ফেটে যেন রূপ আর লালসা বেরিয়ে আসছে। ফরাসি সম্রাট পঞ্চদশ-লুই মূর্তিগুলো ফ্রেডারিককে উপহার দিয়েছিলেন। সোনার রঙের সূর্যমূর্তি। প্রাসাদের পিছন দিককার উঠান ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকার দালান; রোমক রীতিতে তৈরি।

ফ্রেডারিক বানালেন এই বাড়ি ১৭৪৫-৫৭ অব্দে। ফরাসি সংস্কৃতির ভক্ত তিনি। গুরু ভলতেয়ার—তাঁকে আহ্বান করে এনে এই বাড়িতে রেখেছিলেন। ফরাসিতে কথাবার্তা বলতেন সব সময়। ভলতেয়ার বললেন, তোমার নিজ ভাষা জর্মন বলো না শুনি। ফ্রেডারিক জবাব দিলেন, জর্মন ভদ্রলোকে বলে নাকি? সে হল আস্তাবলের সহিসের ভাষা। দেখলামও বটে তাই। ফ্রেডারিকের লাইব্রেরি-ভরা বিস্তর ফরাসি বই। এবং লাতিন ও গ্রীক ক্লাসিক্যাল বই। জর্মন বই একখানাও নেই।

প্রাসাদের দরজা খুলবে আর খানিক পরে। টিকিট করে ভিতরে যেতে হয়। অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে। আমাদের আলাদা বন্দোবস্ত—টিকিটের লাইনে দাঁড়াতে হবে না। আগেভাগে

ঢুকিয়ে নেবে—ভিড়ের মধ্যে জুত হয় না বলে আলাদা করে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে। ততক্ষণ কী করি? ঘোরাঘুরি করা যাক উঠানে। নানা জায়গা থেকে আরও বিস্তর এসেছে, ইস্কুলের ছেলেমেয়ের বড় একটা দল। একটা ফচকে মেয়ে হাসছে আমাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে। কথা না বুঝি, বিদ্রূপ করছে সেটা বোঝা যায়। দেশে-দেশে এত ঘোরাঘুরি করেছি, ব্যঙ্গের হাসি প্রথম এই দেখছি জর্মনিতে—একটি মেয়ের মুখে।

সামনের উঠানে প্রাসাদের দুদিকে দুটো ফাঁকা লোহার চালা। কতকটা খাঁচার মতো। সবুজ লতানে-গাছে ঢাকা উপরটা। ছোট-খাট প্রাসাদ আর একটা ওদিকে, চূড়ায় ঈগলপাখি। সামনে বিশাল নেপচুনের মূর্তি। থিয়েটার হত এখানে—বড় হল। সেকালের রাজরাজড়া নেই, সভাসদ ও অন্তঃপুরিকারা আর ভিড় করে না। একালের রামাশ্যামা আমরা ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেখছি।

প্রাসাদে ঢুকবার সময় হল এতক্ষণে, দরজা খুলে দিয়েছে। সকলের আগে আমরা ভারতীয় তিনজন, এবং লীবার্গ। কয়েকটা ঘর দেখানো হয়ে গেলে তারপর অন্য সকলকে ছাড়বে। বরাবর আগে আগে থাকব, আমাদের কাছে ভিড় জমাট হবে না।

জায়গাটা ছিল পাহাড়। পাহাড়ের মাথা কেটে চৌরস করে তার উপর অট্টালিকা বানাল। অনেক দূর অবধি যাতে নজরে আসে। চারিপাশে বহুব্যাপ্ত উদ্যান, এখানে-ওখানে পাহাড়ের ঢিবি। পিছন দিকে দেখতে পাচ্ছি পাহাড় ও অরণ্য একটানা চলে গেছে। মনোরম জায়গা বেছেছে, সত্যি সত্যি মন কেড়ে নেয়। পার্ক হবার আগে জায়গার যে চেহারা ছিল, একটা ছবিতে তাই আঁকা রয়েছে। ফ্রেডারিক গোড়ায় নিজ হাতে মোটামুটি এক নকশা বানালেন; বড় ইঞ্জিনিয়াররা পুরো নকশা বানাল সেই ছকের উপরে। দুটোই রাখা আছে।

ছাতের দিকে চেয়ে অবাক হই। কী ছবি! ফুলের দেবী ফুল

ও শিশুদের নিয়ে সারা ছাত ভরে আছেন। নিতান্ত হালফিলের ছবি বলে মনে হয়, শিল্পী যেন এইমাত্র কাজ শেষ করে তুলি রেখে উঠে গেছেন। অথচ চিত্রকরের নাম রয়েছে—হার্পার পিলেস্ত, ইংরেজ শিল্পী। তারিখ—১৭৪৬ অব্দ। ঘরের মেজে আসল মার্বেলের। থামের মার্বেল নকল—কোনখানে জোড় নেই, তাই দেখে ধরা যায়। গ্রীক দেবী মার্সের আহা-মরি মূর্তি—এ-বস্তুও পঞ্চদশ-লুইয়ের উপহার। ছবির গ্যালারি একটা ঘরে—ঘর ছোট, ছবি ও মূর্তিতে ঠাসা। পম্পাই-এর ধ্বংস খুঁড়ে অপরূপ ভাস্কর্যমূর্তি বেরিয়েছিল, তার অনেক নিয়ে এসেছে। ফ্রেডারিকের প্রপিতামহ ও প্রপিতামহীর ছবি। খুব বড় এক ছবিতে ফ্রেডারিক ডিউক-অব-ইয়র্ককে সংবর্ধনা করছেন। বড় বড় ঝাড় ঝুলছে বাড়িময়—উৎকৃষ্ট ফরাসি ক্রিস্টালে তৈরি। ফ্রেডারিক কুকুর বড় ভালোবাসতেন, তাঁর এক অতি-প্রিয় কুকুরের ছবি।

লাইব্রেরি। দু-হাজার বই—দু শো বছরের পুরানো, কিন্তু বাঁধাই ঝকমক করছে। আর ঐ যা বলেছি, জর্মন বই এর মধ্যে একখানাও নেই। হোমার, অ্যাপলো, আরিস্ততল ও সক্রেতিসের মূর্তি। সঙ্গীত, জ্যোতির্বিছা ইত্যাদিও মূর্তি গড়ে রূপ দিয়েছে।

ফ্রেডারিকের শোবার ঘর। কাঠের মেজে। চেয়ারে বসে কাজ করতে করতে মারা যান তিনি (১৭৭৪)—সেই গদি-আঁটা চেয়ার। সম্রাটের তেল-রঙা ছবি চেয়ারের ঠিক উপরটায়। সম্রাট ও দুই প্রিয় কুকুরের ব্রোঞ্জমূর্তি। মস্ত বড় ঘড়ি—সেই আমল থেকে ঠিক চলছে, ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড শুধু নয়, দিন-মাস-বছর পাওয়া যায় ঘড়িতে। ছাতের গায়ে জ্যোতিষিক নবগ্রহ-আঁকা।

বাজনার ঘর। আলোয় আসবাবে ছবিতে নিখুঁতভাবে সাজানো। দু-পাশে বাতিদান, মাঝে বাজনার স্ট্যাণ্ড। তার উপর ফ্লুটবাঁশি শোয়ানো, সম্রাট নিজে সেটি বাজাতেন। অতি বৃহৎ আয়না—আয়নার মুখোমুখি কাচের জানলা। জানলার ওধারে

বাড়ির সামনেটা আয়নায় বিম্বিত হয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে সম্রাট বাইরের সবকিছু দেখতে পেতেন। ঘড়ির পুরো ঘণ্টা হল, পাখির অভি-মিষ্টি কাকলীর মতো অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল।

বসবার ঘর, অভ্যাগতেরা যেখানটা বসে অপেক্ষা করতেন। নামজাদা ফরাসি শিল্পীদের আঁকা ছবি। একটা ছবি দেখছি—তরুণী নাতনি প্রেমপত্র লিখছে, চশমা চোখে বুড়ো ঠাকুরদা সকৌতুকে ডাকাডাকি করছে, তরুণীর সাড়া নেই। ভারি চমৎকার।

খাবার ঘর। টেবিল ছিল ডিম্বাকার—সে টেবিল এখন নেই, মেজের উপরে চিত্রকর্ম দেখে টেবিলের চেহারা পাওয়া যায়। পোর্সিলেন বানানো তখন সবে শুরু হয়েছে মাইসেনের কারখানায়—সেই অমল-ধবল বাসনপত্র এখানেও। অতিথিদের থাকবার ঘর। লড়াইয়ের কয়েক বছরে দেখাশোনার অভাবে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ১৯৫৩ থেকে নতুন রঙ ফলিয়ে ঝাড়পোঁছ করে আবার আগেকার চেহারা খুলেছে।

ভলতেয়ার যে ঘরটায় থাকতেন। তাঁর সোফা-চেয়ার। দেয়াল-ময় অগণ্য পাখির ছবি। ঈশপের গল্পের নানা ছবি কার্পেটে তুলে চেয়ারের সিটে বসিয়ে দিয়েছে। কচ্ছপ লাঠি কামড়ে ধরেছে, দুই পাখি লাঠির দু-প্রান্ত ঠোঁটে নিয়ে উড়ছে। ময়ূরের পাখা ধারণ করেছে মুরগি। এমনি কত।

পটসডামের এই জায়গায় বোমা পড়ে নি ভাগ্যিস। রুশ সৈন্য শহরে ঢুকে পড়ল। সোজাসুজি এইখান দিয়ে এগোবার কথা। কিন্তু শিল্পরসিক কে-এক জেনারেল সোজা পথ বাতিল করে দিলেন। এই তল্লাটে একটি সৈন্য আসবে না, ঘুরপথে যাবে। তাতে হাঙ্গামা বেশি, খরচও অনেক। কিন্তু অ-শোক পার্ক অটুট রয়ে গেল, গাছের ছোট ডালটিও ভাঙা পড়েনি। সেই ডামাডোলের সময় পাহারা মোতায়েন করেছিল পার্কে ঢোকবার প্রতিটি মুখে। বাজে লোক ঢুকে পড়ে জিনিসপত্র পাছে নয়-ছয় করে দেয়।

গ্রীষ্মাবাস দেখে-শুনে বাগানে নামলাম। আরও বিস্তর দেখবার আছে—ছোটবড় অনেক ক্যাসল, অসংখ্য শিল্পকর্ম। একটা বড় দল আসছে ওদিকটা সাঙ্গ করে। মুখোমুখি পড়লাম। চেহারা ও পোশাকে মালুম হয়, যাদের হামেশাই দেখে থাকি সে ধরনের মানুষ নয়। আমাদের দিকে কৌতুক-চোখে তাকাচ্ছে, দৃষ্টিতে সারল্য।

লীবার্গ এগিয়ে আলাপ করে। সত্যি তাই, এরা সব গাঁয়ের মানুষ। শ চারেক মাইল দূরের গ্রাম থেকে এসেছে। প্রথম এল এই তল্লাটে। জাত্যংশে আলাদা—সর্ব্, জর্মনির এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। আমাদের দেখে খুব যেন মজা পেয়ে যায়। শহর দেখতে এসে এই বস্তু উপরি জুটল। অনেক পাহাড় ও সমুদ্র পার হয়ে-আসা মানুষ—লেখক-মানুষ এতগুলি।

পাড়াগাঁয়ের হলে কী হবে, ক্যামেরা আছে সঙ্গে। যা দেখে, ছবি তুলে নিচ্ছে। ক্যামেরার জায়গা জর্মনি—জলের দরের ফিলম। ছবি নেওয়া ওদের কাছে ডাল-ভাতের শামিল। আমাদের মধ্যে মেয়ে আছেন উমা রাও—তাঁকে ঘিরে এসে দাঁড়ায় ও-দলের কমবয়সি মেয়েগুলো। ক্লিক-ক্লিক—বিস্তর ছবি তুলছে।

আমরা হতভম্ব হয়ে আছি ক্যামেরার এলাকার বাইরে। ও-দলের কয়েকজন, এবং আমি ও রাও। এক প্রৌঢ়া বলেন, বা-রে আমাদের ছবি হবে না? বয়স হয়েছে বলে বাতিল? এসো, লাইনবন্দি হয়ে দাঁড়াই।

লীবার্গ হাসতে হাসতে কথা বুঝিয়ে দিল: দাঁড়াতে বলছে ওদের সঙ্গে।

তাই দাঁড়িয়েছি। প্রৌঢ়া তাড়া দিয়ে ওঠেন: এই বুঝি? এক মিটার ফাঁক। গায়ে গায়ে এসো, হাত ধরো। হাত ধরাধরি করে ছবি তুলব ভারত আর জর্মনি।

তখন হাত ধরা শুধু নয়, হাতে হাতে শৃঙ্খলিত হয়ে দাঁড়িয়েছি। ছবি উঠল। কটা মিনিটের দেখা তাদের সঙ্গে! কে তারা, কোথায়

ঘরবাড়ি জানিনে, কোনদিন আর দেখা হবে না। গাঁয়ের স্বল্পশিক্ষিত লোক—'ভারত' নামটাই প্রথম হয়তো আজ কানে গেল। মানুষ—সবাই মানুষ আমরা—শুধুমাত্র এই পরিচয়। মানুষের উপর মানুষের টান দেখে অবাক হয়ে যাই। কোনো এক সময় হয়তো বড্ড একা মনে হচ্ছে নিজেকে, অবসাদ আসছে, মুহূর্তে ভুল ভেঙে যায়—দেখতে পেলাম, অনেক মানুষের একজন আমি। দুনিয়ার পথে পথে কতবার এমনি ঘটনা ঘটেছে।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে চায়ের পিপাসা লাগল। এই তো মুশকিল। ড্রাগন-হাউস ছাড়া চা মিলবে না। সেটা আবার কোন জায়গা? হাঁটুন—বেশ খানিকটা হাঁটতে হবে। বাগানের সীমানার বাইরে চীনা প্যাটার্নের বাড়ি। মন্দের ভালো, হেঁটে হেঁটে ও-মুড়ো অবধি দেখা হয়ে গেল। ঘন গাছপালা, মাঝে মাঝে কাশবন। কাশবন ফুঁড়ে মস্ত এক শিঙেল হরিণ মাথা তুলে তাকিয়ে দেখছে। অবাক কাণ্ড, দেশটা জর্মনি বলে হরিণও কি মিলিটারি? তিলেক ভয় পায় না, যেমন-কে-তেমন দাঁড়িয়ে আছে। কাছে গেলেও ভয় পায় না—ও হরি, ব্রোঞ্জে বানানো মহিষের আকারের শিঙেল। হরিণের সঙ্গে আমাদেরও ছবি তুলে নিল।

বাগান থেকে বেরিয়ে ছায়া-ঢাকা ছোট রাস্তায় কয়েক পা গিয়ে উল্টো দিকের সুঁড়িপথে নামলাম। সে পথ উঁচু হয়ে ক্রমশ উঠেছে এক টিলার মাথায়। মিস্ত্রি-মজুর লাগিয়ে পথটায় সিঁড়ি বানিয়ে দিচ্ছে। পুরানো কালের কোনো শৌখিন মানুষ এখানে বাড়ি বানিয়েছিলেন। থামগুলোর মাথায় যেন ফুলের ঝাড়, ফুলের ঝাড়ের ভিতরে কৌশলে কড়িকাঠ ঢাকা। দেয়ালে কত রকমের কাজ—তারযন্ত্র বাজাচ্ছে বাদ্যকর, কেউ-বা শিঙা বাজাচ্ছে। বাজপাখি হাতে এক শিকারি। সে-সব মানুষ কোথায় ফৌত হয়ে গেছেন। এখন চা-খানা। আরামের জায়গা। ঘরে বা বারাণ্ডায় বসে পড়ুন, অথবা

উঠানে গাছের তলায়। কিংবা বড় বড় ছাতা, খোলা রয়েছে, তার নিচে।

চা অন্তে পুনশ্চ বাগানের ভিতরে। দেখার শেষ নেই, একটা দিনে নমো-নমো করেও দেখা হয় না। দুপুর গড়িয়ে গেছে। ইতি করা যাক এবারে। কিন্তু আর-এক জায়গা তো দেখতেই হবে—দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ খতম হয়ে গেলে বিজয়ী তিন জাতি জর্মনির বুকের উপর যে বাড়িতে যে ঘরে বসে চুক্তিপত্রে সই করেছিলেন। সেই পাট চুকিয়ে খানাপিনা সেরে হাভেল নদী পার হয়ে বার্লিন-মুখো পাড়ি দেওয়া যাবে।

এটাও বাগানবাড়ি, বিশাল কম্পাউণ্ড, একেবারে নদীর উপরে। ১৯৪৭ অব্দে গোটা জর্মন জাত কত আশায় বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিল। কতজনের মুখে সেই এক গল্প শুনি। দেশে দেশে আক্রমণ চালিয়েছিল নাৎসিরা—হত্যা, লুণ্ঠন ও হিংসায় পশুকে হার মানিয়েছিল। করেছিল নাৎসিরাই—গোটা জর্মন জাতির নামে এ কলঙ্ক ওরা মেনে নেবে না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত হল সমগ্র জাতির উপর দিয়ে। পেটে অন্ন নেই, বসতির ঘরবাড়ি নেই, ভবিষ্যতের এক এক কণিকা আলো নেই চোখের সামনে—সে একদিন গিয়েছে। বিজয়ী নেতারা এই বাড়িতে এসে জমায়েত হলেন। জর্মনজাতি আর কোনদিন লড়াইয়ের পথে না গিয়ে সৎভাবে বেঁচেবর্তে থাকবে, এমনি ব্যবস্থার কথা শোনা গেল। চুক্তি হয়ে যাবার পরেও সকলের সেই ধারণা। অচিরেই কিন্তু প্রকাশ পেয়ে গেল, গণ্ডগোল কর্তাদের ভিতরেই। প্রবল শত্রুর সামনে এক হয়ে লড়েছিলেন, লড়াই অন্তে এখন নিজেদের মধ্যে অসি শানাচ্ছেন। দুটো দল হয়ে গেল—আমেরিকা ব্রিটিশ আর ফরাসি একদিকে, সোবিয়েত আলাদা। এক জর্মনি দুই জর্মনি হয়ে গেল উভয় দলের এলাকা হিসাবে। দিনের প্রতিটি মুহূর্তে হরেক সমস্যা মনে করিয়ে দেয়, একটা দেশের মাথায় কোপ মেরে দু-খণ্ড করা হয়েছে। মহাপাপ নাৎসিদের, জাত ধরে তার মহাপ্রায়শ্চিত্ত চলেছে। সেই কাণ্ড ঘটে এই বাড়িতে ঐ সমস্ত ঘরের ভিতরে।

ক্রাউন-প্রিন্সের বাড়ি, ১৯৪৫ অবধি এখানে তিনি কাটিয়ে গেছেন। ক্রাউন-প্রিন্স বলা ঠিক হচ্ছে না—প্রথম-মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে কাইজারতন্ত্র খতম—অতএব বলা উচিত কাইজারের ছেলে। নাৎসি আমলে কাইজার-পুত্র এখানে থাকতেন। এখন পশ্চিম-জর্মনিতে। তাঁর যেটা লাইব্রেরি-ঘর, চার্চিলের দলটা সেখানে আস্তানা নিয়েছিল। খানাঘরে ছিল দলের সেক্রেটারির অফিস। সেসব দিনের বিস্তর ফোটো—ঢোকবার মুখে যে বারাণ্ডা বিশেষ করে সেখানে ঝুলিয়ে রেখেছে। সোবিয়েত দলের যাবতীয় খানাপিনা নদীর ওপারে। পন্টন-ব্রিজে নদী বেঁধে ফেলেছিল, যাতায়াতের হাঙ্গামা ছিল না।

ক্রাউন প্রিন্সের বউয়ের আজব খেয়াল—জাহাজের উপর বসবাসের শখ। বারো মাস জাহাজে থাকা চলে না, তাই বাড়ির মধ্যেই এক কায়দা বের করে নিল। বউঠাকরুনের ঘরগুলো সব জাহাজি প্যাটার্নের—ক্যাবিন ডেক সিঁড়ি রেলিং, এমন কি ধোঁয়া বেরুনোর চোঙা অবধি। নিচের তলায় মোটরের ভটভট আওয়াজ করত—আওয়াজ করে জাহাজের ইঞ্জিন চলছে, এই আর কি! পয়সা থাকলে কত কি করা যায়—আমরা তো মশায় মাথার উপরে এতটুকু আচ্ছাদন দিয়ে উঠতে পারি নে পয়সার অভাবে।

কম্পাউণ্ডে বড় বড় গাছ, ঝুপসি জঙ্গল আর উলু-জাতীয় লম্বা ঘাস। ওঁরা ঘরে ঘুরছেন, টুক করে আমি এক ফাঁকে বাইরে বেরিয়েছি। গলিপথ এদিকে-সেদিকে। পাখি ডাকছে, নদীর হাওয়া বয়ে যাচ্ছে ঘাসের উপর ঢেউ তুলে। ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলে বাঁক ঘুরে ঘোড়ায়-টানা গাড়ি ইটের কুচি নিয়ে আসছে, পথে ঢালবে। আর-এক বাঁকে দেখি, একজোড়া তরুণ-তরুণী গায়ে গায়ে জড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পটসডামের পথে পথে চার প্রাণী সেদিন হা-অন্ন হা-অন্ন করে ঘুরেছি। হোটেল খুঁজে বেড়াই, কিন্তু কোথায়? কি কারণে জানিনে,

কতকগুলো হোটেল আজ বন্ধ। আর কতক দুপুরের পাট সেরে বাসনকোসন তুলে ফেলেছে। শহরের এপাড়া ওপাড়া চষে বেড়াচ্ছি। ক্ষণে ক্ষণে গাড়ি থামিয়ে লীবার্গ নেমে গিয়ে হোটেলের খবর জিজ্ঞাসা করে। খবর জেনে গাড়ি হাঁকিয়ে দেয় সেইমুখো। ঘণ্টা দেড়েক ঘোরাঘুরির পরে এক হোটেল অবশেষে সদয় হলেন। ফরমাশ চলবে না, অর্ডার মতন বানিয়ে দেবার লোক নেই। ভাঁড়ার খুঁজে যা মিলবে, শুধু সেই কটি বস্তু।

তথাস্তু।

চব্বিশ

বৃষ্টি, বৃষ্টি! বেলা দশটা অবধি আকাশ পানে তাকাচ্ছি ধরে যাবে এই প্রত্যাশায়। কোনও লক্ষণ নেই। চুলোয় যাকগে, হেঁটে তো যাচ্ছি নে।

গাঁয়ে যাচ্ছি চাষবাস দেখতে। সমবায়ের চাষ। এ তল্লাটে এই বস্তু হালফিল আসছে। সোবিয়েতের কোলখোজ দেখে এসেছি, লিখেছিও তার কথা। সে হল বিরাট ব্যাপার। এরাও যাচ্ছে ক্রমশ সেই দিকে। আরম্ভের সামান্য আয়োজন ধাঁ-ধাঁ করে বড় হয়ে উঠছে।

পুবমুখো ছুটেছি, পোল্যাণ্ডের দিকে। ওডার নদী সীমানা। ঐ নদী পার হয়ে হিটলারের দল পোল্যাণ্ডে গিয়ে পড়েছিল। পোল্যাণ্ড ফতে করে রাশিয়ায়। তাড়া খেয়ে আবার একদিন ওডার পার হয়ে ঘরের ছেলেরা ঘরে পালিয়ে এল। রাশিয়া ঢুকে পড়ল পিছু-পিছু। ঠেঙাঠেঙির সেই বহুবিখ্যাত পথ।

কোন্ জায়গা এটা? গ্রাম? তোমাদের দেশের গ্রাম-চরিত্র মাথায় ঢোকে না বাপু। ছোটখাটো দিব্যি একটি শহর। বোমা এখানেও? বিষম ঘায়েল করেছিল দেখছি। ওডার আর বার্লিনের মাঝামাঝি জনালয় আর মাঠঘাঠের বাছবিচার ছিল না। লড়াই হয়েছিল প্রতি-ইঞ্চি জায়গায়। উঁহু, ঠিক হল না—লড়াই কোথা? যা-কিছু হয়েছিল একতরফা। কচুকাটা করতে করতে এগিয়ে আসছিল।

শহর বা গ্রাম যা-ই বলুন, সেইটুকু শেষ করে মাঠে নেমেছি। সোজা রাস্তা চলে গেছে, দু-ধারে দিগ্‌বিস্তৃত ফসলের খেত। মাঝে মাঝে বন আসছে। বড় বড় গাছ ডালপালা ছড়িয়ে তলায় ছায়া জমিয়ে রেখেছে। লীবার্গ হাত বাড়াল সেই-সব বনের দিকে:

গাছের তলায় খুঁড়ে দেখো গে ; একটু খুঁড়লেই ভাঙাচুরো অস্ত্র পেয়ে যাবে। পাবে মানুষের করোটি-কঙ্কাল। হাড় দেখে চিনতে পার তো দেখবে সেই মানুষগুলো চোদ্দ-পনেরো বছরের কচি কিশোর কিংবা ষাট-সত্তর বয়সের অথর্ব বুড়ো। আগে লোকে খুঁড়ে খুঁড়ে বের করত, এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। খোঁড়া নিষেধ। ঐ-সব দেখে মন খারাপ হবে, আর তো কোনো লাভ নেই।

পোল্যাণ্ডের সীমান্ত কুড়ি মাইল এখান থেকে। আর বার্লিন মাইল পঁয়তাল্লিশ। রুশরা ঢুকে পড়েছে—গেল গেল, সমস্ত গেল—রুখতে হবে তাদের। লড়াই বিনে এক-পা এগুতে দেওয়া হবে না। কিন্তু মানুষ কোথা লড়ায়ের ? খতম তো বেশির ভাগ। যা-কিছু সৈন্য, নানান দিকে ছড়িয়ে আছে। বানের জলের মতো ধেয়ে আসে বিজয়ী দল—আজেবাজে সৈন্য পাঠানো মানে বালির বাঁধে বান ঠেকানোর চেষ্টা। হল তাই—এবং সে বাঁধ নিতান্ত বালিরই বটে। মানুষ মেলে না তো ধরে আনো ইস্কুলের ছেলেপুলে, কাঁধে বন্দুক দিয়ে দাঁড় করিয়ে দাও। বন্দুক তাক করতে না পারুক, মরতে তো পারবে। আর নিয়ে এসো বুড়োহাবড়া ঘরের কোণে বসে বসে যারা ঝিমোয়। বন্দুক তুলতে পারবে না তো মরুক। মরবেই তো—কয়েকটা বছর আগে আর পরে। মরে মরেও যদি কিছু সময় কাটাতে পারে, বিজয়ীদের গতি যদি শ্লথ হয়। ইত্যবসরে বার্লিন ঠেকানোর কায়দা যদি কিছু বেরোয়।

গাদা গাদা মরেছে এই তল্লাট ভরে। বাচ্চারা এবং বুড়োরা। দিগ্‌বিস্তৃত শ্মশানভূমি। মরা খেয়ে খেয়ে শকুনের অরুচি হয়ে গেছে। সুযোগ বুঝে দয়াবান কেউ কেউ হাতখানেক মাটি খুঁড়ে যেমন-তেমন করে মড়া চাপা দিয়েছে। আজকের উর্বর ভূমিতলে ফসলের সমারোহের মধ্যে সেদিনের কথা ভাবতে পারবেন ?

কংক্রিটের রাস্তা, ঠাহর হল, শেষ হয়ে গেছে কখন। পথের লোকজনও কম। দু-ধারের ফসল আছড়ে এসে পড়েছে, মোটর

তার মধ্যে পথ খুঁজে পায় না। তার পরে জঙ্গল। ছুটছি তো ছুটছি—যেন শেষ নেই। মনে হয়, এ অঞ্চলের খবর পায় নি ভূমিবুভুক্ষু মানুষেরা। কিন্তু খবর না-ই পাবে তো মোটর চলার পাকা-রাস্তা বানাল কারা? মোড়ের মাথায় লটকে রেখেছে: সামনে চলো, খারাপ রাস্তা সামনে। সত্যি, আগে ভাবতাম ইয়োরোপের মাটি বুঝি সেকেলে কর্তাদের হুঁকোর মতোই রুপোয় বাঁধানো। আমাদের মেঠোরাস্তা কোথায় লাগে মশায়! এই স্বর্গে চড়ছি, আবার এই পাতালে নামছি। গাড়ি টলমল করছে। মজবুত জাতের গাড়ি, নয়তো লোহালক্কড় খুলে খুলে পড়বার কথা। জঙ্গলটা যাই হোক কাটিয়ে এসেছি। এখন খেতখামার। হলদে ফুলে ভরা রাইয়ের খেত, বার্লি আর গমের খেত। আবার মুশকিল, পথ হারিয়ে ফেলেছি নাকি—এতক্ষণে তো পৌঁছে যাবার কথা। মানুষ একটা নজরে পড়ে না যে 'ও মুরুব্বির পো' বলে পথের কথা শুধাই।

মাঠ-পারে অবশেষে গির্জার চূড়া দেখা দিল। মুরগি ডাকছে। গ্রাম পেয়ে গেছি—কী আশ্চর্য, দেবেরিন গ্রাম। পথের ধারে গ্রাম ও কৃষি-সমবায়ের নাম—ভুল হবার জো নেই। এই জায়গা তাক করেই তো বার্লিন থেকে এত পথ ভেঙে এলাম।

গ্রামের মাতব্বররা মোটর ঘিরে দাঁড়ালেন। মেয়েও ছু-তিনটি। প্রকাণ্ড ওকগাছের ছায়ায় মোটর রেখেছি। চেয়ারম্যান মশায়কে খবর দিতে লোক যাচ্ছে। আমরা পিছন ধরলাম। অফিস-বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। গেঁয়ো অফিস, তায় চাষবাসের ব্যাপার। কেতাদুরস্ত নয়, মনে হল এক লক্ষ্মীমন্ত চাষীর বাড়ি। মস্ত বড় উঠান, ঘোড়ায়-টানা ওয়াগন এক পাশে। আস্তাবলে কয়েকটা ঘোড়া ঘাস চিবোচ্ছে। গম কেটে গাদা দিয়ে রেখেছে। ঘরের ভিতর ফসলের কী-একটা হিসাবপত্র হচ্ছে, আমাদের দেখে চেয়ারম্যান হন্তদন্ত হয়ে

বেরুলেন : কী আশ্চর্য, এ জায়গায় কেন ? সংস্কৃতি-ভবনে নিয়ে বসাতে হয় এঁদের !

সোস্যালিস্ট দেশগুলোর এক ব্যাপার—দশ-বিশজন নিয়ে কাজ হলেই এক সংস্কৃতি-ভবন বানিয়ে বসে আছে। মানুষ শুধু খাওয়া-পরায় বাঁচে না, মনের খোরাক চায়। এই নীতি ওরা সমাজের সকল স্তরে সমাজভাবে মেনে নিয়েছি। দেবেরিনের কৃষি-সমবায় আনকোরা প্রতিষ্ঠান—এমন-কিছু বড় জিনিস নয়। তারও এমন বৃহৎ সংস্কৃতির আয়োজন। ক্লাবঘর—গান-বাজনা, তাস-দাবা খেলা ও আড্ডা দেবার দেদার জায়গা। টেবিলের উপর খোদাই-করা দাবার ছক—কায়েমি জিনিস, গুঁটি সাজিয়ে বসে গেলেই হল। নাচের ঘর, ছবি আঁকার ঘর। শিশু-দিবস হয়ে গেছে কদিন আগে—নানান জায়গার শিশুরা এসে জমায়েত হল। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া ; নাচগান ও পালা করল তারা ; ক্যাম্প হল ; রাত্রে মশাল-মিছিল।

বসুন এবারে ভালো হয়ে। মানে বুঝলেন তো ? এক-এক বাটি চা সামনে দিয়ে বক্তৃতা শোনাবে। ঘুরে ঘুরে দেখবার আগে ব্যাপারটার মোটামুটি আন্দাজ দেওয়া। রণক্ষেত্র এই জায়গা, একেবারে ফ্রন্ট-লাইন, ওডার নদী দূর নয় এখান থেকে। লড়াইয়ে তছনছ করে দিয়েছিল, কোনো-কিছু আর আস্ত ছিল না। ১৯৪৫ অব্দের পরে চাষবাস ছিল না এক ছটাক জমিতেও। মানুষই নেই—মরেছে, নয়তো পালিয়েছে। জমি আগে ছিল সমস্ত প্রায় জমিদারের। লড়াইয়ের একটা লাভ, জমিদার আর বড়লোকেরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে সরে পড়ল। আর তারা ফেরে নি, পশ্চিম-জর্মনিতে রয়েছে এখন।

তারপরে মানুষজন জুটতে লাগল। বেকার মানুষ। লড়াইয়ে হয়তো সৈন্য হয়ে গিয়েছিল—ফিরে এসে দেখে, জীবিকা ঘরবাড়ি আপন মানুষ সমস্ত খতম। চাষের মানুষ বলে নয়—অন্য দশ রকম

কাজকর্ম করত, তারাও এসে জমি চায়। ফ্যাক্টরি ভেঙেচুরে গেছে, নতুন ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা সময়সাপেক্ষ। সেই-সব বেকার কর্মিক চাষে এসে পড়েছে। জমিদার উৎখাত হয়ে যাওয়ায় সুবিধা হয়েছে—তাদের যাবতীয় জমিজিরেত ভূমিহীন চাষীরা পেয়ে যাচ্ছে। পরের জমিতে চিরকাল খেটে এসেছে, এবারে নিজের জমি তাদের। নিজে যেমন পারে, চাষ করছে। জুত হয় না। ভাঙা দেশের অগণ্য সমস্যা, তার মধ্যে অন্নের ব্যবস্থা সকলের আগে চাই। যতদূর সাধ্য, ভূমি নিংড়ে খাদ্য আদায় করে নাও।

১৯৫৩ অব্দে—এইমাত্র ক-টা বছর আগে—সমবায় চাষের শুরু। জমি আঠারো হেক্টর, মানুষ চার জন। একটি তার মধ্যে গাঁয়ের পুরানো লোক, বাকি তিন জন বাইরের। আর কেউ এলো না। বিশ্বাস করে না, এমনিভাবে কাজ হবে। ক-দিন টেঁকে দেখো সমবায়, ফসলের ভাগ নিয়েই তো মাথা-ফাটাফাটি লাগবে। বছর কাটল, ফসল ঘরে উঠল। তাই তো হে—কম-সে-কম ডবল মুনাফা হয়েছে। সেই আঠারোর জায়গায় এখন ন-শো-কুড়ি হেক্টর জমি। তার মধ্যে আশি হেক্টরে চাষবাস, বাদবাকি লেক ঘরবাড়ি ইত্যাদি। সমবায়ে মোট পরিবার এখন পঁয়ষট্টি। আধ হেক্টর করে নিজস্ব জমি প্রতি পরিবারের—সেখানে আলুটা মুলোটা আর্জায়। গাঁয়ের সাতটা পরিবার এখনো সমবায়ের বাইরে আছে, নিজের চাষ তারা নিজেরা করে। জোরজবরদস্তি নেই, ভালো বুঝলে তখন দলে আসবে। খাটনির মানুষ কম লাগে। ট্রাক্টর তো আছেই, তা ছাড়া ফসল-বোনা ফসল-কাটা ফসল-ঝাড়ার যাবতীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি। ঘোড়া-গোরুর ঘাস কেটে আনছে, গাই দুইছে—সমস্ত কলে।

চেয়ারম্যান বললেন, তোমরা ভারতের মানুষ। নানান দেশের এমনি অনেক বন্ধু এসে গেছেন এই গাঁয়ে। এমন-কিছু বড় আয়োজন নয়। কিন্তু খাস রণক্ষেত্রের উপরে এত মানুষের উদ্যমশীল জীবন দেখতে বোধ হয় ভালো লাগে। একেবারে কিছু ছিল না, চারিধারে

যা-কিছু দেখছেন সমস্ত নতুন। ক্লাব-বাড়িতে বসেছেন, সাবেক দিনেও বাড়ি ছিল এখানে। কিন্তু তিনটে বছর আগে এলে দেখতেন রাবিশ গাদা হয়ে আছে। ভিতটুকু মাত্র পেয়েছি, তার উপরে ইমারত নতুন করে বানানো।

ঘুরতে বেরুলাম তার পরে। কী করে ফেলেছে এই চাষীর গাঁয়ে! খটখটে পাকা গোয়ালে গোরু বাঁধা আছে একশোর উপর। গোরু নয়, এক-একটা হাতি। আর ষাঁড়গুলো হামলা দিচ্ছে বাঘের মতন। কাছে যেতে ভয় করে। এই বড় বড় ত্বধের কেঁড়ে। কাঁচা গম গাদা দিয়ে রেখেছে, এদের খাওয়াবে। ইস্কুল বানিয়েছে, ঘর আর কতটুকু—বাগান। রকমারি ফুল ফুটেছে, বাচ্চারা ঘোরে তার মধ্যে। হাসপাতাল ছোটখাটো একটুকু—সে-ও মস্ত বড় বাগানের ভিতর। ক-বছর আগে এত বোমা—সবুজ বাগান, রঙিন ফুল মানুষজন আর হাসিখুশিতে সমস্ত ঢেকে দিয়েছে।

সমবায় চাষবাস সম্পর্কে কলেজ বসিয়েছে মাইসেনে। মাইসেন—যে জায়গায় সেদিন পোর্সিলেন-ফ্যাক্টরি দেখে এলাম। এদের কর্তাদের মধ্যে একজন সেই কলেজের ডিপ্লোমা নিয়ে এসেছেন। যেখানে যত সমবায়-খামার, সেখানকার কর্তা-ব্যক্তিরা ছাত্র হয়ে যান সেখানে। তু-বছরের কোর্স। কৃষির সর্বাধুনিক কায়দা-কানুন শেখায়। সমবায়-খামার চালানোর মোটামুটি পদ্ধতিও সিলেবাসের ভিতর। খামার চালানোর বাঁধাধরা ছক থাকতে পারে না অবশ্য। স্থানিক অবস্থা অনুসারে চাষীরা ঠিক করে নেয়। এমন সমিতি আছে যেখানে চাষীরা শুধুমাত্র কলে চাষ করবার জন্য একত্র মিলেছে; চাষ হয়ে গেলে খরচটা হারাহারি দিয়ে দেয়। আবার এমনও আছে—সকলের জায়গাজমি কায়েমিভাবে দিয়ে দিয়েছে সমবায়কে।

ভারতের উন্নতি হচ্ছে, তার জন্য ওরা বড্ড খুশি। বুলগানিন-ক্রুশ্চেভ ভারতে এসে বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছিলেন—সেই ডকুমেণ্টারি ছবিটা এই জায়গায় এসেছিল। ভারতকে দেখা শুধু সেই ছবির ভিতর দিয়ে।

বার্লিনে এসে দেখি, যে দু-জন আমাদের সঙ্গে বেরোন নি, হর্ষে তাঁরা ডগমগ। সুখবর—চেকোস্লোভাকিয়াও দাওয়াত দিয়েছে। পোল্যাণ্ডের চিঠি আগেই পেয়ে গেছি। তবে আর কি, লাটসাহেবের তোয়াজে আরও দুটো রাজ্যে ঘোরাঘুরি এর পর। ফিরতি-টিকিট এরাই কেটেছে—বার্লিন থেকে বম্বে। আমরা তা বলে সহজে ফিরছি নে—নানান দেশে চক্কোর মেরে যাব।

আপাতত বার্লিন থেকে প্রাগ। সেখানে দিন কয়েক কাটিয়ে পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ। ওয়ারশ থেকে পুনশ্চ প্রাগ। অতঃপর গাঁটের কড়ি বুঝে অন্য যতগুলো জায়গায় যাওয়া ঘটে ওঠে। মোলাকাত হবে বাইরের লিখিয়েদের সঙ্গে, তাঁদের মনের কথা শুনব। দুনিয়া জুড়ে ধুরন্ধরেরা নানান খেলা খেলছেন, ওঁদের ঐ দাবা-খেলার ঘুঁটি হবে না কখনো লেখককুল। গোটা ইয়োরোপ জুড়ে অপ্রত্যয়ের হাওয়া। কাণ্ড দেখে হাঁপিয়ে উঠতাম। আরে মশায়, বেশ আছি আমরা—ওদের চেয়ে ঢের ঢের ভালো।

ভোটাভুটি আসন্ন। লাইপজিগে ভোটের সভা দেখে এসেছি। পথের ছুটোছুটির ভিতরেও ভোটের বক্তৃতা কানে এসেছে। যাঁরা দাঁড়িয়েছেন নিজ নিজ গুণপনা ও নিজ দলের আদর্শ ব্যাখ্যা করছেন মাইক্রোফোনে। মাতব্বরেরা ভারি ব্যস্ত। ভাইস-প্রিমিয়ার তার ভিতরেও খবর পাঠিয়েছেন, আমাদের একটু দেখতে চান। আলাপ-সালাপ হবে কাছাকাছি বসে, প্রশ্ন থাকলে তিনি তার জবাব দেবেন।

টেকো-রাজা বলতাম আমরা সপ্তম-এডোয়ার্ডকে—ভাইস-প্রিমিয়ারের সেই চেহারা অবিকল। সুচালো দাড়ি, ধবধবে ফরসা সুপুষ্ট চেহারা, মাথা-জোড়া টাক। মুষলধারে প্রশ্ন-বর্ষণ—প্রশ্ন বুঝে নিয়ে ধীরে ধীরে তিনি জবাব দিচ্ছেন। জাঁদরেল লেখক স্টিফান

হাইন তাঁর পাশে—দোভাষির কাজ করছেন। অত বড় লোকের মুখের কথা বুঝিয়ে দিতে তিলেক যাতে ভুল না হয়। হাইন পণ্ডিত মানুষ, জর্মনির সকল ব্যাপারে ওয়াকিবহাল, ইংরেজিটাও বলেন অতি চমৎকার।

বার্লিনে এত যে কড়াকড়ি দেখ—কারণটা হল, শত্রুদলের গোপন ঘাঁটি এর ভিতরেও। এমনি অবস্থা, সমস্ত জেনেবুঝেও মূলসুদ্ধ উপড়াবার জো নেই শুধুমাত্র কড়া রকমের নজর রাখা ছাড়া। বার্লিনের চতুর্দিকে পাহারা। আন্তর্জাতিক পথের দু-ধারে পাহারা, দুই জর্মনির তাবৎ সীমানা জুড়ে পাহারা। কত মানুষ লাগছে, কত খরচ! কী পরিমাণ অপব্যয় বুঝে দেখো। এই সম্পদ দেশ গড়ে তোলার কাজে লাগানো যেত। এক হবার জন্যে সকলে ব্যাকুল। দু-দুটো লড়াইয়ের ঘা খেয়ে প্রতিটি প্রাণী বুঝেছে শান্তি ছাড়া বাঁচবার পথ নেই। এ-জর্মনি অথবা ও-জর্মনি বলে কথা নয়—উভয় খণ্ডের প্রতিটি মানুষ। অ্যাটম-বোমা মজুত করে রাখবে, কোনো মানুষ সেটা চায় না।

লেখকদের কথা উঠল। পূর্ব-জর্মনিতে লেখকদের অবস্থা কী? কলম-চালনায় বাধা-নিষেধ কী পরিমাণ?

কর্তামশায় হেসে হাইমকে দেখিয়ে দেন: জিজ্ঞাসা করো ওঁকে। ওঁর কী রকম ধারণা বলুন। ওঁদের বুদ্ধিবিবেচনা ও দেশপ্রেমের উপরে সরকারের ষোলোআনা আস্থা। এমন কি 'ধনতন্ত্রে ফিরে চলো' লিখলেও কেউ আটকাবে না। একজন ইকনমিস্ট যুক্তিতর্ক দিয়ে লিখেছেও তেমনি এক বই। পড়ছে লোকে।

বললেন, এপার-ওপারের সাহিত্যিকদের মধ্যে অবাধ মেলা-মেশা। বৈজ্ঞানিক-সমাজেও তাই। ওঁদের কল্যাণেই জাত বেঁচে যাবে। দেখো, পশ্চিম-জর্মনির আঠারো জন বাঘা বৈজ্ঞানিক অ্যাটম-বোমার বিপক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। ভারতের সাহিত্যিক তোমরা এসেছ, দেখে যাচ্ছ নিজ চোখে। ভারতের উপর বড্ড ভরসা সারা

ছুনিয়ার। ধ্বংসের কিনারায় দাঁড়ানো মানুষের জন্য কিছু করতে পারবে কিনা, ভেবে দেখো তোমরা ভারতের সাহিত্যিক।

প্রেস-কনফারেন্স পরের দিন। পঁচিশ জন এসেছে নানা কাগজের তরফ থেকে। আকাদেমির হলঘরে বসেছি। বোদো উশে শুধুমাত্র উপন্যাসকার নন, কাগজের সম্পাদকও। মুখবন্ধটা করলেন তিনি :

ভারত ও জর্মন সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড় হোক, এই আমাদের কামনা। সহ-অবস্থান হলেই হল না, অবস্থান করব আমরা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য নিয়ে। আমরা শান্তি চাই, ভারতেরও সেই বাণী। শান্তির সংস্কৃতি-ভূমির উপরে দাঁড়িয়ে আমাদের আত্মীয়তা। পণ্ডিত নেহরুকে অজস্র ধন্যবাদ, মিলনের সেতু-রচনার তিনি সুযোগ করে দিচ্ছেন। তাঁর ইচ্ছা না হলে তোমাদের এই দল আসতে পারত না। তাঁর পোষকতা বিহনে আমরাও নয়াদিল্লিতে এশীয় লেখক-সম্মেলনে একসঙ্গে বসতে পারতাম না।

লিজেলের মা বার্লিনে এসেছেন। থাকেন তিনি লণ্ডনে। লড়াইয়ের পরেই চলে গেছেন, আর আসেন নি। লিজেলও ছিল, তার ইংরেজি-শেখা মায়ের কাছে থেকে। হাসে লিজেল, আর মায়ের গল্প করে। মা এতাবৎ নিজ ভূমে আসেন নি দেশটা কম্যুনিস্টদের হাতে চলে গেছে বলে। ভীষণ লোক তারা, টাকাকড়ি আছে বুঝলে মেরে ধরে কেড়ে নেয়। লিজেল বলে আর খিলখিল করে হাসে : এত কাছাকাছি থেকেও কী রকম বিদঘুটে ধারণা দেখ। আর তোমাদের কথা বলে, ইণ্ডিয়ার লেখকগুলো পুব-জর্মনি যখন দেখতে এসেছে নিশ্চয় ঝাঘা বাঘা কম্যুনিস্ট।

যাই হোক বিস্তর দ্বিধাসন্দেহ সত্ত্বেও অপত্যস্নেহের বশেই মা-

বলেন, গান্ধিজীর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে ছিলেন কিছুদিন। বললেন, আবার ভারতে যাব।

বিষম গরম। আপাদমস্তক পশমি পোশাক, অন্তরাত্মা আইঢাই করে পশমের নিচে। পাখা পাবেন না কোথাও। গাদা গাদা পাখা বানায়, কিন্তু নিজের দেশে রাখে না একটি। দরকার পড়ে নি এতাবৎ। এমন অবস্থা কস্মিনকালে কেউ দেখে নি। যা গতিক, সুতি-পোশাকের চলন হবে এর পরে ইয়োরোপে—ঢিলেঢালা পোশাক। আর যেমন এদেশেও বলে থাকে, যত নষ্টের গোড়া হল অ্যাটম-বোমা। আবহাওয়া বদলে দিচ্ছে। সমস্ত উলটোপালটা হয়ে গেল।

বোদো উশে বললেন, বন্ধু লেখকগণ, তোমরা সব ফিরে চললে। হয়তো বা বইয়ে লিখে ফেলবে, গ্রীষ্মপ্রধান ইয়োরোপের মধ্যে সবচেয়ে গরম দেশ হল জর্মনি।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

লেখকের

উপন্যাস

আগস্ট ১৯৪২ আমার ফাঁসি হল এক বিহঙ্গী ওগো বধূ সুন্দরী
জলজঙ্গল নবীন যাত্রা বকুল বাঁশের কেল্লা বৃষ্টি, বৃষ্টি
ভুলি নাই রক্তের বদলে রক্ত শত্রুপক্ষের মেয়ে সবুজ চিঠি
সৈনিক বনের মধ্যে ঘর

গল্প

উলু একদা নিশীথকালে কাচের আকাশ কিংশুক কুঙ্কুম
খদ্যোত দিল্লি অনেক দূর দুঃখ-নিশার শেষে দেবী কিশোরী
নরবাঁধ পৃথিবী কাদের বনমর্মর গল্প-সংগ্রহ ১ম খণ্ড
শ্রেষ্ঠ গল্প

নাটক

নূতন প্রভাত প্লাবন বিপর্যয় বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং রাখিবন্ধন
শেষ লগ্ন

ভ্রমণ

চীন দেখে এলাম ১ম ও ২য় পর্ব পথ চলি সোবিয়েতের দেশে দেশে